বৃহন্নলা

বৃহন্নলা

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

বসু চৌধুরী
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯
১৩৫৩

প্রকাশক : শ্রীশুভেন্দু চৌধুরী
৬৭-এ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৯

মুদ্রক : শ্রীননীমোহন সাহা
রূপশ্রী প্রেস প্রাইভেট লিঃ
৯, এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

গ্রন্থন : শ্যামলী বাইন্ডার্স
৯, এ্যান্টনি বাগান লেন
কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদ : সুবোধ দাসগুপ্ত

মূল্য—চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মাতৃদেবীকে

যতই এগোচ্ছি ততই ভাল ভাল জিনিস হারিয়ে যাচ্ছে। অথচ এসব ভারি দরকারী। আগে ফিরে পাওয়ার জন্যে যাও বা চেষ্টা ছিল এখন তাও নেই। হেরে হেরে এখন শুধু কটু করে ঠাট্টা করতে পারি, হেনস্তা করে একরকমের সুখ পাই—পরে ভেবে দেখি সেটা সুখ নয়—পালা-জ্বরের ঠাণ্ডা অবসাদের মত ঘুম পাড়ানি ক্লান্তি মাত্র। একথা যখনই বুঝতে পারি তখনই ভালোর দিকে অজান্তে এগিয়ে গেছি। কিন্তু বেশীক্ষণ এরকম পেছন ফিরে ভেবে দেখার সময় হয় না। তখন ভালবাসা আয়ু এসব সত্যিকে তিক্ত শখ নিক্ষেপ করেই শান্তি খোঁজার অভ্যেস হয়ে গেছে। এই শায়ক মনোবৃত্তি আমাদের ছাল চামড়ার ওপর ধুলো দিয়ে দিয়ে গোপনে এক চিত্রবিচিত্র পোশাক পরাতে থাকে। তারপর একদিন আর আমরা আগের আমরা থাকি না। তখন ধুলোর তৈরী এই পোশাকের ছদ্মবেশ পরে এমন করে চলি ফিরি তার মধ্যে সময় করে পেছন ফিরে ভেবে দেখার সময়ই হয় না। তাছাড়া ধুলোর পোশাকে এত মজা! আর সে-মজা মনের মধ্যে ফু দিয়ে ফোলানো একটা বেলুনের জগতে কেমন পাক খায়। অথচ কি মিথ্যে! কিন্তু একদিন হঠাৎ টের পাই ছদ্মবেশের মধ্যে শুধু ধুঁকছি। বেরিয়ে আসতে পারা নিশ্চয় বড় কথা—কিন্তু বেরিয়ে আসা দরকার এইটে বুঝতে পেরে ধুলোর চিত্র-বিচিত্র পোশাকটার আকর্ষণ তুচ্ছ করে সত্যির সামনে নিঃসহায় উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারার ইচ্ছেটাও কোন দিক থেকে কম বড় নয়। তখন মনে হবে এইমাত্র একটা সত্যির দরজা খুলে গেল।

এসব নিয়েই বৃহন্নলা।

বৃষ্টির মধ্যে দৌড়ে সিনেমা হলে এসে উঠল প্রমথ। অঞ্জু কি সুধা কেউ আসেনি। খানিক বাদেই বাসে সুধা এল। রাস্তা পার হতে হতে প্রমথকে খুঁজল। দেখে হেসে এগিয়ে এল, 'শোন। টিকিট পাওয়া যায়নি যে—'

ঠিক ছিল আগে এসে টিকিট হাতে অঞ্জু দাঁড়িয়ে থাকবে।

সুধা বলল, 'চল অন্য ছবি দেখিগে।'

'থাক্ না—আর একদিন যাব।'

'কি করব—টিকিট পেল না অঞ্জু। বলল, তোরা আজ অন্য কিছু দেখে আয় মেজদি। আমি না হয় আর একদিন যাব তোদের সঙ্গে।'

বাস ট্রাম পাশাপাশি যাচ্ছিল। সুধার কি মনে হল। 'উঁহু— অফিস থেকে ট্যাং ট্যাং করে এতটা এলাম, একটা কিছু দেখবই।' কথাটা মিথ্যে। অফিস থেকে আজ সকাল সকাল টিকিট কিনে বাড়ি ফিরেছিল সুধা। ঘণ্টাখানেক আগেও ঠিক ছিল তিনজন এক সঙ্গে সিনেমায় যাবে। অঞ্জুই সব ভেস্তে দিল। ভীড়ে অনেকে তাকাচ্ছে। 'চল কিছু খেয়ে নিই তবে'। দেখল এ না বলে উপায় নেই। প্রমথ যে কিছুই দেখছে না।

সিনেমা হলের লাগোয়া রেস্টুরেণ্ট। কেবিনে বসে সুধা বলল, 'নতুন কিছু বেরোল? রেলের পরীক্ষার খবর—'

'কোথায়! সারাদিন ঘুমোচ্ছি। আমার কিচ্ছু হবে না!'

'ইন্টারভ্যুর রেজাল্ট?'

'মাস দুই যাক'। ঢিলে হয়ে বসে নিল। 'চাকরি নাও দিতে পারে। সবই ওদের ইচ্ছে!'

সুধা মাথা নামাল। কাঠের পার্টিশানে সরু তাকের ওপর টবে বিলিতি চারা। ডাঁটিতে খদ্দেরের মাস্টার্ড লাগান। মুখের গ্লাস থেকে সুধা সাবধানে খানিক জল ঢেলে দিল টবে।

চাকরির কথা ভাল লাগে না। অনেকক্ষণ ধরে কথা বলা যায় এমন কিছু নেই। অঞ্জু এলে এটা সেটা বলে সময় কাটত।

সুধা বলল, 'বুঝলে, যা খেয়েছি দুপুরে—সব হজম।'

'খাওনা কিছু। স্বাস্থ্যের লক্ষণ। আমি শুধু চা নেব।'

শরীর ভাল হওয়া নিয়ে সুধা কথা বলতে ভালবাসে। প্রমথ কথা বাড়াল না।

'চা ত খাবেই। আর কিছু নাও।'

'একদম ক্ষিধে নেই। সত্যি।'

দেখা হলে সুধা খাওয়ায়। অথচ প্রমথর সঙ্গে পয়সা থাকলে সুধার ক্ষিধে থাকে না।

মাসের প্রথম দিক। ব্যাগে দুটো এক টাকার নোটের গোছা ঠুসে দিয়ে সুধা একটা দশ টাকার নোট ভাঁজ করে রেখে বলল, 'টিফিনের টাকা আলাদা করে রাখি। কদিন পরে রোজ একটা করে টাকা চেয়ে নেবে মা। মেথরের মাইনে পাঁচসিকে দাওরে!' বলতে বলতে হেসে ফেলল, 'আচ্ছা আগের চেয়ে একটু মোটা হইনি? দেখ।'

'খানিকটা হয়েছ।' বলে দেখল, কোথায় ফুলেছে বলা কঠিন।

'লাইট হাউসে ওজন নিলাম আজ। তিন পাউন্ড বেড়েছি।'

বাইরে পাতলা বৃষ্টি। সুধা ডিমসেদ্ধর অর্ডার দিল। বেয়ারা বলল—নেই। প্রমথ তখন দুটো ওভালটিন দিতে বলে দিল। সুধা ছোট আয়না বের করে চোখের কোণ থেকে কাজল মাখান ছোট একটু পিচুটি তুলে এনে শাড়িতে মুছে বলল, 'বুঝলে, হিন্দী পরীক্ষায় পাশ করেছি। এবারে একটা ইনক্রিমেন্ট দিচ্ছে—'

এসব কথায় প্রমথর সুখ নেই। চাকরিতে ইনক্রিমেণ্ট হয়ই—বলার কি আছে।

এমন সময় এদিকে মুখ করে প্যাসেজে ভাতের ফ্যান গালতে বসল বুড়ো বয়। ফাঁপানো চুল—তারও চোখে কাজল। হাড়ি বেয়ে বেয়ে ফ্যান পড়ে ফাটা নর্দমা বুজে যাচ্ছে। উটকো হয়ে শব্দ করে বড় হাড়িটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দোলাতে লাগল লোকটা। হঠাৎ এক সময় খারাপ চালের বিটকেল গন্ধ চারিয়ে গেল সারা ঘরে।

ওভালটিন দিয়েছে।

গরম ভাতের ধোয়ায় সরু প্যাসেজ ভর্তি। গন্ধে প্রমথর ওক্ দিয়ে বমি এল। পিঠ বেঁকে একটা কাশি থামাল। বমি চাপতে গিয়ে ঠোঁটে থুথু এসে গেছে। অদ্ভুত অবস্থা।

সুধা মুখ নিচু করে ওভালটিনে চুমুক দিতে দিতে দেখল, প্রমথর কোন-দিকে ঠিক এখন চোখ নেই। চুরি করে দেখতে গিয়ে ভাল লাগল। ঘরটা গরম। পথে এখন শুধু শীত। এমন সময় প্রমথ বলল, 'দু আনা পয়সা হবে?'

'এই এক ব্যাড হ্যাবিট তোমার !' হাতের কাপটা ঠক করে প্লেটে রাখল সুধা।

'কোন্‌টা?' বলে বুঝতে পারল প্রমথ, অনেকক্ষণ ঠোঁট ফাঁক করে হাসছে। শব্দ নেই। আর কিছুক্ষণ থাকলে চোয়াল ব্যথা করবে। সঙ্গে সঙ্গে হাসি বন্ধ করে দিল।

সুধা আর একটা চুমুক দিল, 'পয়সা চাওয়া। কি দরকার? সত্যি?' বলতে বলতে কাঁদতে ইচ্ছে হল সুধার। 'যখন চাও এত খারাপ লাগে!'

'অ।'

অনেকক্ষণ চুপ দেখে একটু পরে টেবিলের নীচে পা দিয়ে খোঁচা দিল সুধা। 'হল কি? কথা বলছ না। বৃষ্টি ধরে গেছে। কিছু খেলেও না।' পয়সার কথাটা মুখে এসে পড়াতে আটকাতে পারেনি। শীগগিরি চাকরি হবে প্রমথর। পয়সা থাকে না, রুমাল না। খেতে দিলে হাত ধুয়ে হাত মোছে পর্দায়, নয়ত প্যাণ্টের পকেটে।

সর্দিতে মাথা বোঝাই। শীতের বৃষ্টি বিচ্ছিরি। এখন বিছানায় শুয়ে থাকলে ভাল হত। নাকের উপর কাপ উলটে চা খেল প্রমথ।

'কি হয়েছে?' সুধা তখনও লেগে আছে।

'মাথা ধরেছে। অ্যানাসিন খেলে হত—' লালচোখ তুলে তাকাতে প্রমথর মুখ দেখল সুধা।

'ভেরি সরি।' তক্ষুনি সুধা উঠে ব্যাগ খুলে বেয়ারাকে পয়সা দিল। ফিরে প্রমথকে সরিয়ে দিয়ে পাশে বসল। 'জায়গাটা এত অসভ্য। সবাই তাকাচ্ছে।'

'দেখুকগে!' প্রমথর চোখ বোজা। মাথার পেছনের চুল মুঠ করে টানতে লাগল সুধা। প্রমথর এসবে আসে যায় না।

'ভাল লাগছে?'

উত্তর দিতে গিয়ে গলার স্বর সর্দিতে মেখে গেল প্রমথর।

'চুল পেকেছে যে! দেখি দেখি। তুলে দিচ্ছি।'

'অনেকদিন পেকেছে। থাকুক, দেখতে পাবে না কেউ।'

'আমি!'

প্রমথ উত্তর দিল না। মোড়ের ঘড়িতে ছ'টা দশ।

'রোজ এত বুড়ো হয়ে যাচ্ছ।'

কথা বলল না সুধা। মাথার পেছনের চুল শক্ত করে মুঠ করে ধরল। শেষে একা একাই বলল, 'ভারি বয়েস!'

কলেজে গোড়ার দিকে কিছুদিন একটা ছেলের সঙ্গে মাখামাখি ছিল। সে সোজা সোজা কথা বলত সুধাকে।

'গরম চা দিয়ে অ্যানাসিন খাও। একদম ছেড়ে যাবে।'

প্রমথ রুগী না। অথচ রুগী হয়ে যাচ্ছে দেখে ভাবটা ঝেড়ে ফেলে দেওয়ার জন্যে সোজা হয়ে বসল।

'কি কি খেলে অফিসে?' বলে সঙ্গে সঙ্গে হাসিও আনল মুখে।

'রুটি, ছানা, একটা আপেল আর বেগুন ভাজা।'

'রুটিতে মোটা হবে, বেগুনে গলা চুলকোয়।' প্রমথর নিজের চুলকোয়।

'কক্ষনো না। কাশীর বেগুনপোড়া খেয়েছ—মাখনের মত।'

'বেশ। আপেলটা কাঁচা না পাকা ছিল?' ডাক্তাররা এভাবেই বলে। প্রমথর প্লুরিসির সময় বলত।

'কাঁচা'।

'তাহলে সি ভিটামিন ছিল। চেহারায় গ্লেজ বাড়বে।'

প্রমথর দিকে তাকিয়ে ছিল সুধা। গ্লেজের কথায় মুখ নামাল। মাথায় অনেক চুল ছিল। টিউবয়েলের জলে এত আয়রণ—চুল উঠে যাচ্ছে—। কতদিন বলেছে, 'খানিক টাটকা জবা ফুল কিনে এনে দাও না।'

জবার নরম লাল লেই লেই পাপড়ি মাথায় আর নাভিতে ডলে ডলে মাখলে চুল ওঠে না। কলকাতায় জবার বাগান নেই। দু দুবার কালীঘাটের মা কালীর পুজোর জবার মালা কিনে এনে দিয়েছে—'যত পার ডল!'—পয়সায় পোষায় না যে!

মাথা তুলল সুধা, 'অঞ্জু আসেনি বলে খারাপ লাগছে না ত তোমার?'

প্রমথর ভয় হল। কার খারাপ লাগছে। মাথার মধ্যে হাতুড়ি পড়ছে। কথা বলল না। তাকিয়ে থাকল শুধু।

'ধুতিটা ম্যাচ করেনি মোটে।'

'এইটেই ছিল। লন্ড্রীটা একের নম্বরের—!'

প্রমথ আর কথা বলতে পারল না। মাথাটা ভারি হয়ে আসছে। ভাতের সেই গন্ধটা। মাথার মধ্যে সব গুলোচ্ছে। তাড়াতাড়ি চা দিয়ে অ্যানাসিনের দুটো বড়িই মুখে দিল। চোখ বড় করে তাকাচ্ছে সুধা। ঠোঁট উলটোল। চোখ কোঁচকাল। ভর্তি রেস্টুরেন্ট। লোকজন চারিদিকে। কি বলতে গিয়ে থেমে গেল প্রমথ।

বলতে যাচ্ছিল, মুখ কোঁচকাও কেন? লোকে কি বলবে। এমন সময় গলা দিয়ে ছিটকে এসে একমুখ টকটক বমি কুলকুচির মত মুখ ভর্তি করে দিল। এখনই না ফেলে দিলে মুখ দিয়ে নাক দিয়ে গল গল করে বেরোতে

থাকবে। গন্ধটা মাথার মধ্যে গিয়ে মোচড় দিল। সুধা এসব কিছু জানে না।

সুধা নিজের কথাও জানতে পারে না। দু একদিন সুধার কোলে মাথা দিয়ে শুয়ে থাকার সময় প্রমথ অদ্ভুত এক আওয়াজ পেয়েছে। সুধার পেটের কাছে প্রমথর মাথা পড়েছিল। কেমন কল কল করে পেট ডেকে ওঠে সুধার। প্রমথ শুনতে পেয়েছে শব্দটা।

সুধা প্রমথর ভেতরটা দেখতে পাচ্ছে না। মাথা ধরলে কোন শব্দ শোনা যায় না। শুধু ঘাড় ঘুরিয়ে দাঁত দিয়ে মাড়ি চেপে ধরলে কেমন 'কচ কচ' শব্দ হয়। সে শব্দ যার মাথা ধরে সে শুনতে পায়।

সুধা কাছে এসে পর্দা বাঁচিয়ে গলায় হাত রাখল। ঠিক তখনই প্রমথর মুখের বমি গাল ফুটো করে পিচকিরি হয়ে বেরোতে গেল। মাথাটা দপ্ করে উঠল। সুধার হাত এক ঝটকায় সরিয়ে দিয়ে দৌড়ে বেসিনে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল প্রমথ।

সাদা সাদা দইর দানার মত—খানিক থেঁতলানো ডাঁটার ছিবড়ে, দুটো একটা ভাত—গন্ধ। কল খুলে বেসিন ধুয়ে দিল। মুখে চোখে ঘাড়ে জল দিল। সবাই তাকাচ্ছে। কেবিনে ফিরে পর্দাটা ভাল করে টেনে দিল। এসব একমুহূর্তে ঘটে গেল।

বসতে না বসতেই সুধা দু হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল। অন্য সময় ভালই লাগে। একটা মেয়ে গলা জড়াচ্ছে। এখন এই বমির গন্ধভর্তি মুখে বাধা দেওয়ার আগেই সুধা প্রমথর মাথা জাপটে ঠোঁটের ওপর ঠোঁট চেপে ধরল। কি বলতে শুরু করেছিল 'কোনদিন ছেড়ে...।'

কথা শেষ করতে পারল না সুধা। কি বলবে প্রমথ জানে। 'কোনদিন ছেড়ে যেও না আমাকে।' ভীষণ ভয়—প্রমথ যদি চলে যায়। সাদা মেয়ে। কিন্তু মুখের কথা শেষ না হতেই প্রমথকে ছেড়ে দিয়ে সুধা কোণে ফিরে দু হাতে মাথা রেখে ফুলে উঠতে লাগল।

প্রথমে কিছু বুঝতে পারল না প্রমথ। কিছুক্ষণ না নড়ে তাকিয়ে থাকল। পর্দা-দেয়া ঘরে সুধা কাত হয়ে টেবিল ধরে পড়ে আছে।

'কি হল। কাঁদছ?' কোমরে একটা খোঁচা দিল আঙুল দিয়ে। 'কাঁদা-কাটির কি হল? অ্যা!'

'আবার খেয়েছ?' সুধা মুখ না তুলেই বলল। প্রমথ নিজেকে আর ধরে রাখতে পারল না। অন্ধকারে সুধাকে একটানে হিঁচড়ে ধরেই ফেলে দিল। কাপটা পড়ে যাচ্ছিল, 'কোথাকার ফ্যাকড়া বাধানোর ইয়েরে!' আরও কি সব বলল। তারপর চুপ করে বসে থেকে প্রমথ বলল 'বাজে বকো না।

বাবে ছেড়ে দিয়েছি। আর সে ত শখ করে। পয়সা? পয়সা কোথায়—?' হাসতে গিয়ে দেখল রাগটা চন চন করে মাথায় উঠছে।

'চোখ লাল—গন্ধ বেরোচ্ছে—বমি ত হবেই—মাথা ধরার দোষ কি?' বলতে বলতেই সুধা বুঝল প্রমথ ওসব খায়নি।

'রাবিশ। গরম চায়ে জিবের ওপর দুটো অ্যানাসিনই গলে গেছে। তেতো। বমি করব না ত কি? যাও! ওপাশে গিয়ে সরে বস—' এক ঝটকায় সুধাকে সরিয়ে দিল।

'এটা কিরে! গায়ের সঙ্গে লেগে যায়!—' এসব ভাবছে টের পেয়ে প্রমথর নিজেকে খারাপ লোক মনে হল।

মাথার মধ্যে হাতুড়িটা আবার হাড় আর মাংস থেঁতলাচ্ছে। সত্যি, সুধার কোন দোষ নেই। গম পচেও যা, ভাত পচেও তাই, বার্লি গেজেও সেই একই। বমির গন্ধও টকটক। ভুল হতেই পারে। তাছাড়া তার নিজের পাস্ট রেকর্ডও ভাল না।

প্রমথর সঙ্গে আলাপ হওয়ার আগেই গন্ধটা সুধা চেনে। বাবা খায়। পরিতোষবাবুকে কতদিন পথের মধ্যে উবু হয়ে বসে চর্বির বড়া কিনতে দেখেছে প্রমথ।

সুধা কাছে সরে এল। হাত রাখল কাঁধে।

'দরকার নেই। জানবে না শুনবে না!'

'রাগ করেছ?' একটু হাসল সুধা।

'হঠাৎ কি এত জড়িয়ে ধরার দরকার হল?'

সুধা প্রথমে মাথা তুলতে পারল না। অফিসে বসবার ঘরের পাশে টয়লেট। প্রমথ দেখা করতে গেলে তার উল্টো দিকে দাঁড়িয়ে থাকে। সেখান থেকে বেরিয়ে প্রথমে কেউ মাথা তুলতে পারে না। প্রমথ সোজা মুখের দিকে তাকিয়ে থাকে। সবিতা একদিন ঘেমে একাকার। কি নালিশ সুধার কাছে।

অনেক পরে সুধা বলল, 'খুব সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে।'

'মাথা ধরলেই আমাকে ভাল লাগে।'

সুধার গর্ব করতে ইচ্ছে হল। প্রমথর ভারি মুখে তার নিজের আদল আসে। সেদিন অফিসে গিয়েছিল প্রমথ। মীরাদি বলছিল, তোদের দুটিকে ভাইবোন বলে ভুল হয়।

'কক্ষনো না।' বলে আপত্তি করেছে সুধা।

সুধা বলল, 'না সাজলেও চলবে তোমার।'

এ কথায় কান না দিয়ে বুঝতে পারল সুধাকে প্রায়ই যেমন খারাপ লাগে

আজও তার তেমনই খারাপ লাগছে। বুঝতে পেরে সুধার জন্যে কষ্ট হল। এখুনি হিসেব করা দেখা যায়—সুধার সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই। অথচ সুধা জানে—

প্রমথ একটা কথা পেয়ে গেল। 'অফিস থেকে আসবে। তাই আর ধোপ ভাঙিনি।'

'বেশ করেছ।'

হাতা গোটান পাঞ্জাবির ভাঁজে ময়লা হয়েছে। এটা মজুমদারের দোকান থেকে সুধার কিনে দেওয়া। মাঝে মাঝে ব্লাউজ দিতে চায় প্রমথ। না হোক ব্লাউজ পিস। সুধা রাজি হয়নি। প্রমথকে নিজের কিনে দেওয়া জামা পরতে দেখলে আরাম লাগে। বিয়ের পরে শরীর ভাল হলে প্রমথ ভাববে সুধা যা—শেষ হয় না। প্রমথর সঙ্গে যদি বিয়ে না হয়!

প্রমথ সুধার দিকে তাকাল না। মুখোমুখি হলে কথা বলতে হবে। একটা সন্দেহ গোড়া থেকেই পাক খাচ্ছে। সন্দেহ সুধাকে নিয়ে। ছবিটা পুরনো। মঙ্গলবার ভিড় থাকে না। সন্ধ্যের টিকিট সকালে এসেও পায়নি, অঞ্জু? সুধা কি অঞ্জুকে টিকিট কাটবার জন্যে টাকা দিয়েছিল?

যদি না-ও দিয়ে থাকে তা মুখ ফুটে বলা যাবে না। যদি বলা হয়—তবে জিজ্ঞাসা করবে—'তুমি কি আমাকে বিশ্বাস কর না?' কিন্তু সুধা মিথ্যে বলে—প্রমথও বলে। কতদিন সুধাকে জড়িয়ে ধরে গলগল করে বলে গেছে (— — — — — — —) সুধাও বলেছে—'তুমি আমার সব—কোনদিন ছেড়ে যেও না।'

এদিকে সুধার মন খিঁচড়ে আছে। ভেবে দেখল—আজ সকালে, হ্যাঁ বিকেলেও, বাড়িতে যা হল—তা না ঘটলে তিনজনে দিব্যি সিনেমা দেখত আরামে। প্রমথর সামনে কথা না বলে বসে থাকতে খুব খারাপ লাগে। অঞ্জুর ওপর রাগ হল। আজ সারাটা সন্ধ্যে অঞ্জু একাই ভেস্তে দিল। ভোরের ব্যাপার—বিকেলের ব্যাপার—কেন যে এসব হয়।

ভোরে বড়দির পাশে বিছানায় সুধা শুয়ে। বড়দির পা ভেঙেছে কদিন।

বড়দি গল্পের বইয়ের পাতা ওল্টাচ্ছিল। সুধা কোল-বালিশের সঙ্গে মিশে আছে। অঞ্জু ভোরের চা দিয়ে কলেজে যাবে।

'নে মেজদি চা নে।' বড়দির চা আগেই রেখে দিয়েছে। 'ওঠ্ মেজদি। টাকা দে। টিকিট কাটতে হবে না!' সুধার ঘুম ভেঙেছে আগে। চোখ খুলবে কি না ভাবছিল। যা ভয় ছিল তাই হল। কাল সন্ধ্যেবেলা কখন

বলেছে, সে প্রমথ আর অঞ্জু তিনজনে সিনেমায় যাবে এক সঙ্গে। অঞ্জু ভোলেনি। প্রমথই যত নষ্টের গোড়া। কেন যে তিনজনের এক সঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার কথা পাড়ল।

'তোর নীল শাড়িটা পরছি কিন্তু মেজদি। ঝগড়া করতে পারবি না।'

চোখ বুজে শুনছিল সুধা। একবার পরা শাড়ি পরতে পেয়ে অঞ্জু খুশী। যাক না তিনজন এক সঙ্গে। কি হবে তাতে। প্রমথ মজার মজার গল্প চালাবে হাফটাইমে। আড় ভাঙতে ভাঙতে চোখ খুলল। অঞ্জু নীল শাড়িটা ঘুরিয়ে পরেছে। আয়নায় ঝুঁকেছে। ভ্রুতে টিপ দেবে।

প্রথমে খুব ভাল লাগল। বড়দিও বই বন্ধ করে তাকিয়েছিল। কি ভেবে আয়নার সামনে গেল। 'সর ত অঞ্জু'। দুবার সেলাই করেছে ব্লাউজটা ফিরিয়ে ফিরিয়ে। হাতটা বগলের কাছে ঢিলে হয়ে ভাঁজ হয়ে আছে। কোমরের কাছে হলহলে লাগছে। কাঁধের হাড় হাতের আঙুলের মত। জোর করে চেপে ধরে মুট করে ভেঙে ফেলা যায়।

সুধা আয়নায় হাসল। হাসি হল না। সাদা দাঁত। এই সেদিন স্কেপ করিয়েছে। ডেন্টিস্ট ঠোঁট উল্টে ধরে মাড়ির ওপর দিয়ে আঙুল চালিয়ে দেয়। আয়নার সামনে চেয়ারে বসে চোখ বুজে থাকতে হত। চোখের সামনে বড় ফটোতে বাঁধান সুন্দর একটা মেমের হাসি-হাসি কাটামুণ্ডু। ঠোঁট নেই। পরিপাটি খোঁপা বাঁধা মাথা।

অঞ্জু নীচু হয়ে জুতোর স্ট্রাপ বাঁধছিল। 'টাকা দে। দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

একটু দম নিল সুধা। 'ট্রামের মান্থলি কাটা হয়নি যে। মনেই ছিল না। আজ লাস্ট ডেট।'

'তবে প্রমথদাকে কাল আসতে বললি যে?'

অঞ্জুর দিকে তাকাল না সুধা। মনে মনে বলল, প্রমথর জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না।

মুখে বলল, 'সে আমি বলে দেবখন।' বলে দেখল, বড়দি তাকে দেখছে। ঘুরে দাঁড়িয়ে তাকের ওপর থেকে টাইমপীসটা নামিয়ে কট্‌কট্‌ করে চাবি মোচড়াতে লাগল। বুড়ো আঙুলটা চাবিতে। আর একটু করে পাতলা মাংস আঙুলটার দু পাশে থাকলে ভাল হত।

চায়ে চুমুক দিল সুধা। অঞ্জু বই গুছিয়ে বেরিয়ে গেল।

বাঁ পা সায়ার বাইরে টান করে দিয়ে খাটে হেলান দিয়ে দাঁড়াল সুধা। সায়ার লেসের সুতো এদিক ওদিক খুলে আসছে। গোড়ালি বেয়ে পিল পিল করে তিনটে শিরা পায়ের নীচে চলে গেছে। অফিসে যাওয়ার সময় বড়দি ডাকল।

'মেজ, চিঠিটা সুনীলকে দিবি। সঙ্গের লিভ এক্‌স্‌টেনশনের চিঠিটা অ্যাডমিনস্ট্রেসনের ও. এস.-কে দিতে বলবি।'

চিঠি দুখানা ব্যাগে রাখল। আরও পনের দিন ছুটি চাই বড়দির। চিঠিটা খুলে দেখার ইচ্ছে হল না। কি আছে সুধা জানে। 'সোনা, আমি এখন থাকব না, শনিবার চড়কডাঙার ঘড়ির নীচে থেক।'

দু' একবার চিঠি লিখেছে প্রমথকে। 'আমি ভাল আছি। আশা করি তুমি ভাল আছ।' কি লেখা যায়।

টিফিনের কৌটোটা ব্যাগে গলাতে গলাতে বেরোচ্ছিল। বড়দি ডাকল আবার।

'তাড়াতাড়ি বল। চিঠি ঠিক পেঁাছে দেব।'

'তুই দুধ খেলে পারিস টিফিনে।'

সুধার থামতে হল।

'কাল প্রমথ বলছিল তোর শরীরটা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

'খুব মায়া।' প্রমথ ভাবে, দেখলে বোঝা যায় না। দেখা হলে ভাল করে কথা বলবে। এমন বেয়াড়া সময়ে এসে চুপচাপ বসে থাকে।

'ছুটি নিয়ে কানুপিসির ওখান থেকে ঘুরে আসবি? ভীষণ ক্ষিধে হয়। সতের-দিনে দু পাউন্ড বেড়েছিল। বলিস ত তোর জন্যে পাশের কথা লিখে দিই সুনীলকে। দেব?'

বিছানায় উঠে বসল বড়দি। ছাব্বিশ তারিখে পায়ের ব্যাণ্ডেজ খোলা হবে। চোখ তেলে ট্যালটেলে হয়ে আছে। ঠিক করল অফিস যেয়ে কাজ নেই। আজকে বড়দিব পাশে বসে গল্প করবে। কিন্তু এসব করতে হবে ভেবে লজ্জা হল।

'না। সে আরেক ঝক্কি।'

'শোন্‌। প্রমথকে সামনের রবিবার নেমন্তন্ন করে আসবি তবে।'

'কেন?'

'সে শুনে তোর কি হবে। বিকেলে আসে যেন। বুঝলি। আমা কাঞ্জিভরমখানা পরবি তুই।' বলে বড়দি জানলার দিকে ফিরে শুলো। শুতে শুতে বলল, 'অফিস থেকে এসে আমার কাছে চুল বাঁধলে পারিস। শুয়েই থাকি সারাদিন।'

জানলা খুললে বাড়ির পেছনের জলে ভেজা লতা—অশ্বত্থ ঝুরির গন্ধ আসে। তার ওপাশে ভাঙা শিশি, কেরোসিনের বোতল মোছা ন্যাকড়া পুরনো খবরের কাগজ ছড়ান মাঠ। বড়দি পেছন ফিরে শুয়ে। ফাঁকা আয়না। ঘরে কেউ নেই। অফিসে বেরিয়ে গেল সুধা।

ট্রামের মান্থলি সত্যি কাটতে হবে। কেটেও টিকিট কিনবার মত পয়সা বাঁচবে। কিনে নিয়ে যাবে টিকিট? কিন্তু দুখানা কাটলে প্রমথ কি ভাববে! নাহয় বলবে, অঞ্জু দুখানা কিনে এনেছে—ওর কাজ আছে। যে কোন কাজের নাম চালান যায়। কিন্তু প্রমথ কোন কথা না বলে হাসবে শুধু। এর চেয়ে অঞ্জুকে টিকিট কাটতে দেওয়াই ভাল ছিল।

সুধার কোন দোষ নেই। ঘুম থেকে উঠে অঞ্জুকে দেখে এত সুন্দর লাগল। অফিসমুখো ট্রামে উঠে ঠিক করতে পারল না ফিরে গিয়ে তিনখানা টিকিট কিনে নিয়ে যাবে কি না।

শেষে কিনে, সকাল সকাল বাড়ি গিয়ে বলল, 'নে চল অঞ্জু। নিয়ে এলাম তিনখানাই। মীরাদি আজ টাকাটা শোধ করে দিল।'

অঞ্জু তখনও বড় খাটে বিছানায় চাদর বদলাচ্ছিল। বলল, 'তুমি যাও। আমার শাড়ির যা চেহারা হয়েছে।'

'ঐ শাড়িতেই চল। তোর ছোট হাতার ব্লাউজটা কোথায় রে।'

অঞ্জু ব্লাউজটা দান করে দিল। সুধা গায়ে দিয়ে আয়নায় দেখল। মানায়নি। সেদিন অঞ্জু পরেছিল। সুন্দর দেখাচ্ছিল। অঞ্জু বড়দির কলার তোলা ব্লাউজটা পরে হাত পেছনে পাঠিয়ে পিঠের বোতাম আঁটছিল। 'মেজদি ভাই, একটু লাগিয়ে দে না।'

সুধা দাঁতে শাড়ি কামড়ে আয়নার সামনে গেল। পাড়ার রতিকান্ত বাবার গলা। খাটাল আছে। বাবা নথি দেখছে। রতিকান্ত জানলা দিয়ে এদিকে কয়ে। রতিকান্তর ওপর রাগ একটু পরে অঞ্জুর ওপরে ঝাড়ল সুধা। ভা পিঠের বোতাম আটকাতে গিয়ে পিঠ হাতে লাগল। ব্লাউজের কলার ট বসেছে। পুরন্ত টান টান গলা।

সুধার গলা আয়নায়। কোয়া-খসানো কাঁঠালের বোঁটার মতন গিঁট গিঁট কণ্ঠা মাংসে ঢাকা পড়েনি। বোতাম এঁটে দিয়ে বেণী দুটো কষে বেঁধে দিল। দোতলার ইনকাম ট্যাক্স অফিসারের বৌকেও ঝি ব্লাউজ পরিয়ে কাজল টেনে পান খাইয়ে বেতের চেয়ারে বসিয়ে দেয় বিকেলবেলা। হার্টের অসুখ ভদ্রমহিলার। সুধা অভদ্রমহিলা। ফস করে বলে বসল সুধা, 'তোর প্রমথদা এমনিতেই কাত! অত না সাজলেও চলবে।'

আয়নায় দেখল অঞ্জুর মুখ কালো হয়ে গেছে। বেরোবার সময় অঞ্জু থামল। 'আমার টিকিট কোথায়?'

কথাটা বলে মনে মনে কষ্ট পাচ্ছিল সুধা। টিকিট চাওয়াতে তিনখানা টিকিটই এগিয়ে দিল। একখানা হাতে রেখে দু'খানা ফেরৎ দিল অঞ্জু।

'মানে?'

'বদলে নিতে হবে না। তোমরা একতলায় বসলে আমি দোতলায়। তোমরা দোতলায় বসলে আমি একতলায়।'

'কেন?'

'সবই যখন জান তখন তোমার প্রমথদাকে সামলে রাখতে পার না!' বলে অঞ্জু খাটে গিয়ে শুয়ে পড়ল। সুধা ঘড়ি দেখল। সাড়ে পাঁচটা। টিপ টিপ বৃষ্টি এল। বড়দি পাশের ঘরে বসে পা চুলকোচ্ছে। প্লাস্টারের ভেতর ফোস্কা মত কি হয়েছে কদিন।

প্রমথ এসে দাঁড়িয়ে থাকবে। সিনেমায় গিয়ে কাজ নেই। দোতলার বিজুর হাতে টিকিট দিয়ে বেচতে পাঠিয়ে খানিক বসে থাকল। অঞ্জু সাড়াশব্দ না দিয়ে বেরোনোর শাড়ি ব্লাউজ খুলে ভাঁজ করে ট্রাঙ্কে রেখে দিল। ছ'টা বাজতে বারো। প্রমথ এসে ফিরে যাবে। টুক টুক করে বৃষ্টিতেই বেরোল।

প্রমথকে সামলাবে কি। নড়া-চড়াই করে না। চেয়ারে বসে থাকে। বড়দি ঘরে ঢুকলে বলবে, কি গ্র্যান্ড খোঁপা বেঁধেছ। সুধার অফিসে গিয়ে হাজির সেদিন। ক্যান্টিনে বসে বলল, রোজ এত সেজে আস। আর যারা আসে তাদের কাজের ক্ষতি হয় না। অঞ্জু ঘরেই থাকে সন্ধ্যেবেলা। বলবে, ইস কি ভুলই করেছি। আগে কি আর বোঝা গেছে এমন হবে পরে।

অঞ্জুর কাছে জানতে ভয় করে। বোঝা যায় না। চায়ের সঙ্গে আলুর চপ হলে খুশী রাখতে পারে না। অফিসের অজয়বাবু প্রমথর বয়সী অফিসে সুধাকে চেনে না। দরকার হলে অফিস পাড়ার বাইরে কথা বলে। সব সময় ভয়, সুধার সঙ্গে কথা বললে অফিসের কেউ যদি দেখে ফেলে।

এখন সুধা না থাকলেও অজয় আসে। সায়েন্স ছিল অজয়ের। অঞ্জু তার ফিলোসফির বই খুলে—স্পর্শ থেকে কি কি অনুভূতি হয় তা নিয়ে অজয়ের সঙ্গে কথা বলে। অজয় খাটে বসে ঘামে। অঞ্জু হাসে তখন। অজয় মাথা না তুলে আরও ঘামে। অঞ্জু মজেনি। ঐ এক খেলা।

বৃষ্টিতে ভিজে সিনেমা হলে আসতে আসতে অঞ্জুর কথার উত্তর দিচ্ছিল মনে মনে।

অঞ্জুর কথার পিঠে কথা খুঁজে না পেয়ে প্রমথর ওপরই রাগ হচ্ছিল সবচেয়ে। কি দরকার ছিল সিনেমার কথা পেড়ে। বুড়ো ভাম কোথাকার। প্রমথর সামনে অঞ্জু শান্ত হয়ে কথা বলে। তাতে আরও খারাপ লাগে। প্রমথকে দেখে হাসুক অঞ্জু। যেমন অজয়কে হেসে হেসে ঘামায়।

ওভালটিন খাওয়া হয়ে গেল সুধার। মোড়ের ঘড়িতে সাতটা বাজতে দেশ। বৃষ্টি নেই। অনাথ আশ্রমের ছেলেরা লাইন করে ফিরছে। আগে আগে লাঠি হাতে হাফপ্যাণ্ট পরা বুড়ো। পুরনো অনাথ। একটা মেয়ের সঙ্গে দুটো ছেলে এসে বসল। সুধা তাকিয়ে ছিল।

'বাঁদিকেরটা প্রেমিক।'

প্রমথ বলল, 'ডান পাশেরটি বুঝি ডিকশনারির অথর?'

'তা না। তবে কেমন চোয়াড়ে চোয়াড়ে। লাভার না।' বলে হেসে ফেলল। প্রমথ বলল, 'আমাকে তোমার লাভার মনে হয়?'

হা করে মৌরি ছুঁড়ে দিল মুখে। কতক টেবিলে পড়ল। হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল, 'খুব।' তারপর বলল, 'মীরাদি বলছিল দেখলে মনে হয়, তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।'

'তুমি কি বল?'

'উড়িয়ে দিই। বলি ওসব বিশ্বাস করবেন না। যতক্ষণ না বিয়ে হয় ততক্ষণ সব ফাঁকা।'

'ও।' সুধার সিনেমা দেখাবার কথা ছিল। অঞ্জু না আসাতে এখন চা খাওয়াচ্ছে। সুধা অ্যানাসিন আনানোতে মাথা ছাড়ল। প্রমথ অন্য মেয়ে বিয়ে করতে পারে।

কিংবা সুধার স্বামী অন্য লোক। প্রমথ নয়। হয়ত নয়।

পুরনো কথায় ফিরে গেল প্রমথ। বড়দির ভদ্রলোক সুনীলবাবুর সঙ্গে আলাপ হয়েছে প্রমথর। লোক ভাল সন্দেহ নেই। কিন্তু রসিকতার ভঙ্গী গায়ে জ্বালা ধরায়। সবাই একসঙ্গে থিয়েটার দেখে ফিরছে। অঞ্জু, সুধা, বড়দি, অজয়, প্রমথ আর সুনীলবাবু। হেদুয়ায় এসে প্রমথ বলল, 'ট্যাক্সিতে এসপ্ল্যানেড্ অব্দি গেলে হয়। ট্রামেও ত সেই-ই লাগবে।'

সুনীল বলল, 'আমরা মশাই ট্রামেই যাই।' খানিক হাসল সঙ্গে। ট্যাক্সি প্রমথও চড়ে না।

সুনীলবাবু আলোচনাকে কেন যে সাম্প্রদায়িক করে তোলেন। এই আমরা—আপনারা। বিশ্রী! শেষে সেই ট্যাক্সিতেই যেতে হল। ট্রামে অসম্ভব ভীড়। ভাড়ার জন্য প্রমথ একটা দুটাকার নোট এগিয়ে দিল। ট্যাক্সিওয়ালার খুচরো নেই। আগে-ভাগে খুচরো শুদ্ধ ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে সুনীলবাবু এমনভাবে ট্যাক্সি থেকে নামলেন, দেখে মনে হবে ছোটখাটো একটা

শীতলষষ্ঠী এইমাত্র জয় করে উঠেছেন।' বড়দির মুখে আনন্দ আলো হয়ে উঠেছিল।

বড়দির বন্ধু সুনীলবাবু। চেনে তাকে। খুব প্রেম। বড়দি সোয়েটার দেয়।

'অঞ্জুর কেউ আছে নাকি?'

'দেখনি তাকে? পাড়ার ছেলে। খুব চালাক। কদিন ঘুর ঘুর করল। দু-একখানা চিঠি ছুঁড়েছিল।'

'তারপর?' সুধা প্রমথকে দেখল। উঠে সোজা হয়ে বসেছে। বানিয়ে বলবে। অঞ্জুকে ভাল লাগলে সুধা খুশী। তাহলে প্রমথ বাঁচে। ফস্ ফস্ করে সিগারেট টানে। মন দিয়ে চাকরি খুঁজলে চাকরি হয়। সুধার পঁচিশ। কবে বিয়ে করবে। আয়নায় তাকালে গরমে ভেপসে ওঠা ভাতের মত নরম লাগে মুখের চামড়া।

সুধার নিজেকে দানশীলা মহিলা বলে মনে হতে লাগল। এইমাত্র এক সভায় দুঃস্থ অঞ্জুর হাতে প্রমথকে ব্যাগে পুরে সাহায্য হিসেবে যেন ঝোলাটা দান করে দিয়েছে।

ফিরে আরম্ভ করল, 'আমরা বলেছি—যাকে ইচ্ছে বিয়ে কর। কিন্তু দেখে করো। ছেলেটা কদিন নাছোড়বান্দা হয়ে ঘুরল। ম্যাট্রিক পাশ। ব্যবসা করে। অঞ্জুই সব বুঝে কানেকশন কাট আপ করেছে। সত্যিই ত, বি-এ পাশ করতে চলল অঞ্জু।'

মাথাটা ছেড়ে এসেছে। সুধা অঞ্জুকে ভবিষ্যৎ ভেবে চলতে বলেছে। নিজে তাই চলে। কিন্তু এসব করে কি হবে।

'পালিত রোডে একটু যাবে? ওখানে একটা ইস্কুল আছে।'

প্রমথ বুঝল গান বাজনা শেখার ইস্কুল। কদিন ধরে বলছে।

'বেশ ত বসে আছি। বৃষ্টি হয়ে গেল একটু আগে। ভিড় বাইরে।'

'না। আমি যাব।'

প্রমথ বলতে যাচ্ছিল—'বেশ ত, তুমি যাও।' কথাটা অকৃতজ্ঞের মত শোনাবে বলে বলতে পারল না। অকৃতজ্ঞ ভাবল কেন। কৃতজ্ঞতা ব্যাপারটা জিনিসপত্তর দেওয়া নেওয়া নিয়ে হয়। প্রমথ জানে সে সুধাকে ভালবাসে। মুশকিল হয় সুধার দিকে তাকালে। বমি আসে। প্রমথ তখন মনে মনে বারে বারে আওড়ায়, সুধাকে ভালবাসি। আমি সুধার লাভার। সুধা একা। প্রমথ ভাবতে গিয়ে দেখল সে সুধাকে ভালবাসে না।

সুধা একটা মেয়ে। বয়স পাঁচিশ। কলেজ ছাড়ার পর পাঁচ ছ বছর যাতায়াত আছে। মাঝে মধ্যে ফাঁকা পথে পাশাপাশি হাঁটে। প্রমথ প্রথম প্রথম বিয়ের কথা বলত। সুধা উড়িয়ে দিত। এখন সুধা বিয়ের কথা বলে। প্রমথ উড়িয়ে দিতে পারে না। চুপ করে থাকে। প্রমথ সুধার কাছে খুচরো, নোট মাঝে মাঝে নিয়ে ফেলেছে। হাতেও থাকে না। দেওয়া হয়নি।

এখন ভাল না বাসাটা প্রমথ ঢেকে রাখতে চায়। ঢেকে রাখতে গিয়ে চুপ করে থাকে। কথা বললে বিরক্তিতে যদি বেফাঁস কিছু বেরোয়।

সুধাকে সহানুভূতি জানান যায় না। করুণা করার মত কিছু হয়নি সুধার। চাকরি আছে। পেনশন পাবে শেষ বয়সে। ছেলেবন্ধু, ইচ্ছে করলেই পেতে পারে।

করুণা প্রমথকে করা যায়। ছোট চাকরি করবে না, অবিশ্যি পাচ্ছেও না। এখন বাবা মা আছে—বয়স আছে। যোগাড়-যন্ত্র করে এখনই ঢুকে পড়া উচিত। যাত্রা দলের সং। ওসব ঝেড়ে ফেলে সময় থাকতে সোজা হয়ে দাঁড়ান উচিত।

প্রমথ উঠে দাঁড়াল। 'চল তোমার ইস্কুল কোথায় দেখি।'

'কাজ নেই। তুমি বরং বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাক। আমিই দেখছি।'

প্রমথ হাসল। এরকম দাঁত চেপে হাসলে তাকে সবচেয়ে সুন্দর লাগে। মাঝে একটা মেয়ের সঙ্গে সবকিছু ঠিক হয়েও ভেঙে গেল। তার কথা। এখন মাথাটা একদম ছেড়েছে।

'তোমার বোধহয় মন ভাল নেই।' অঞ্জুর বিকেলের কথাটা ভেবেই বলল সুধা। প্রমথকে সামলাতে পারে না। সামলাতে হলে মেয়েদের যা যা থাকা দরকার সুধার তা নেই। টিফিনে বসে রুটি ছানা আপেল চিবোতে খারাপ লাগে। অনেকদিনের ভাল খাওয়ার লাবণ্য একদিনে যদি হয়ে যেত। চোয়াল নাড়ান কি একঘেয়ে।

'ঠিক ধরেছ।' মুখে হাসি লেগে আছে প্রমথর।

সুধা ভাবল, কি ধরেছি। অঞ্জু আসেনি তাই মন খারাপ? পয়লা নম্বরের চীট্! অঞ্জুর গা ভর্তি। ফ্রকের বাইরে এই সেদিনও পাঁশুটে পা ঝুলত। বিনিয়ে বিনিয়ে ইতিহাস মুখস্থ করত। প্রমথ বলত, অঞ্জুর ইতিহাসের গলাটা ভাল। শেষে বুঝিয়ে বলত, ইতিহাস পড়লে মনে হয় পাঁচালি পড়ছে। প্রমথকে তখন অঞ্জুর দিকে ঝুঁকতে দেখা যায়নি। এখন প্রমথ প্রায়ই অঞ্জুকে দেখে। সোজাসুজি। কিছু বলাও যায় না। সন্দেহ হলে নিজেকে নীচ মনে হয়। সুধা কেন যে শুকিয়ে যাচ্ছে।

'ঠিকানা জান ইস্কুলটার?'
'না। খুঁজে নিতে হবে।'
'এত বড় রাস্তা। কোথায় খুঁজবে?'
'ক'পা এগোলেই পাব। কেন আমার সঙ্গে হাঁটতেও খারাপ লাগে আজকাল?'
'এই দেখ। কি মুশকিল।'
সুধা কি একটা শৌখিন নাম বলল, ইস্কুলটার। ধানেশ্রী। বোধহয় কোন রাগের নাম।
সুধার গান কোনদিন শোনেনি। গাইবে বলে একদিন মাঠে বসে খানিকক্ষণ গুনগুন করেছিল। আশেপাশে লোকজন বলে আর গাওয়া হয়নি। তাছাড়া দুটো একটা ছেলে তাকাচ্ছিল। সুধা ফস করে বলে ফেলেছিল—খচ্চর! কথাটা শুনে প্রমথর মনে হয়েছিল—নতুন জুতো পরে ঘোড়ার গরম পায়খানায় পা দিয়ে ফেলেছে। সুধাকে এত খারাপ লাগছিল। খচ্চর বলল কেন? এমন ত ছেলেরা ঘোরেই। না তাকালেই হয়।
'তোমাকে বাড়িতে পেঁছে দিয়ে আসি।'
'না।'
'দিয়েই চলে আসব।'
'সে হয় না।'
'অজয়বাবু যায় যে।'
'অজয় ত ছোটদের পড়ায়। তুমি কি করবে বসে বসে? অঞ্জু তোমার সামনে জোরে পড়তে লজ্জা পায়। পড়তে পারে না।'
অঞ্জু লজ্জা পায় না কচু পায়। এখন যদি প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে বাড়ি যায় তাহলে টিকিট কাটা না কাটার ব্যাপারটা পরিষ্কার হয়ে যাবে। হয়ত অঞ্জুকে একদম টিকিট কাটতে পাঠায়ইনি।
তাছাড়া অঞ্জুর সামনে এখন প্রমথকে ফেলে দেবে না সুধা। যা পাবে তাই খাবলে তুলবে। প্রমথটা একটা ছাগল। ভাবলেশ নেই মুখে। নেশা করে নাকি? মোদক। না হোক ভাঙ্।
'হাঁটতে কষ্ট হচ্ছে তোমার?'
প্রমথ বলল 'না ত।'
এই একটা উত্তর হল! আগে হলে প্রমথ বলত, 'আস্তে হাঁট না। পথটা শেষ হয়ে যাচ্ছে যে!'
সে কথা থাক।
সুধা এখন কি করে এই আটটা না বাজতে অঞ্জুর সামনে গিয়ে দাঁড়ায়।

বই সামনে রেখে কোনদিকে না তাকিয়ে ফিক্ করে হাসবে অমু। জিভ দিয়ে ঠোঁটের গা ঘেঁষে সরু গজদন্তটাকে খোঁচাবে।

হয়ত বলবে, ইংরাজী ছবি ছোট হয়! সব নষ্টের গোড়া প্রমথ। এই লোকটা। পাশে পাশে হাঁটছে।

ধুতি পাঞ্জাবি পরা নেশা করা শয়তান। মুখে বলে, সুধা কিছু ভাল লাগে না। অথচ মেয়েগুলো মাছির মত গায়ে এসে লাগে।

মোড়ের মাথার দেবদারু গাছে ক্রেন লাগিয়ে লাল গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে। তারে লাগবে বলে ট্রাম কোম্পানীর লোক আলো জেবলে ডালপালা ছাঁটবে। ও ফুটপাথে উঠল। প্রমথ পেছনে পড়ে গেছে। ফিরে দাঁড়াল সুধা। প্রমথ নেই।

ট্রাম কোম্পানীর লোকেরা দেবদারু গাছটার গায়ে কল চালাচ্ছে। কড়া আলো। ট্যাক্সি ড্রাইভার, লাইন মেরামতের মিস্ত্রি জটলা বেঁধে দাঁড়ানো। জায়গাটা বিয়ে বাড়ির মত। এখন ডাল কাটবে। ঝাঁকিতে গাছটা আগাগোড়া দুলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে আলোর মধ্যে সারা গা জুড়ে পাতাগুলো কেঁপে থেমে গেল।

প্রমথ উল্টোদিকের ফুটপাথ দিয়ে তাড়াতাড়ি হেঁটে আসছে। মুখে সিগারেট। আগুন খুঁজছিল—পায়নি। পরনে ধুতি পাঞ্জাবি। পেছনে আলোর মধ্যে দেবদারু। চাদরের ছায়ায় মুখ দেখা যাচ্ছে না প্রমথর।

ভালবাসা কি। সুধা নাক চুলকোল। একটা লোকের জন্যে কষ্ট হলে, টান হলে, তার নাম ভালবাসা! প্রমথ আসছে। হাতে কোঁচা। নাক, মুখ, চোখ, চুল, গানের গলা ভাল না হলে টান শুকোয় কেন। পর পর দুটো লরি গেল। কোনোটায় কিছু নেই। সুধা জানে না, নাক মুখ চোখ সুন্দর মানে কি। আরও খানিক এগোলে পি জি হাসপাতাল। আউটডোর সকাল নটার পর বন্ধ হয়ে যায়। টিকাল নাক, বাঁকা ভ্রূ, টানা চোখ। বিড়ির দোকানে পোড়া তামাকের গন্ধ। রিকশা গেল। ওসব জায়গারটা জায়গায় থাকলেই হল। একটা লোকের কাছে সিগরেট হাতে নিয়ে কি বলছে। নিশ্চয়ই আগুন। পেল না।

প্রমথ কাছে আসতে একটা দশ নয়াপয়সা দিয়ে বলল, 'কিনে নিয়ে এসো।

একটা। বেরোনোর সময় দেখলাম মার লক্ষ্মীর আসনে দেশলাই নেই।'

সুধাকে দেশলাইটা দিল। কোন কথা নেই। সো সো করে সিগারেটে টান দিচ্ছে।

প্রমথ আগের মত হও। আদর কর। অঞ্জুকে কি দরকার। অঞ্জু ভালভাবে জানেও না তুমি কেমন লোক। কাছে এসে হাঁপাবে। পালাবার জন্যে জলে ডুববে। প্রমথ আগের মত হয়ে যাও। এ ভাবে চললে মরে যাবে। ভাগলপুর গিয়ে মোটা হয়ে আসব। আগের মত হব। দেখলে চোখ ফেরাতে পারবে না। আমার চোখ সুন্দর না প্রমথ? দেখ।

পথের মধ্যে পা ছড়িয়ে কাঁদতে ইচ্ছে হল সুধার। অনেক লোক। শীত। আলো। এটা পীচের রাস্তা। কাঁদারও উপায় নেই।

প্রমথর হাঁটতে ভাল লাগছে না। ছিট ছিট বৃষ্টি। ঘড়িতে আটটা পাঁচ।

'ঐ ত তোমার গানের ইস্কুল।' প্রমথ আঙুল দিয়ে দেখাল। ছিমছাম ঘর। পিয়ানো শিখছে একটা লোক। পাশের ভদ্রলোক কথা বললেন। 'কে শিখবেন?'

'আমার এক বান্ধবী।' সুধা বলল।

বান্ধবী না, সুধা নিজেই শিখবে। প্রমথর আড়ালে শিখবে। হঠাৎ জানতে পেরে অবাক হবে প্রমথ।

'রেট কি রকম?'

'সপ্তাহে একদিন করে। মাসে দশ। সময় সব মিলিয়ে সাড়ে সতের।'

'কোন সময় শেখান।'

'স্টুডেন্টের সুবিধা মত।'

'সন্ধ্যের দিকে?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়ল। নিজের সময় সুবিধার আঁচ নিল সুধা।

সন্ধ্যেটা খারাপ কাটে। কাজ থাকে না। ঘুম পায় না। সব খারাপ লাগে। তখন গীটার বাজানো শিখবে। ছোট নীল রঙের একটা ঢাকনা দেওয়া গীটার নিয়ে সাবধানে ডবল-ডেকার থেকে নাববে। বাস থেকে এইটুকু পথ হেঁটেই পার হবে। দোতলার জানলা থেকে দু-একখানা মুখ বেণী দেখবে—ঘাড়—গীটার ধরার আলতো ভঙ্গী। তখন সুধার বয়স দূর থেকে আঠারো উনিশ মনে হবে।

'সেভেনথ্ আমাদের অ্যানুয়াল ফাংশান। একটা টিকিট নিন্ না।'

প্রমথ বলল, 'আমি ওসব দেখি না।'

প্রমথর কথায় ভদ্রলোককে চমকাতে দেখে সুধা সামলে নিল। 'শনিবার আপনাদের খোলা থাকবে ত?'

'সামনে ফাংশান বলে এখন রোজ খোলা থাকবে।'

'তাহলে সেদিন ভর্তি হয়ে টিকিট নেব। দুখানা রাখবেন।'

কি ঘটতে পারে তা এখনই প্রমথ আঁচ করতে পারে। এমনও ত হতে পারে—

শনিবার ফিফ্‌থ। সেভেন্থ সোমবার। দুখানা টিকিট নেবে সুধা। একখানা বেশী। প্রমথর জন্যে। প্রমথ সময় মত যাবে না কিন্তু। ঘরে বসে থাকবে। সুধা নিমরাজী হয়ে ফাংশান শুনবে। শেষের দিকে প্রমথর কথা ভুলে যাবে। তখন স্টেজে গান হচ্ছে। রবীন্দ্রসঙ্গীত। গানে মনের কথা। সুধা সব ভুলে যাবে। চোখ কান মন দিয়ে গেঁথে নেবে সব। ভুলে যাবে সেদিন সে অফিসে যায়নি। একদিন ক্যাজুয়াল লিভ গেল। যাক্‌গে! বাসন্তী রঙের আঁচলটা পিঠে টেনে বাইরে এসে দাঁড়াবে। এমনই মেঝে সাবধানে না হাঁটলে পা হড়কে যায়। গোড়ালিতে ব্যথা। কোণের টেবিলের মেয়েটা হেসে হেসে কথা বলছে। সুধা অমন হেসে কথা বলতে পারে? ভেবে দেখল, না। আয়নায় হাসলে গালদুটো এমন হয়—তাকানো যায় না। তাছাড়া বিশ্রী লজ্জা।

এমন সময় চশমা পরা হাসিমুখ এক ভদ্রলোক এগিয়ে আসবেন। সুন্দর জামা কাপড়—মুখ চোখও বেশ।

'আপনিই নতুন ছাত্রী। কনক বলছিল। বেশ। পরে আলাপ হবে আরো—'

সুন্দর লোকটা ভিড়ে মিশে যাবে। একটি মেয়ে, প্রোগ্রামের বইখানা হাতে মোচড়ানো, সেই সুন্দর লোকটার পেছনে ছুটবে। 'চঞ্চলদা, আমার ঘুঙুর পাচ্ছি না। কি সব্বনাশ!' মেয়েটার চাঁপাকলি আঙুল। কি সুন্দর। এসব ভেবে সুধা মুষড়ে পড়বে। ডান হাতের ঘড়ির ব্যান্ড হাতে এঁটে বসেছে। একটা নীল শিরা চামড়ার ওপর ফুলে উঠেছে।

ফাংশানের পর এক ভদ্রলোক দাঁড়িয়ে থেকে বাসে তুলে দেবেন। এসপ্ল্যানেড পাড়া। সাহেব মেম হাত ধরাধরি করে হাঁটছে। দামী তামাকের গন্ধ। বৃষ্টিতে নিওনের বিজ্ঞাপনগুলো ভিজছে। ভদ্রলোক হাঁটতে হাঁটতে কথা বলবেন। বারুইপুরে এক ইস্কুলে পড়ান। বলবেন, 'আমি আসি,

শুক্রবার।' বাহাতে মল মলে ঢাকা সেতারের মত কি। বীন্ বোধহয়। খুব ভারি আওয়াজ হয়। গম গম গম গম। বাসে উঠিয়ে দিতে দিতে বলবে— 'আলাপ হবে পরে। আসছেন ত ?'

বাসের জানলায় বসে প্রথম কথা মনে হবে, প্রমথ যদি আসত। কোথাও যাবে না। ব্যাঙ একটি। মনটা কদিন খুশীতে থাকবে। নতুন গীটার। গীটারের পছন্দ করা ঢাকনা। ব্লাউজের ভেতরে লকেটের মত নোটেশন লেখার সরু নিবের কলম একটু একটু দুলবে। কখনও কখনও টাটকা রজনীগন্ধার ডাটো আঁটির মত লাগবে কলমটাকে।

অবশ্য এত সব নাও ঘটতে পারে। যা দু একটা টাকা ব্যাগে পড়ে থাকে তাও হয়ত সুধার মা মেথরের মাইনে দেবার জন্যে ঝলোঝুলি করে চেয়ে নিতে পারে। আসলে হয়ত পুরোটাই প্রমথর ভাবনা।

প্রমথ পাশে বসে উসখুস করছিল। খুট করে শব্দ হল।

দীর্ঘ ঘাড় খোলা পশ্চিমা তরুণী নামলেন গাড়ি থেকে। পেছনে স্বামীর মত একটা লোক। অন্তত এই মেয়েটির সঙ্গে এরকম লোকই লাগসই হয়। হাতে একটা ভারি বাচ্চা। এ বাড়িটা ফ্ল্যাট বাড়ি। দুজনেই গানের ঘরে তাকাতে তাকাতে গেল। ঘরটা রাণীর হাট না। সুধাও কি উপজীবিনী। না, তাও নয়। কাট কাট করে তাকিয়ে থাকল প্রমথ। পশ্চিমা তরুণীটি চোখ ফিরিয়ে নিল।

পথে বেরিয়ে সুধা বলল, 'একটু হাঁটবে।'

'নিশ্চয়ই।' বলে মনে হল 'নিশ্চয়ই' না বলে বলা উচিত ছিল 'চল না'।

কিন্তু একথা সত্যি প্রমথর সুধাকে ভাল লাগছে না। আগে লাগত। এখন ভাল না লাগাটা খারাপ হয়ে বুকে বসে যাচ্ছে। মনে লাগে। প্রমথ তোমার ভাল লাগা উচিত। প্রমথ পারে না। কোন যোগ নেই এই সন্ধ্যার সঙ্গে। সিনেমায় না গিয়েও এতগুলো পয়সা গেল সুধার। অথচ সন্ধ্যেটাই মাটি।

কিছুদিন আগে সুধাকে নিয়ে এক কাগজের অফিসে গিয়েছিল। সম্পাদক টেবিলে বসে। এ কাগজে প্রমথ লেখে। সম্পাদকের বয়স বছর চল্লিশ। পরিষ্কার লোক। দোহারা চেহারা। গল্প লিখিয়ে হিসেবে নাম আছে।

বাজারে বইও কাটে ভাল। বৌ ছেলে মেয়ে আছে। শহরতলিতে বান্ধবী আছে। সুধা বাথরুমে যেতেই বললেন, 'ভুষিমাল জোটালে কোত্থেকে?'

কথাটায় প্রমথর লেগেছিল। অবিনাশদা, ভালবাসার দুই চেহারা। কখনও উদার কখনও দয়ামায়ার বালাই থাকে না। মুখে এসব বলতে পারেনি প্রমথ। কেমন প্রবন্ধর মত শোনাবে বলে। অস্পষ্ট কিছু একটা বলেছিল।

অবিনাশবাবু চাপা দিয়ে দিয়েছিলেন, 'মেয়েটাকে নষ্ট করছ কেন?

উত্তর দেয়নি প্রমথ। দুই মাছমারা চুপ করে হাসছিল। মাছটা বাথরুমে। নষ্ট কথাটায় পুরুষলোকের এত সুখ!

কিন্তু গরুর ভুষি না হলেও সুধাকে ভাল লাগছে না। খারাপও লাগছে না। অপমান করা যায় না। ছেড়ে যাওয়া যায় না। সুধা বড় একা। আমি প্রমথ দত্ত, সুধাকে আগে ভালবাসতাম। এখন কি করি জানি না। তবে জানি সুধার সঙ্গে আমার যোগ নেই। অবিনাশদা সেন্ট-পারসেন্ট কারেক্ট না হলেও প্রায় ঠিক। কৃতজ্ঞতার এ এক সং সাজানো প্রাণান্ত। সুধা তুমি চলে যাও—একথা মনে এলেও মুখে এল না।

'কথা বলছ না যে। আজ তোমার কি হল?'

'কিছু না। এই ত তোমাদের বাড়ির মোড়। এবারে এস।'

'আর একটু হাঁটতে আপত্তি আছে।' কথাটা বলে সুধা সরে গেল। পুরুষলোক সুধা চেনে। ঘড়িতে আটটা পনের।

প্রমথর আর হাঁটতে ভাল লাগছিল না। সন্ধ্যেটা জলে গেল।

অথচ কাল সন্ধ্যেবেলা এই সময়টা দিব্যি কেটেছে। কাল বিকেল পাঁচটা থেকে নটা অবধি সুধাদের বাড়িতেই ছিল। সুধার অফিস ছুটি হয় পোনে পাঁচটায়। এটা ওটা কেনাকাটা করে বাড়ি ফিরতে ছটা সোয়া ছটা বাজে। বিকেলে একটু মেঘ ছিল। সুধার মার জ্বর, পাশের ঘরে শুয়ে। কপালে হাত রেখে বিছানায় কাত হয়ে রেডিও শুনছে অঞ্জু।

'প্রমথদা। কখন এলেন।' তারপর অস্বস্তি মিশিয়ে বলল, 'আপনি ঐ চেয়ারটায় বসুন না। একেবারে আপনার দিকে পা ছড়িয়ে শুয়ে আছি। পাপ হবে।'

'থাকো না। দেখতে ভাল লাগছে।'

'মুশকিল। আপনাকে নিয়ে হয়রাণ আমি।' বলে উঠে বসল। কোলের কাছে হাত জড়ো করা। 'মেজদি এল বলে।' তারপর হেসে বলল, 'বড় আলোটা জেবলে দেব? আমার আবার চোখের যন্ত্রণা কিনা।'

'না, না থাক।'

'তবে বসি।' বসে দেখল প্রমথ তখনও তাকিয়ে আছে। বুকের কাপড়টা টেনে দিল। একবার চোখ কোঁচকাল। কি হয়েছে লোকটার। কিছুদিন এমনি তাকিয়ে থাকে সোজাসুজি। আমি অঞ্জু। আমার কি প্রাণ নেই। এইত আমি নিঃশ্বাস টানি।

চোখ কুঁচকে চোখে বকলো। 'আমাকে দেখতে পাচ্ছেন না। বড় আলোটা জবালি।'

বারণ করবার আগেই জেবলে দিয়ে বসল। সেই দেওয়াল। নীল রঙ উঠে গেছে। আগেকার মেনকা আয়না। ইস্কুল কলেজের বই টাল করা, তাকে। জুতোর র‍্যাক। কাচের আলমারিতে পুঁতির মালার পাশে চীনেমাটির পুতুল। ছাদ ঘেঁষে কখানা ছাতকুড়ো মাখানো ছবি ঝুলছে। এর মধ্যে অঞ্জু নতুন। বয়েস উনিশ। ফোর্থ ইয়ারে পড়ে।

'যদি ক'বছর পরে জন্মাতাম অঞ্জু!'

'তাহলে কি হত। আমাকে পেতেন? কক্ষনো না। মেজদি আসুক, বলে দেব।'

প্রমথ জানে অঞ্জু বলবে না। অঞ্জুর প্রমথকে ভাল লাগে। কিন্তু প্রমথর কি ভাল লাগা ঠিক। এ ত পাপ। মানে অন্যায় আর কি। সুধা বাড়ি নেই।

বড়দি ঘরে ঢুকল। বাঁ পা ফ্রাকচার। প্লাস্টার জড়ানো। টেনে টেনে খাটে এসে বসল। প্রমথর চেয়ে অল্প ছোট। তবু প্রমথ বড়দি ডাকে। সুধার লাভার বলে সেই সুবাদে সুধার বড়দি তারও বড়দি।

বিছানায় শুয়ে পড়ল বড়দি।

রাগের ভান করল প্রমথ। এরকম দেখাতে হয়। 'এখনও অফিস থেকে ফেরেনি। কার সঙ্গে মেশে আজকাল?'

বড়দি খুশি হল। 'আজ বকে দেব।' তারপর থেমে বলল, 'কেনাকাটা করছে বোধহয়।'

প্রমথ বড়দির সামনে অঞ্জুকে আমল দিল না। বড়দি ঘরে শুয়ে থাকে। ঠাণ্ডা। তার চোখে ধুলো দেওয়া কঠিন।

অঞ্জু কোমরে কাপড় জড়িয়ে ঘরে ঢুকল, 'দেশলাইটা দিন মশাই। উনুন ধরাব।'

বড়দি বলল, 'ঠাকুর বাড়ি গেছে। ফিরতে জানুয়ারী যাবে।'

প্রমথ বলল, 'আমাকে ঠাকুর রাখ। ভাল রাঁধি।'

'অজয়ও তাই বলছিল। অজয় সকালের ভাত দেবে। তুমি সন্ধ্যের।'

অঞ্জু মজা পেল, 'তাহলেই হয়েছে।' চোখ কুঁচকে তাকাল। মনে মনে বলল, দৌড় জানি।

অঞ্জু চলে যেতে বড়দি বলল, 'সুধার শরীরটা সারছে না মোটে। তারপর এতক্ষণ টইটই।'

প্রমথর সঙ্গে সুধা মাঝে মাঝে বেরোয়। কথা বলতে বলতে অনেক হাঁটে। শরীরে পোষায় না। বারণ করলে জেদ বাড়ে—'অরাও হাঁটব।'

'ভাল ডাক্তার দেখিযে কোন টনিক খেলে পারে।'

'খাওয়ার ত কিছু কম পড়ছে না। গায়ে লাগে কোথায়?' তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'তুমি শক্ত হাতে না ধরলে কিচ্ছু হবে না। সে চাকরিটার কি হল?'

কত চাকরির জন্যেই চিঠি লিখেছে প্রমথ। তিন কপি করে টাইপ। ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট। কতদিন আগে ম্যাট্রিক পাশ করেছে। সে সময়ের ক্লাস থ্রীর ছেলেরাও এম এ পাশ করতে চলল।

ভালবাসার লোকের টাকা দরকার। সবার থেকে আলাদা করে ভালবাসার মত উদ্যোগ চাই। ভাবলেই বন্দী লাগে।

সুধার মা বড়দিকে থার্মোমিটার দেখতে ডাকল। অঞ্জু রান্নাঘরে। রাধু, বিবি পাড়ায় বন্যাত্রাণ কমিটির জলসায় আবৃত্তি করতে গেছে। বড়দি পা টেনে টেনে ওঘরে গেল। সুধার মার গলা শোনা যাচ্ছে। 'অজয় আসবে। রাধু, বিবি কোথায়? ডাকতে পাঠা।'

খচ্ করে দেশলাইটা ছুঁড়ে দিল অঞ্জু। 'ক্যাচ্ ধরুন।' চমকে ধরতে গিয়ে হাত থেকে পড়ে গেল। 'কিচ্ছু না আপনি। শুধু ঘ্যান ঘ্যান করতে পারেন।'

'অঞ্জু তুমি খুব সুন্দর।'

'তাই নাকি? জানাতে হচ্ছে মেজদিকে।' থেমে বলল, 'মা বসতে বলেছে। গা ধুয়ে এসে রুটি আর তরকারি দিচ্ছি।' তোয়ালে সোপকেস হাতে নিয়ে যাওয়ার আগে আর একবার দেখল প্রমথকে। 'অঞ্জু আমার খুব দরকার তোমাকে। এস।'—কি করে প্রমথদা এসব বলে। আমি কুকুর না!

পাশের ঘরে ঢুকেই বেরিয়ে এল অঞ্জু। অজয় কখন এসে পড়াতে বসেছে।

প্রমথ দেখেছে। বলল, 'বেরিয়ে এলে। যাও ওঘরে।'

'এভাবে যাওয়া যায়?' শাড়ি, কোমরে পেঁচান তোয়ালে, চোখ দিয়ে দেখাল।

'অজয়ের মাথাটি ত বেশ চিবিয়েছ!'

'এই মারব!'

'মার। আমাকে ত তোমার লজ্জা নেই। যত লজ্জা ওঘরে।'

'হাটের মধ্যে লজ্জা থাকবে না?' বলতে বলতে কলতলায় চলে গেল। প্রমথ ভাবল, তাহলে সে কি হৃদয়ে বসে আছে!

একটু পরে বড় আলোটা জেলে দিয়ে ফিরে চুল বাঁধতে বসল। আয়নায় অঞ্জুর মুখ দেখতে পাচ্ছে প্রমথ।

প্রমথর একঘেয়ে তাকিয়ে থাকা দেখে আয়নায় চোখ মটকে শাসন করল অঞ্জু। প্রমথ চোখ নাবিয়ে ভারি হয়ে মেঝের দিকে তাকিয়ে থাকল। এভাবে তাকিয়ে থাকলে আগের মেয়েটি দুর্বল হয়ে পড়ত। চুল বাঁধা হয়ে গেল। ফিরে বলল, 'খাবার দিচ্ছি বসুন।'

রুটি, বড়ার ঝাল, তরকারি—কম পড়লে খানিক গুড় থালায় করে ধরে দিল।

এমন সময় সুধা ঢুকল। খাবার দেওয়া দেখল।

অঞ্জু দৌড়ে গিয়ে একটা কাপড়ের প্যাকেট কেড়ে নিল সুধার হাত থেকে।

'সায়ার কাপড় এনেছিস্?'

সুধা চুপ করে অঞ্জুকে দেখল। টেবিল ফ্যানের সামনে গিয়ে পিঠ দিয়ে দাঁড়াল।

'কোথায় কোথায় ঘুরিস? কখন থেকে বসে আছে।' বড়দি বকল।

সুধা চোখে কাজল দিলে প্রমথর ভাল লাগে। আজ দিয়েছে। কিছু দেখল না কিন্তু প্রমথ। মুখের দিকে তাকাবেই না। লকেটের ওপর কিংবা বুকের ওপর তাকাচ্ছে। প্রমথর আশায় জল ঢেলে দিতে পারত যদি এক্ষুনি সব শুকিয়ে যেত। টিফিনে ও ছানার পাট তুলে দেবে। কেন যে শরীরটা থাকে।

'বস একটু।'

'বসেই আছি।'

অঞ্জু চা নিয়ে এল। হাতে চা ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'দেখুন ত চিনি হয়েছে কি না।' গম্ভীর মুখ। মেজদি এখন এল কেন। এখন তাকে সবচেয়ে ভাল দেখাচ্ছে। ফিরে চুল বেঁধেছে।

প্রমথ সুধাকে বলল, 'চান করে এস না। বসেই আছি।' একই নিঃশ্বাসে অঞ্জুকে বলল, 'ভাল হয়েছে চা। আদা দিয়েছ বুঝি?'

'হু। আদায় মাথাটা ছাড়বে আপনার।' হেসে পাশের ঘরে গেল। প্রমথ নড়ে চড়ে বসল।

যদি ক'বছর পরে জন্মাতাম। কি হত। যন্ত্রণায় পড়তাম না। কালো ঝকঝকে মণি, গাদা করা চুলের খোঁপা ঘাড় ঠেলে মাথায়, শাড়ির জরির সঙ্গে অঞ্জু মিশে আছে। মাঝের পর্দাটা দরজার ওপর তোলা।

কাকের মত একটু জল ছুঁয়ে চলে এল সুধা। অঞ্জুকে একা রাখা ঠিক না।

'ওরকম কলসীবাবুর মত সেজে এসেছ কেন? পাঞ্জাবির ওপরের দুটো বোতাম খুলে দাও।' সুধা ধমকাল।

শীত করছিল বলে বোতাম দুটো একটু আগে আটকে দিয়েছিল। খুলে দিল।

হাই ভেঙে সুধা বলল, 'উঃ! কদিন ধরে অফিসের ছেলেগুলো আসছে। সেই কবে বিজয়া গেছে। এখনও মাসীমা বলে প্রণাম করতে আসে। বুঝলি বড়দি, কাল ঘোষ বলছিল, আসবে। দিলাম বলে, রবিবার কাটোয়া যাচ্ছি।' প্রমথর দিকে ফিরে বলল, 'বলত কত আর পারা যায়? পয়সার একটা খরচ আছে ত।'

প্রমথ পয়সার কথায় কুঁচকে বসে থাকল। সুধা সাতাশ টাকা পায়। দেওয়া হয়নি। এ্যাপলিকেশনের চালান জমায় অনেক টাকা যায়।

প্রমথকে চুপ দেখে সুধা বলল, 'তারপর?' মাথার ওপর চুল চুড়ো করা। এবারে আঁচড়াবে। প্রমথ এতক্ষণ যেন সুধাকে একটা লম্বা গল্প বলছিল। শুধু শেষটা বাকি।

'রোববার নিত্যর বান্ধবীর ওখানে গেলাম। নিত্য নিয়ে গেল। মেয়েটির খুব পছন্দ আমাকে।'

'বেশ।'

'থাম। সব বলি আগে। নিজের জন্যে না। মেয়েটির ছোটবোন চায়নার জন্যে।'

'দেখা হল?'

'না। মধ্যমগ্রাম থেকে এসে দিদির হস্টেলে সারাদিন ছিল। দিদি নার্স। সন্ধ্যের ট্রেনে ফিরে গেছে। না হলে ফিরতে রাত্তির হয়ে যাবে। আমাদের পৌঁছনোর খানিক আগে। নিত্য ত আগে বলেনি, কারও সঙ্গে দেখা করতে হবে। জানলে আরও আগে যেতাম।'

'সামনের দিন শেয়ালদায় গিয়ে রিসিভ করে এনো। দেখা হয় যেন।'

'চিনি না ত। ধ্যুস্! পাগল হয়েছ। মোটে ফার্স্ট ইয়ারে পড়ে।'

'তাই ত ভাল। একেবারে ডাশা!'

সুধার সঙ্গে বেশীক্ষণ কথা বলা যায় না। চোখ মুখ ওলটালে খারাপ দেখায়। তাই করছে। এবারে খুব যা তা লাগল। ডাশা মেয়ে ভাল। কথাটা মনে এলেও, মুখে খারাপ লাগে। অবিনাশদা গরুর খাবার ভূষিমালের কথা বলেছিল। কে পশু। প্রমথ পশু। সুধা ডাশা বলল কেন। এমন কথা বলি না আমি।

প্রমথ অঞ্জুকে দেখবার জন্যে উঠে দাঁড়াল। সুধা রুটি খেতে গেছে। এখন অনেকক্ষণ চিবোবে। অজয় হাতপাখার কাঠি ভাঙছে বসে বসে। মজা কুড়োচ্ছে অঞ্জু। আলনার কাপড়ের পাশে দাঁড়িয়ে একটা একটা করে কথা ছাড়ছে। সুধার মা বালিশে হেলান দিয়ে সকালের কাগজ দেখছে।

প্রমথ অজয়ের পেছনে খাটে এসে বসল। অঞ্জু দেখল পাশের ঘরে মেজদি রুটি খুঁজছে মিটসেফে। দেখে মার পাশে গিয়ে বসল।

সুধার মা ঝাঁঝি দিয়ে উঠল, 'তুই পড়না গিয়ে।'

'প্রমথদার সামনে চেঁচিয়ে পড়তে লজ্জা করে।' মুখে হাসি।

সুধার মা অঞ্জুকে কি বলল। শুনতে পেল না প্রমথ। বুঝতে পারল, সন্ধ্যেবেলা তার আসাতে বাড়ির পড়াশুনোর অসুবিধে হচ্ছে। অঞ্জু ঝগড়া করে উঠে দাঁড়াল।

ব্যাপার বুঝে এ ঘরে চলে এল প্রমথ।

বড়দির সঙ্গে কথা হল খানিক। ছুটি-ছাটার সুবিধে কতখানি। এসব।

সুধা বলল, 'কাল সিনেমায় যাবে?'

কথাটা শোনার আগেই কি যেন বলবে ঠিক করে রেখেছিল প্রমথ। বলে ফেলল, 'অঞ্জু কোথায়?'

'ঐ ত জানলায় বসে।' আঙুল দিয়ে দেখাল সুধা। দেখিয়ে রাগ হল। তুমি পুরুষলোক প্রমথ। আমার ছোটবোনের খোঁজে তোমার কি এত দরকার?

অঞ্জুও বলিহারি। ছবির হিরোইনের মত শাড়িতে পা মুড়ে খোঁপা ভেঙে জানালার শিকে মাথা রেখে কাঁদতে বসেছে।

আজকে অঞ্জু সন্ধ্যে থেকে হাওয়ায় ভাসছে। প্রমথই ভাসাচ্ছে। মা'র যত বাড়াবাড়ি। একদিন পড়া বন্ধ থাকলে কি ক্ষতি!

'অঞ্জুও চলুক।'

সুধা ডেকে বলল, 'শোন্। কাল আমার আর তোর প্রমথদার সঙ্গে সিনেমায় যাবি?'

অঞ্জু কথা বলল না।

প্রমথ বলল, 'কোথায় দাঁড়াব?'

'সিনেমা হলে এস। অঞ্জু আগে এসে দাঁড়িয়ে থাকবে টিকিট নিয়ে। ভোরে কলেজ যাওয়ার পথে কেটে রাখবেখন।'

হাঁটতে হাঁটতে পার্কের কাছে এসে পড়েছে।

এখন প্রমথকে বাড়ি নিয়ে যাবে না সুধা। বাড়িতে অঞ্জু আছে। অঞ্জু প্রমথকে ভেড়া করে দেবে। কিংবা অঞ্জুর টিকিট না পাওয়ার গল্পটা মিথ্যে তা জেনে ফেলবে। আর এখনও ত ছবি ভাঙেনি। সাড়ে আটটা। সুধা আর প্রমথ এখন সিনেমা হলে বসে আছে। সামনের পর্দায় ছবি।

'অনেক হেঁটেছি। এবারে বাড়ি ফের। ক্ষিধে পায় না তোমার?' প্রমথ নরম করে বলতে পারল না। প্রমথর সঙ্গে সুধা হাঁটছে। সুধার সঙ্গে প্রমথর কৃতজ্ঞতার যোগ। সুধা প্রমথকে ভালবাসে। প্রমথ পারে না। না পেরে, কষ্ট পায়।

প্রমথ আজ ঠিক করেছিল আগে এসে সিনেমা হলের সামনে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে অঞ্জুর সঙ্গে কথা বলবে। ভিড়ের মধ্যে কেউ শুনতে পাবে না।

'অঞ্জু দেখ। আমার খুব কষ্ট হয়। তুমি এস।'

'বাঃ! এই ত দাঁড়িয়ে আছি।' ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলবে। যেন ভিড় একটা ছবি। হঠাৎ ফিরে বলবে, 'জানলে মেজদি খুব কাঁদবে।' তখন অঞ্জুর চোখও ভারী লাগবে।

কথা হাতড়াতে থাকবে প্রমথ। 'তোমার মেজদি আমার জন্যে অনেক করে। কিন্তু—'

মাথা ঝুঁকিয়ে তাকাবে অঞ্জু। 'বুঝি'।

কি বলতে যাবে আরও।

সুধা ট্রাম থেকে নেমে খুশি চাপতে চাপতে কাছে এসে দাঁড়াবে। একসঙ্গে সিনেমায় যাওয়ার মজা। দুজনের কথা বন্ধ হয়ে যাবে। সুধা প্রথমে রেস্টু-রেন্টে নিয়ে তুলবে। বলবে. 'কি বৃষ্টি! উঃ! কি খাবে বল?'

প্রমথ অস্পষ্ট স্বরে বলবে—'রাধাবল্লভী।' অপুর বলবে, 'কাটলেট'

সুধা তার পাশে। শক্ত করে বলল, 'না ক্ষিধে পায় না। আমি একটু মার্কেটে যাব। দুটো আপেল নেব।'

বৃষ্টি থামলেও ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে।

প্রমথ বলল, 'সন্ধ্যেটাই মাটি। সিনেমা ত গয়া। বাড়িতেও নিয়ে যাবে না।' থেমে বলল, 'অবিনাশদার ওখানে যাচ্ছি একটু। তোমার কথায় বেরোলাম। এখন কোথাও ত যেতেই হবে।'

সুধা প্রমথর মনের অশান্তি মাপতে গেল। প্রমথটা কি! আমি প্রমথর সম্পত্তি না। দেমাক আছে ষোল আনা। 'আমি সুধাকে ভোলাতে পারি।'

ভাজাউলি তাকাচ্ছে। মর মাগী। সব প্রমথর জন্যে। বুলি আছে। কায়দা জানে। কায়দা নিয়ে সুখী থাক প্রমথ! এভাবে বাঁচবে না তুমি প্রমথ। এই জন্যে তুমি সন্ধ্যেবেলা সাজগোজ করে আমাদের বাড়ি এসে বসে থাক। তখন তোমাকে ভাল দেখায়। শেষ অবধি সেই একই শেষ।

প্রমথ বাসে উঠল। জানলা ঘেঁষে দোতলায় বসল।

সুধা মার্কেটে যাচ্ছে। সবুজ আপেল নেবে দুটো। সি ভিটামিন থাকে। দুদিনের টিফিন। বিখ্যাত ইংরাজী প্রবাদ মেনে চলে সুধা। দৈনিক একটা আপেল।—বাকিটা কি। মনে পড়ছে না। বাকিটা বোধ হয় আয়ু। যদি লাবণ্য হয়! শ্লেজ। চেহারা খোলে। ঘাড়ে, গলায়, হাতে মাংস হয়।

সুধা, প্রমথ একা। খুব একা। হাত পা নাক মুখ চোখ রঙ চুল ভাল না হলে টান শুকোয় কেন সুধা। ভালবাসা কি সুধা। সুধা জানে না। সুধা জানে একটা লোকের জন্যে কষ্ট হলে তার জন্যে টান হলে তার নাম ভালবাসা।

তোমার জন্যে আমার কষ্ট হয় সুধা। আমি তোমাকে ভালবাসি না। ভালবাসতে না পেরে কষ্ট হয় আমার। আমি তোমার আগেকার লাভার—এখনকার কি—তা জানি না।

এবারে নীল আলো জ্বলল। ডবল ডেকার ঝাঁকি খেয়ে চলতে শুরু করেছে। সামনে পার্ক স্ট্রীট। এখন অনেকক্ষণ হুহু করে চলবে।

॥ দুই ॥

বৃষ্টি থামলেও হাওয়া বেশ জোর। শীত বাড়ছে বোধহয়। জানলাটা তুলে দিয়ে জড়সড় হয়ে বসল প্রমথ। সুধার আপেল কেনা নিশ্চয় এতক্ষণে হয়ে গেছে। বিশ্রী জেদি মেয়ে। আর যদি কোনদিন একসঙ্গে সিনেমায় যায়। কিন্তু সুধার সঙ্গে এতদূর গড়াত না যদি আগে থেকেই কিছু সাবধান হওয়া যেত। কলেজে সুধা আরও কালো ছিল। মাথায় আরও অনেক চুল ছিল। চোখ তখনও গর্তে যায়নি। বেশি করে কাজল টেনে চোখ দুটো মাঝে মাঝে মুখের ওপর ভাসিয়ে তুলত। কিন্তু এখন যে কেমন ফ্যাকাশে হয়ে গেছে। সেই মোটাসোটা ভাবও আর নেই। ঘন ঘন ঠোঁট শুকিয়ে ওঠে—জিব দিয়ে চেটে তৃষ্ণা থামিয়ে রাখে সুধা।

তার সঙ্গে যখন সুধার দেখা প্রমথর তখন কেচে গণ্ডুষের অবস্থা। কারখানা বড় হলেও ঢালাইঘর বন্ধ করে দেওয়া হল। বি, এস-সি পড়তে পড়তে এসে ঢুকেছিল প্রমথ। আশা ছিল অভিজ্ঞতা উপরে তুলে নিয়ে যাবে। কিছুটা নিয়েওছিল। প্রমথ যখন ফার্নেসে ফার্স্ট হেল্পার ঠিক তখনই কিছুদিন অন্তর ব্রেকডাউন হতে আরম্ভ করল। তারপর কোম্পানী একদিন বন্ধই করে দিল। প্রায় চার বছরের এই অভিজ্ঞতা জলে যাবে। পাল সাহেব বললেন, ইলেকট্রিক ফার্নেসে যাও—পরে সুবিধা হবে। প্রমথ তখন ভবিষ্যত স্থির করে ফেলেছে। তাড়াতাড়ি গ্রাজুয়েট হওয়া দরকার—এবং তা আর্টসেই সুবিধা।

ছেলেমেয়ের একসঙ্গে কলেজ। বাড়ি পুরো তৈরী হয়নি। চেয়ার টেবিলও কম। প্রমথ বাকিতে ভর্তি হয়ে গেল। অনেক কিছুই ছিল না কলেজে। তবু ভাল লাগার মতও অনেক কিছু ছিল। সবচেয়ে ভাল, ছেলেমেয়ে এক-সঙ্গে পড়লেও বিশেষ কোন পাহারাদারী সাবধানতা ছিল না। যখন কেমিষ্ট্রি পড়ত তখন দেখত আগের কলেজে অনার্স ক্লাসে মেয়েরা একপাল হাঁসের মত অধ্যাপকের পাহারায় ক্লাসে ঢুকত—ঘণ্টা পড়লে স্যারের সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে যেত। পেছনের বেঞ্চে নিজেদের কোনদিন অসভ্য বাঘ মনে হয়নি প্রমথর।

সাহিত্যের উৎসাহী নতুন অধ্যাপক সেমিনারের ব্যবস্থা করলেন। কোন্ লেখক কার প্রিয় তাই নিয়ে দশ মিনিট বলতে হবে। ইংরাজিতে। ভুলভাল ইংরাজিতে খানিকক্ষণ বক্‌ল প্রমথ। প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক সবাই ক্ষমাশীল মানুষ। তাদের খাতা দেখতে হয়—জানেন কে কি লেখে।

অনেক ছেলেমেয়ে বসে আছে—বিশেষ করে সামনের বেঞ্চের মেয়েরা লেকচার না শুনে যে বলছে তাকেই খুটিয়ে খুটিয়ে দেখে। আর এরকম নির্দোষ সরকারী দেখায় কোনরকম সাবধানও তাদের হতে হয় না। প্রমথর অবস্থাও বলবার মত নয়। প্ল্যাটফর্মে উঠে বলার জন্য দাঁড়াবার পর আর ত নেবে আসা যায় না। তারপর এতগুলো বেণী, জোড়া জোড়া দুল, মাঝে মাঝে ছোট রুমালে এতগুলো হাত অতগুলো কপাল মুছছে—প্রমথর সব একাকার হয়ে গেল। থামবার উপায় নেই—চাবুক খাওয়া ঘোড়ার মত টগবগ টগবগ করে বক্তৃতা দিতে লাগল। যেন এই একপাল শ্রোতার সামনে থেকে পালাবার একমাত্র উপায় তোড়ে বকে যাওয়া।

কিন্তু এইটুকুই যথেষ্ট। কিংবা মেয়েদের বোধহয় এইভাবে মুগ্ধ হওয়াই নিয়ম। কিংবা মুগ্ধ হওয়ার মত আর কিছুই নেই জীবনে—তাই সাতটার সময় যেমন সাতটাই বাজে, তেমনি লেকচার দিলেই (সে শাপ ব্যাঙ যাই বলুক) সহপাঠিনীর বোধহয় মুগ্ধই হতে হয়।

সুতরাং সুধা মুগ্ধ হল। এবং বড়দিও।

তখন প্রমথ বড়দিকে রেখা বলেই ডাকত। কেননা সে তখনও সুধার লাভার হয়নি—তাই রেখাও বড়দি হয়নি।

আসলে কিন্তু রেখাই প্রথম মুগ্ধ হয়েছিল।

সুধা আর রেখা পিঠোপিঠি। বি. এ.-তে একসঙ্গেই ভর্তি হয়। আলাপ হওয়ার আগে ক্লাসে একছাঁচের দুখানি মুখও প্রমথ দেখেছে।

সেমিনারের লেকচারের দিন রেখা ছিল—পরে জানা গেল সুধা ছিল না।

রেখা এসে ধন্যবাদ জানিয়ে গেল। কিছু প্রশংসাও করল। দিন দুই পরে সুধা এসে বলল, 'দিদির কাছে শুনলাম ভাল ইংরাজি বলতে পারেন।'

তারপর কদিনে বেশ কয়েকটা ব্যাপার হয়ে গেল।

কলেজটা বোধহয় আগে কারও বসতবাটি ছিল—তাই উঠোনে ছিল গোটা-দুই বকুল গাছ। অঙ্ক পিরিয়ডে গরমে তেতে ওঠা গুচ্ছের লালচে বকুল ফুল উঠোন থেকে কুড়িয়ে মুঠো করে উপহার দিতে আরম্ভ করল রেখা। দেওয়ার সময় গোপনেই দিতে চায়। ব্যাপারটা রেখার কাছে হয়ত নিষ্পাপ কিছু। কিন্তু প্রমথর কাছে তখন নিষ্পাপ বলে আর কিছু অবশিষ্ট নেই। বছর চারেক

কারখানায় চাকরী করার পর এবং সংসারী লোকজনের সঙ্গে মিশে মিশে প্রমথ সন্দেহ করতে শিখেছে—আঁচ করতে—দরকার মত ঠাট্টা করতেও।

প্রমথ ইতিহাসের ক্লাসে গেলে সুধা যেত না। সুধার কমবিনেশন ইকনোমিক্‌স্‌। দুবোনের একটা বিষয়ে বেশ মিল ছিল। পালা করে দুজনেই জ্বরে পড়ত। সেবারে রেখার জ্বর যাচ্ছে। ক্লাসে লুই রাজাদের আমলে ফ্রান্সের মন্ত্রীদের নিয়ে স্যার লেকচার দিচ্ছেন।

তেতলার লাইব্রেরী ঘরে সুধা বলল, 'দিদি বলে দিয়েছে ইতিহাসের পড়াটা আপনার কাছ থেকে জেনে নিতে।' জানা অন্য মেয়ের কাছেও যায়। প্রমথ কদাপি ভাল ছাত্র নয়। এখন যেটুকু মন দিয়ে পড়ে, তা ভয়ের থেকে, আর সে ত রেগুলার স্টুডেন্টও না।

পড়া বলে দিল প্রমথ। ছুটির পর রাস্তা পার হচ্ছিল—সুধা আবার জিজ্ঞাসা করল—'দিদির পড়াটা বলে দেবেন?' ব্যাপারটা কেমন অশিক্ষিত যুক্তিহীন ধরা-পড়া গোছের। সঙ্গে শঙ্কর ছিল। বলল, 'আওয়াজ দেব?' সুধা চলে গেলে বলল, 'তোর প্রেমে পড়েছে সিওর।'

তার পর যা হয় তাই হল। তখন খারাপ লাগত না। বেণী, বুকে লকেট, গায়ে দুএকদিন সেন্টের গন্ধ—সুধাকে ভালই লাগত। একসঙ্গে ঘুরত মাঝে মাঝে। রেখা ব্যাপারটা বুঝল—বুঝে বড়দি হয়ে গেল।

নাববার জায়গা পার হয়ে যাচ্ছিল। হুড়মুড় করে স্টপে নেমে পড়ল। অবিনাশদা অফিসেই ছিল। বলল, 'চল একজায়গায় যাব। এক্ষুনি যেতে হবে। আগে এলে না কেন?'

প্রমথর বাড়ি যাওয়া দরকার ছিল। যাওয়ার জন্যে উসখুস করায় বলল, 'চলত আমার সঙ্গে—কী হবে বাড়ি গিয়ে এখন।' অফিস থেকে বেরিয়ে রিক্সায় চড়া গেল। অবিনাশদা দামি সিগারেট ধরাল—প্রমথকে দিল। 'আজ এখানে গান গাবে নীলিমা।'

গাড়ি দাঁড়ান অনেকদূর অব্দি। প্যাণ্ডেলের ভেতরে মাইক, স্টেজে ছুটন্ত কর্মকর্তাদের দেখা গেল। ভেতরে খবর পাঠাল অবিনাশদা। 'কালই বোম্বে চলে যাবে—ফোনে আসতে বলল, না এসে পারা যায় না প্রমথ।' একটু থামল, 'অথচ এক মাস আগেও চিনতাম না।' মুখটা হাসি হাসি অবিনাশদার। খানিকটা গর্ব, খানিকটা আনন্দ, কিছু অনিশ্চয়তায় দুলছে অবিনাশদা। 'বোম্বেতে কটা গান হিট্‌ হয়েছে—এবারে গেলে শিগ্‌গিরি আর ফিরতে

পারবে না নীলিমা—' 'বৌদি জানে?' একথায় হেসে ফেলল অবিনাশদা। 'সি বিলিভ্‌স মি হাণ্ড্রেড পারসেণ্ট। এর মধ্যে কিছু দোষ নেই ত—ডাকলে আমি না এসে পারি না প্রমথ।'

প্রমথ দেখল নীলিমা আসছে। চৌত্রিশ পঁয়ত্রিশ হবে। কপালে সিঁদুর, গানের যে কোন জলসায় ওর নাম থাকবেই। পাব্লিক ওর বেলায় চেঁচায়—আর একখানা আর একখানা। অবিনাশদা ঘাড় ঘুরিয়ে পাঞ্জাবীটা দেখে নিল। প্রমথ বলল, 'চলি অবিনাশদা।'

'চললে—আচ্ছা। কাল হাতে সময় নিয়ে এস—এ্যা—আর লেখাটার কি করলে? কাল সঙ্গে এনো।' আর কথা বলতে পারল না অবিনাশদা। নীলিমা একেবারে সামনে।

॥ তিন ॥

বাড়ি ফিরে সুধা দেখল সামনের বারান্দায় আসর বসেছে। মা খাটে—বড়দি বালিশে পা তুলে দিয়ে কাত হয়ে বসে। দোতালার কাকিমা চা নিয়ে ঘরে ঢুকল। আসরের মাঝখানে খোকনদা বসে। তাকে দেখেই কথা থামিয়ে খোকনদা বলল, 'এই যে মিস সুধা ঘোষ। বিজুকে দিয়ে টিকিট বেচতে পাঠালে কেন? তিনি আর বাবলু দুজনে গিয়ে দেখে এসেছেন—'

বাবলু কাছেই ছিল। বলল, 'বেচে কি হবে—দেখে এলাম বিজুদার সঙ্গে। শুধু ইংরাজি, একবর্ণও বোঝা যায় না। মেজদি তুই রাগ করিস না।'

সিনেমা দেখার কথা মা'র সামনে ওঠানো ঠিক হয়নি। সুধার অস্বস্তি লাগছিল। খোকনদা এরকম কিছু একটা বলবেই। অফিস আর বাড়ি ছাড়া মার আর অন্য কিছু পছন্দ নয়। সিনেমাটা বাহুল্য। সেদিন থিয়েটারের কথা ওঠায় মা চেপে ধরল, 'অতগুলো টাকা নষ্ট করে কি হবে। অঞ্জুর একটাও ভাল সায়া নেই—তোর বাবার একটা ফতুয়া করব—নস্যি দিয়ে ভাল জামাগুলো নষ্ট করে ফেলছে।' সুধা ভেবে দেখল, একে সিনেমা—তাতে আবার প্রমথর সঙ্গে (নিশ্চয় অঞ্জু বলে দিয়েছে)—তাও কিনা মা'র সামনে তাই নিয়ে কথা হচ্ছে।

অঞ্জু বলল, 'মেজদির ত গায়ে লাগবার কথা নয়। মীরাদি দেখাচ্ছে—আমারও যাওয়ার কথা ছিল'—সুধা একটু অবাক হল। অঞ্জু এসব কি বলছে। অঞ্জু চোখ টিপে বলল, 'তরকারি রুটি ঢাকা আছে—ওপরের থালাটা সাবধানে নামাবি কিন্তু। বাবারটা যেন না পড়ে।'

বড়দি বলল, 'মেজ তাড়াতাড়ি আসিস। খোকনদার বিয়ে।' অঞ্জু বলল, 'হ্যারে মেজদি।' সুধার বিশ্বাস হয়নি। বলল, 'গুল দিচ্ছ না ত খোকনদা? সেবারেও কিন্তু বলেছিলে।'

খোকনদা ঘাবড়াবার নয়। একটু নার্ভাস হয়ে গেলেও তা অল্প সময়ের জন্যে। বলল, 'বাঃ! ইয়ার্কি নাকি। আমি ঘর খুঁজতে বেরিয়েছি।'

মা'ও ঘাড় নাড়ল। বলল, 'তোর মা জানে? না, শেষে একটা কেলেঙ্কারি হবে।' সুধা বলল, 'জ্যাঠামশায় জানেন?' খোকনদা বলল, 'এখনও জানে না কিন্তু জানবে।' সবাই তাকিয়ে থাকাতে বলল, 'রেজিস্ট্রি হয়ে গেছে—এবার শুধু এ্যানাউন্স করা বাকি। একটা ভাল ঘর পেলেই সবাইকে জানাব।'

মা বলল, 'বিয়েই যখন করবে তখন আবার ওসব করতে গেলে কেন? পাঁচজনের আশীর্বাদ নিয়ে যে মেয়ে ঘরে আসে সেই-ই ত সবচেয়ে সুখী হয়।' খোকনদা বাধা দিল, 'আপনাদের আশীর্বাদ নিয়েও আর একবার বিয়ে করব। সবাই যাবি তোরা। ঘর ঠিক হলেই সব গুছিয়ে ফেলতে হবে।'

'সেই বিয়েই যদি করবে তবে ওসব সাক্ষীর বিয়ে করতে গেলে কেন?' অঞ্জু ওরা বাধা দিল। 'তোমার সবটাতে কি কথা বলার দরকার? খোকনদা এ্যাডাল্ট—।' মা ঝাঁঝি দিয়ে উঠল, 'থাম্। পাকামি করিস না।' সুধা, রেখা কেউ মুখের ওপর কথা বলে না। এই মেয়েটাই পাকা। অজয় এলে পড়ার নাম করে হেঁ হেঁ করে হাসে। এবারে এলে আসতে বারণ করে দিতে হবে।

খোকনদা বলল, 'সে চেষ্টা কি করিনি সোনা কাকিমা। বাবাকে বললাম। শুনে তিনি গুম। তারপর বললেন এখনও সময় হয় নি। তোমার বিয়ে করলে চলবে না এখন। বুড়ির বিয়ে হয়নি। জেদ দেখে যাও বা রাজি হলেন, শেষে বলেন—নগদ একহাজার, সোনা কুড়ি ভরি—তারপর বাসনপত্র দান সামগ্রী—প্রণামী—সে এক এলাহি লিস্ট। যেন জজের বিয়ে।'

'তা এসব লাগে। সংসার আরম্ভ করতে গেলে জিনিসপত্র লাগবে না? এসব ত তোমাদেরই জন্যে।'

'তা হলেই হয়েছে। ঘটি বাটি বেঁচেও অতসব দিতে পারবে না। আর আমিও কিছু রাজপুত্তুর না। থার্ড ডিভিসনে ম্যাট্রিক। প্রাইভেট কোম্পানী—আছিও অনেকদিন—তাই টুর করে সব নিয়ে চলে যায়।'

সুধা বলল, 'আর তুমিও ত করে নিতে পারবে। বৌদির যা যা দরকার।' দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খাচ্ছিল সুধা। রেখা বলল, 'যা ত অঞ্জু একগ্লাস জল নিয়ে আয়।'

'খোকনদা উঠো না কিন্তু' বলে অঞ্জু জল আনতে গেল। সুধা কাপড় বদলে এসেছে।

খোকনদা বলল, 'তাহলেই হয়েছে। সংসার চালিয়ে কুড়ি ভরি সোনা করে বিয়ে করতে গেলে আমি বুড়ো হয়ে যাব। এখন বত্রিশ। বাবার কথায় থাকলে কোনদিনই বিয়ে হবে না। তারপর যদি সব রেডি করে বিয়ে করতে যাই তখন আমি লুঞ্জপুঞ্জ পুরুষসিংহ হব—তখন আর মাপ মত সিঙ্গি খুঁজে পাওয়া যাবে না।' থেমে বলল, 'সোনা কাকীমা, বাবার অত দাবি-দাওয়া বন্ধ করার জন্যে রেজিষ্ট্রি বিয়ে ছাড়া উপায় ছিল না। কাকার ত তিন মেয়ে—দেখবেন ঠেলা।'

অঞ্জু বলল, 'নগদ চাইলে বিয়েই করব না। দরকার নেই অমন ছেলে।' সুধার মা উঠে গেল। পাশের ঘরে পরিতোষ গম্ভীর হয়ে কাশছে। মানে এস—আমি মক্কেলদের তুলে দিয়ে এসেছি। বড় বাটিটায় রুটি তরকারি দাও। জামা আর লাঠিও দিও। খেয়ে আড্ডায় যাব। উঠবার সময় নীহারিকা ভাবল—এই যে সব অবিবাহিত ছেলেরা সামনের ঘরে আসে—প্রমথ, অজয়—খোকনটাও—কার কি মতলব কে জানে। চিলেকোঠার ছোটদিদু—যেভাবে তাকায়—কোনদিন কিছু একটা হলে ঢি ঢি পড়ে যাবে। পরিতোষকে বলে সব বারণ করে দিতে হবে।

সুধা মাটিতে পা ছড়িয়ে বসল। 'বৌদি দেখতে কেমন খোকনদা। খুব ফর্সা—লম্বা—চুল আছে?'

'গ্রান্ড! একশো মেয়ের মধ্যে দাঁড়ালে খুঁটে বের করতে হয় না। কলু-টোলার শ্রেষ্ঠ গোলাপ ফুল। তোরা তার পায়ের ধারেও দাঁড়াতে পারবি না।'

সুধা বলল, 'ভালই ত। একটা সুন্দরী বৌদি পাব।' প্রমথও গোড়ায় কি সব সুন্দর কথা বলত। একদিন সুধা ছাদে বসে চুল আঁচড়াচ্ছিল। প্রমথ ঘরে ঢুকে বলল, 'মূর্তিমতী কালবৈশাখী মেঘ আঁচড়াচ্ছিল।' সুধা জানে এসব কথার মানে হয় না। তবু একটা লোক তাকে নিয়ে কথা বলছে—তার আয়ুর খানিকটা ব্যয় করে তারই বর্ণনা দিচ্ছে—এই-ই বা কম কি। প্রমথ এমনিতে কী সুন্দর কথা বলতে পারে। কিন্তু দিন দিন যে কি হচ্ছে। আজ সন্ধ্যেটা কেমন নষ্ট হয়ে গেল।

অঞ্জুর কি দোষ। নিজের শরীর খারাপ হয়ে গেলে—মেজাজ খিট খিটে হয়ে গেলে কে আসবে কাছে। প্রমথরও কোন দোষ নেই। চাকরী হচ্ছে না বেচারার। একটা কিছু হলেই মনে আশা আসবে। 'অঞ্জু তোর জন্যে একটা আপেল এনেছি। কাউকে না দেখিয়ে বারান্দায় গিয়ে খেয়ে আয়।'

রেখা বলল, 'না অঞ্জু তুই খাবি কি। মেজই পরে খাবেখন।'

'না বড়দি। অঞ্জু এখন থাক। ওর এখন গ্রোথের সময়।' রেখা বাধা দিল, 'থাক্ হয়েছে। বিকেলে অনেক মুড়ি মেখেছিলাম। খোকনদা আলুর চপ আনালো। তুই-ই খাস কাল টিফিনে।'

'তোমরা থামবে, আমি এখন খাব কি। বিকেলে খেয়ে পেট ভর্তি। খোকনদা কদ্দিন আসে না। বৌদির খবর একটু শুনি। মেজদি তুই চেয়ারটায় বস্না। আমি একটু হেলান দেব। একি উঠলে খোকনদা?'

'বাড়িওয়ালা না বেরিয়ে যায়, দেখিগে। অনেক কষ্টে ঘরখানা পাওয়া গেছে। দক্ষিণ খোলা। ধর্ ঘুম থেকে উঠে দুজনে চা খাব—সামনেই ঝুল বারান্দা আছে—ওর জন্যে দশ টাকা একস্ট্রা, দুখানা মোড়া কিনব। দুজনে পেয়ালা হাতে বসব—পথের উপরেই একটা দেবদারু গাছও আছে—গ্রান্ড।' বলেই তড়াক্ করে উঠোনে নেমে গেল, 'যাইরে সবাই। গোছগাছ করে খবর দেব।' তারপর থেমে সুধাকে ডাকল, 'শোন্ তোর হিরোকে নিয়ে একদিন যাবি কিন্তু।'

সুধা দেখল, একটা মোটা নাক—চোখ কটা, দুই কান অব্দি—হাসি চলে গেছে। প্রমথ এরকম হাসে না কেন।

বড়দির পাশে সুধাকেই শুতে হয়। বাচ্চারা শুলে ফ্রাকচার পায়ে ব্যথা দিয়ে বসবে ঘুমের ঘোরে। অঞ্জু মশারি গুঁজে দিয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বড়দি ঘুমোচ্ছে। আজ রাতে ভাত খেলে পারত। জ্বর হত না। খুব সাবধান বড়দি। ভীতুও খানিকটা। ডবল ডেকারের পাদানিতে পা বেধে গিয়ে পা ভেঙেছে। পথের লোকজন হাসপাতালে নিয়ে যেতে চেয়েছিল। যায়নি। রিক্সা ডেকে বাড়ি চলে এসেছে। অচেনা লোক হাসপাতালের নাম করে যদি চুরি করে নিয়ে যায়। পা ভাঙা—দৌড়ে পালিয়েও আসতে পারবে না। কোনদিন দৌড়োতেও পারে না বড়দি। স্কুলে থাকতে গোড়ার দিকে টিফিনে মাঠে গেলেই আছাড় খেত। তখন কি মোটা ছিল। একটা মশা মারল সুধা। বড়দি যদি ভাল হয়ে যেত। জল পিপাসা পেয়েছিল। উঠে

গিয়ে জল খেয়ে এল। ফেরার সময় বিরক্তিতে রেগে গেল সুধা। মশারির গোলোকধাঁধা। কোনো জায়গায় পা ফেলার উপায় নেই। সামনের দরজায় খিল দেওয়া হয়নি। বাবা এখনও আসেনি।

মাঠের দিকে জানলা খুলে দিতে চাঁদ চোখে পড়ল, নোংরা মাঠটা এখন সুন্দর। ওদিকে তাকিয়ে নিঃশ্বাস ফেলা যায় দম খুলে। আমাদের যদি একটা দাদা থাকত। আয়নার টেবিলে একখানা ছবি আছে। আড়াই বছরের মরা ছেলে কোলে পরিতোষ বসে আছে। বড়দি জন্মাবার আগেই মরে গেছে। বেশ গেছে। আমরা এতগুলো ভাইবোন কেন হলাম! আমার পরে, কি অঞ্জুর পরে থামা যেত না?

'মেজ, ঘুমোলি?'

বড়দি তবে জেগে। সুধা উত্তর দিল না। রেখাও কিছু বলল না খানিকক্ষণ। অঞ্জুর নাক ডাকছে।

'সুনীল কিছু বলল?'

'কাল বিকেলে আসবে।'

অনেকক্ষণ চুপচাপ।

'আজ সিনেমায় গেলি না কেন তোরা?' সুধা জানত বড়দি একথা জিজ্ঞাসা করবেই। সুধা কিছু না বলে পাশ ফিরে শুয়ে থাকল। দুপুরে অফিসে টেবিলে দারুণ ঘুম পাবে—ইচ্ছে করে বিছানা থাকলে শুয়ে পড়ি। অথচ এখন বিছানায় শুয়েও ঘুম আসছে কোথায়?

'কাল আসবার জন্যে নেমন্তন্ন করে এসেছিস? কখন আসবে প্রমথ?'

'বলতে ভুলে গেছি বড়দি। ঠিক আছে আর একদিন বলা যাবে।'

'ভুল করলি মেজ। আজ তোর বলে আসা উচিত ছিল।' বড়দি যেন একগলা অভিজ্ঞতায় দাঁড়িয়ে কথাগুলো বলছে। 'ঝিমিয়ে পড়লে ডেকে জাগিয়ে রাখতে হয় ওদের।' কথাটার মানে অনেকক্ষণ ধরে বুঝল সুধা।

॥ চার ॥

দশটা বেজে গেছে। এখন বাড়ি ঢুকলে একপ্রস্থ ঝগড়াঝাটি হওয়াও আশ্চর্য না। লুঙ্গি পরে বাথরুমে যাচ্ছিল, বাবা বলল, 'মনু, তোর জন্যে একটা চিঠি রেখে গেছে।' মা অপেক্ষা করার লোক না। ডেকে বলল, 'মনুর চেনাশুনো কোম্পানীতে ইন্টারভ্যু—বারোটার মধ্যে পৌঁছতেই হবে।'

এসব চিঠি প্রমথ জানে। মেজদা এরকম চিঠি অনেক রেখে গেছে। চিঠির ডিরেকশন মত গিয়েছেও—কিছু হয়নি শেষ পর্যন্ত।

খাওয়া দাওয়ার পর চিঠিটা দেখল। প্রথম কথা, 'সময় মত যাইও।' কি জামা কাপড় পরে যেতে হবে তাও লেখা আছে। কোন্ রঙের টাই। 'যাইবার সময় প্রয়োজনীয় সার্টিফিকেটগুলি সঙ্গে লইয়া যাইও। জুতায় কালি দিবা।' খুঁটিনাটি সব লেখা আছে। কি কি হলে চাকরী হয় মেজদা তা জানে। তার সব জ্ঞান পাওয়া সত্ত্বেও প্রমথ এখনও কোন সুবিধা করে উঠতে পারেনি।

জামা কাপড়—মানে প্যান্ট কোট যা লেখা রয়েছে সে সব ত সাগরের কাছে ধার করে নিতে হবে। পছন্দ মত একটা টাই বাক্সে আছে। এঃ! পল্টুটা আবার এপাশে এসে শুয়ে আছে। ধাক্কা দিয়ে ওকোণে পাঠিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ কি ভাবল। কাগজপত্রগুলো গুছিয়ে রাখলেই হয়। বিছানা ছেড়ে উঠল।

ড্রয়ার চিঠিতে কাগজপত্রে টাল হয়ে আছে। খুঁজে পেতে ম্যাট্রিক সার্টি-ফিকেট যাও পাওয়া গেল আর কিছু পাওয়া যায় না। কতকগুলো পুরনো বিজ্ঞাপনের কাটিং। প্রমথ আগে নিয়মিত বিজ্ঞাপন দেখে চিঠি পাঠাত। বড়দা খবরের কাগজগুলো দেখতে বলত। বি. এ. ডিগ্রির সঙ্গে মেদিনীপুর থাকতে বড়দার লেখা চিঠি, 'বিজ্ঞাপন নিয়মিত লক্ষ্য রাখিও। এবং উপযুক্ত মনে করিলে দরখাস্ত করিবে। কারণ বলা যায় না কখন কার ভাগ্যে কি হয়। এই অল্প বয়সে শুইয়া না থাকিয়া ঘোরাঘুরি করা উচিত। তোমার বয়সে আমি অতি ছোট চাকুরীতে দৈনিক তিরিশ চল্লিশ মাইল সাইকেল করিয়া চাকুরী করিয়াছি—বাস ও ট্রেনের পয়সা বাঁচাইয়া। বাবার চাকুরী ছাড়াইয়া

দিব। এবং বাবা ও মাকে আমি বরাবর আমার নিকটেই রাখিব, সেজন্য তোমাদের কাহারও কোন চিন্তার কারণ নাই। তোমার বয়স হইয়াছে। ধীর স্থির ভাবে চিন্তা করিয়া কাজ করিবা যাহাতে ভবিষ্যতে জীবনে কষ্টে না পড়। একটা ভাল চাকুরী যেভাবে হউক যোগাড় কর। তোমার একটা কিছু না হইলে আমি মনে শান্তি পাই না। কোন ভাল চাকুরীর খবর পাইলেই চেষ্টা করিবা, উদ্যম ও চেষ্টা হারাইও না।'

সারাটা ড্রয়ার ভর্তি ব্যর্থ চেষ্টার কতকগুলো কাগজ পড়ে আছে। সবই চাকরী—ভাল চাকরীর জন্য। তিনকপি ক্যারেক্টার সার্টিফিকেট, প্রমথ দত্ত ভাল ফুটবল খেলতে পারে তার (মিথ্যা) সার্টিফিকেট। অসংখ্য প্রশ্নপত্র—বিভিন্ন পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড আর যে যখন চিঠি লিখেছে—সব প্রমথ এক ড্রয়ারে জমা করে রেখেছে। দীর্ঘকাল দেখা হয় না যে সব বন্ধুর সঙ্গে তারাও এ ড্রয়ারে আছে। কত পুরনো পোষ্টকার্ড। কত পুরনো খাম। প্রিন্সি-প্যালের সার্টিফিকেটের সঙ্গে একখানা চিঠি পেল প্রমথ। খামখানা খুলে গেছে। মেজদার চিঠি। মালদায় থাকতে লেখা। তারিখ আর চিঠি দেখে বুঝল কয়েক বছর আগে বি. এ. পাশ করে চিঠি লিখেছিল প্রমথ, তারই উত্তরে লেখা মেজদার চিঠি। 'তুমি সেকেন্ড ক্লাস পাইয়াছ জানিয়া সুখী হইলাম। সিভিল সার্ভিস পরীক্ষা দিবা জানিয়া আরও খুসী হইলাম। তুমি ঠিকই সিদ্ধান্ত করিয়াছ। এম এ পাশ করিয়া অধ্যাপনারও চেষ্টা করিতে পার। কিন্তু মনে হইতেছে অধ্যাপক হইয়া সুবিধা করিতে পারিবে না। কারণ, তুমি বাংলায় পাশ করিয়াছ ঠিকই, কিন্তু ভাল বাংলা শেখ নাই মনে হইতেছে। কারণ সামান্য একখানি পোষ্টকার্ড যাহা আমাকে লিখিয়াছ তাহাতেই বাংলা ভাষা ঠিকমত ব্যবহার করিতে পার নাই। "তোমার কোন বক্তব্য থাকিলে জানাইও" এইরূপ ভাষা কখন ব্যবহার করিতে হয় তোমার জানা উচিত ছিল। তোমাকে একটা কথা লিখি। তুমি বড় হইয়াছ। যখন যাহা ঠিক কর যে ইহা করিবা তখন তাহাতে সম্পূর্ণ মন দিবা। যখন স্থির করিয়াছ পরীক্ষা দিবা তখন এমন ভাবে তৈয়ারী হও যাহাতে ভাল ফল করিতে পার। যদি সুখী হইতে চাও জানিবা—সৎভাবে আর্থিক সঙ্গতি না থাকিলে সুখী হওয়া যায় না। আমি তোমাকে কোন উপদেশ দিতে চাই না। যাহা সব সময় অনুভব করি তাহাই মাত্র লিখিলাম। আর কখনও এইরূপ মনে করিও না যে, আমি কি সফল হইতে পারিব? ধরিয়া নিবা যে সফল তোমাকে হইতেই হইবে। তুমি লিখিয়াছ মা'র শরীর সেইরূপই। তার মানে মা কি এখনও অসুস্থ? আগস্ট মাসে কলিকাতায় অফিসের কনফারেন্স আছে। কিন্তু এখনও কোন চিঠি পাই নাই। তুমি আমার আশীর্বাদ লইবা। পুঃ তোমার

প্লেস জানিলে আমাকে জানাইও। কি কর না কর আমাকে জানাইবা। বহুদিন পরে তোমার নিকট হইতে দায়িত্বপূর্ণ কথা শুনিয়া বড় ভাল লাগিল।'

সব সেই এক কথা। বয়েস হয়েছে—চাকরী কর। ভাল চাকরী কর। পুরোপুরি রবার টেনে লম্বা করার মত। করতেই হবে। হতেই হবে। করাতেই হবে। সামনের ঘরে একজন বয়স্ক লোক মশারির মধ্যে শুয়ে আছে। তার বয়স হয়েছে। সত্তর। প্রমথর বাবা সে। এই ভদ্রলোক সম্ভবত বয়স হওয়ার আগেই চাকরীতে ঢুকেছেন। সেই আমলে কুড়ি বছর বয়সে। তাই এখনও বেরোতে পারেন নি। রিটায়ার করার পরও দশটা পাঁচটা থামেনি। আগে ছিল সরকারী—এখন বেসরকারী। ফলে নটা—ছটা দাঁড়িয়েছে।

বাবা, বড়দা, মেজদার স্নায়ু বিশ্রামহীন। কিংবা যে আবহাওয়ায় এরা তিনজন বাস করে তাতে বিশ্রাম প্রায় অপরাধ—পরিশ্রম গর্বের ব্যাপার। প্রমথ যখনই ভেবে দেখতে যায় তখনই কিছুদূর এগিয়ে ফিরে আসে। এর মধ্যে যুক্তি খুঁজে কোন লাভ নেই। ইস্কুলের মাইনে বাকি, বাড়ি ভাড়া বাকি, মুদি বাকি, কাবুলি পাবে—বাকি, পাবে, বাকি, পাবে—কলেজে থাকতে মেসের রেণ্ট তিনমাস বাকি—এসব জড়িয়ে বড়দা মেজদা ক্লান্তিহীন বিপজ্জনক আবহাওয়ার মত করে বড় হয়েছে। আয়াস, নিশ্চিন্ত আবহাওয়ায় তারা অস্বস্তি বোধ করে। মেজদার চিঠিটা যেন একটা যুদ্ধের আয়োজন। প্রচণ্ড বাধ্যবাধকতা। সফল হতেই হবে। সোনার গাছের মুক্তোর ফল ছিঁড়ে আনতেই হবে।

কাল যেখানে দেখা করতে হবে সেখানে যাওয়ার ব্যাপারে মেজদার লেখা চিঠিতে জুতোয় ভাল করে কালি দেওয়ার কথা অন্তত পাঁচবার আছে।

সারাদিন সিগারেট, চা, ননস্টপ আড্ডা—মাথা ধরা সব নিয়ে মাথা এত ক্লান্ত যে ঘুমও আসছে না। এই সময়টা প্রমথর সবচেয়ে প্রিয় সময়। এখন প্রমথ বরফে স্কি খেলার মত দীর্ঘ প্রসারিত উজ্জ্বল পবিত্র সব স্বপ্ন দেখে। তখন আর চোখ বুজতে হয় না।

আচ্ছা একশো কোটি টাকার মালিক হয়ে গেছি। সরকারকে বললাম, আমি এই টাকাটা দেশের জন্যে নিজের ইচ্ছেমত খরচ করব। প্রধানমন্ত্রী রাজী হলেন। বললেন, প্রমথ তোমার যা যা সাহায্য দরকার কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা তোমাকে সে-সবই দেবে। কাজ আরম্ভ হল। (এই সময়ে স্বপ্নের গতি হু হু করে বেড়ে যায়) গ্রামের পর গ্রাম ঝক্‌ঝকে তক্‌তকে হয়ে যাচ্ছে। সবার চেহারাই সুন্দর। কারও একটা পোকায় খাওয়া দাঁত কিংবা হোঁচট খাওয়া নখও নেই। সব সুন্দর—সব নতুন।

আজ প্রমথর একটা নতুন স্বপ্ন দেখার ইচ্ছে হল। রাস্তার দুপাশে বিভিন্ন পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড, কোশ্চেন সব ছড়িয়ে পড়ে আছে।

এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। রাত দশটা। বিরাট বিরাট বাল্‌ব থেকে কড়া আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। সে একা ধুতী পাঞ্জাবী পরে (পায়ে পাম্প) রাস্তার মাঝখান দিয়ে ময়দানের দিকে চলেছে। পথের দুপাশে হাজারে হাজারে লোক। সবাই হাততালি দিচ্ছে। সবার মুখে এক কথা 'সে যাচ্ছে', 'সে যাচ্ছে'। প্রমথর আর পথ ফুরোয় না।

পাশ ফেরার আগে ঠিক করল এই স্বপ্নটা অন্তত এক সপ্তাহ দেখতে হবে।

ঘুম থেকে উঠতে মা একটা নতুন পেষ্ট দিল। 'পল্টু তোর জন্যে রেখে গেছে। গুড়োয় দাঁত মাজতে পারিস না তুই।' গামছা তেল সব বারান্দায় রয়েছে। বলল, 'চানটা করে নে। সকাল সকাল দেখা করতে যেতে হবে।'

প্রমথ জিজ্ঞাসা করল, 'বিছানায় দেখলাম ঘুমোচ্ছে কাল।'

'কাল বিকেলেই এসেছে। সিনেমা দেখে এসেই চোখ ব্যথা করছিল— শুয়েই ঘুম। এইত ভোরের ট্রেনটায় গেল।'

পল্টু এরকম হঠাৎ আসে। নতুন সাবান, তেল, দাড়ি কামানোর পেষ্ট ইত্যাদি প্রায়ই রেখে যায়। হাসতে হাসতে বলে, 'তোমার মত বেকারদের জন্যে আমি ফতুর হয়ে গেলাম।' প্রমথকে দেখিয়ে বলে 'এ কনফার্মড আন-এমপ্লয়েড।' তারপর হয়ত কথার তোড়ে অন্য কথায় চলে যায়—'ওঃ! ন'দা তুমি যদি আমাদের লাইনে আসতে দারুণ সাইন করতে পারতে। ধর, আমাদের কোম্পানীর টুথ পেষ্ট কেউ তো কেনে না। কিন্তু আমি এবার আসানসোলে দুর্গাপুরে ছুশ টুথ পেষ্ট বেচেছি। স্রেফ তোমার ভাই বলেই পেরেছি। ইউ আর এ ক্রুক্! এমনভাবে লোককে কনভিন্স করে ফেল।'

'ঠিক নেই। লম্বা ট্যুর দিয়ে জানুয়ারীর গোড়ায় ফিরতে পারে।' যেন মা চাকরী করতে যাবে—বলল, 'দেরী করিস না।'

সাগর পাড়ার মোড়ে দোকান করেছে। চুন সুরকি রঙ লোহা এইসব বিক্রি করে। সন্ধ্যে হলে স্যুট পরে বেড়াতে বেরোয়—সঙ্গে গোঁফওয়ালা এরলফ্লিন অনেকগুলো থাকে। সাগরের কাছে চাইতেই পাওয়া গেল। বাড়ির টাইটাও বেশ লাগসই হয়ে গেল।

মা'র নারায়ণ নারায়ণ দুর্গা দুর্গার মধ্য দিয়ে প্রমথ চলল। সোয়া এগারোটা। ট্রাম কিছু ফাঁকা। জানাশুনো একজনের সঙ্গে দেখা হল।

জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় আছ?' প্রমথ বলল, 'কেন আগে যেখানে থাকতাম সেখানেই আছি।' লোকটা একটুও লজ্জিত হল না। ফের বলল—'কোথায় কাজ করছ তাই বলছিলাম আর কি।' ট্রাম লয়েডস্ ব্যাঙ্কের পাশ দিয়ে এসেছে একটু আগে। প্রমথ সেই বাড়িটাই দেখিয়ে দিল। এই সময়ে অফিসের বাইরে—এমন একটা প্রশ্ন মুখে চোখে ফুটিয়ে লোকটা তাকাতেই প্রমথ বলল, 'কিছু আগে আসতে হয়েছে—লাঞ্চের খোঁজে বেরোতে হল। কোন্ দোকানে যাই বলত?' লোকটা কেঁচো হয়ে গেল।

ঠিকানা মিলিয়ে জায়গা মত এসে দেখল ঠিক জায়গায় এসেছে। অফিস দেখে কিছু ভক্তি হল। পিতলের প্লেট, বিলিতী মনসা গাছের টব—এসবই আছে। কিন্তু অফিস যে বন্ধ। দরজা জানলা সব বন্ধ। কি ব্যাপার। কোণের দিকে খোঁজ করে পাহারাদারকে পাওয়া গেল। বলল, 'ডিরেক্টর না কে মারা গেছে কাল রাতে আজ অফিস বন্ধ থাকবে। কাল আসবেন।'

আবার একদিন এই ধরাচুড়ো পরে সেজে আসতে হবে। নিজের গায়ে সাগরের কোট প্যান্ট দেখল। আচ্ছা একটা ভ্যাকান্সি ত হল। ডিরেক্টরের পোষ্ট। না এখুনি তাকে অত বড় চেয়ার কেউ দেবে না। কিন্তু বলা যায় না কখন কি হয়ে যায়। নাঃ! কাল আসতেই হবে। খুব ছোটতে কাল ঢুকবে—তারপর দেখতে দেখতে সে ডিরেক্টর হবে। অন্য সবাই যখন বাসে ঝুলে অফিস থেকে ফিরবে—প্রমথ তখন বড় গাড়ির পেছনে অবহেলায় হেলান দিয়ে পড়ে থাকবে—চোখ বোজা—হাতে বিলেতি কাগজের একখানা এয়ার এডিশন। আচ্ছা এও ত হতে পারে কাল যাওয়া মাত্র তাকে দেখে এদের পছন্দ হল। একবারে ডিরেক্টর করে নিল। আচ্ছা, গল্পের সেই আশ্চর্য ঘটনা ঘটেনা কেন—কবে ঘটবে? হঠাৎ একদিন সেই আশ্চর্য সংবাদ আকাশ থেকে নেমে আসে না কেন? সব ওলোট্-পালোট্ হয়ে যেত তাহলে।

কিন্তু এখন কোথায় যাওয়া যায়। কফি হাউস। বন্ধুরা কেউ অফিসে—কেউ দূরে—কেউ কোন বন্ধুর অফিসে গিয়ে বসে আছে।

দুপুরের দিকে ট্রাম চলে ঠিক নৌকোর মত। খানিক দোলে। আলিপুর ব্রীজে ওঠার সময় মনে হবে উজান ঠেলে নৌকা এগোচ্ছে।

কফি হাউসে এখন যদি যায় তবে খুব ভাগ্য ভাল হলে দুএকজন পুরনো বন্ধুর দেখা পাওয়া যেতে পারে। গাল বুক পেট পাছা বন্ধুদের স্বাচ্ছন্দ্যের

সাক্ষী দেবে। খাওয়ার পর বিল এলে তারা ধীরে সুস্থে একটা বড় ব্যাগ খুলে নোট দেয়। খুচরো করে ফেরৎ নিয়ে আসে বেয়ারা। আট আনা অব্দি হামেশাই টিপ্‌স দেয় তারা।

ফুটপাথে ভিড় কম। সিনেমার লাইন পড়ে নি এখনও। পুরনো কলেজ পড়ল পথে। কারখানায় ঢোকার আগে প্রমথ এখানে পড়ত। সেই বারান্দা, প্রিন্সিপ্যালস্‌ রুম। দরোয়ান বসে। ওকে বিমানেশ টাকা দিত। সকালে মেয়েদের ছুটির সময় বিমানেশ কলেজে এলে দরোয়ান উঠে দাঁড়িয়ে সেলাম দিত। যাদের সঙ্গে ঝগড়া হত, যারা বন্ধু ছিল, সব ছড়িয়ে গেছে। কারও ছেলেমেয়ে হয়েছে। অমিতা প্রাইভেট টিউটরকে বিয়ে করে তার সঙ্গে একই অফিসে কাজ করে। সবাই কি বেগে ছুটে চলে যাচ্ছে। আমি এ কোথায় পড়ে আছি। আরও কত বছর পৃথিবীতে বাঁচব। তখন বাবা থাকবে না, মা না, বড়দা না। আমি কোথায় যাব। আমার ওপর মানুষ আর কতদিন বিশ্বাস রাখবে—আশা করবে—'হবে, হবে একদিন।' পল্টু আত্মার কথা বলে। পল্টু দুশো মাইল জিপে করে গিয়ে এক শহর থেকে আরেক শহরে কোম্পানীর সাবান, টুথপেস্ট, হেয়ার অয়েল, সেভিং স্টিক বিক্রি করে। সত্তর আশি বছর অনর্গল হাত পা ছুড়ে একদিন চলে যাব। দীর্ঘকাল বাঁচতে হবে এবং বাঁচার জন্য পাশাপাশি পরিশ্রম করতে হবে। পরিশ্রম করার ইচ্ছে থাকলেও উপায় নেই—সুযোগ নেই।

ঠিক ঐ জায়গাটায় ল্যাবরোটারির বারান্দায় ইন্দিরার সঙ্গে ভাব হয়। সব আস্তে আস্তে এখন ভাবনা হয়ে গেছে। সুধা ইন্দিরার কথা জানে না। ইন্দিরা সুধার কথা জানে না। এখন আমি ইন্দিরাকে ভুলে গেছি। সুধাকে কিছুদিন পরে ভুলে যাব।

সেদিন সন্ধ্যেবেলা ছিল। সেদিন এখন থেকে অনেকদিন আগে। এই ট্রামে বসে সেই সময়ে চলে যাওয়া যায় না। রাবিশ ফেলে ফেলে নতুন জমি —তার ওপরে একতলা বাড়ি ইন্দিরাদের। সামনে কলাফুল। রাস্তা হয়ে বাড়ি যেতে একটা সাঁকো পার হতে হয়। ছড়ানো লম্বা করা ডোবাটা কচুরি-পানায় বল্‌কা দিয়ে উঠেছে। এত সবের পরে সামনের ঘরটায় ঢুকে অনেক-গুনো লোকের সঙ্গে সেদিন মুখোমুখি হতে হয়েছিল। ইন্দিরার বাবা অন্য একটা খাটে বসে হাত কচলাচ্ছিল। কোণে সাবান তৈরীর কালো মেসিনটা।

ওটার ওপর বিজ্ঞাপন বেরোর কাগজে—সহজ সাবান প্রস্তুত প্রণালী। সুলভে সাবান প্রস্তুতের প্রণালী শিক্ষা দেওয়া হয়।

সামনের ঘর পেরোতে দেখা হল। তেপায়াটা এপাশ ওপাশ দোলে। ওপরে হেরিকেন—পাশে হাট করা জেনারেল ইকনোমিক্স্। বারান্দায় পড়তে বসেছে ইন্দিরা। বারান্দার পরেই যতদূর অন্ধকার ততদূর বিল। শেষ হলে ফলতা লাইনের ছোট রেল লাইন। কু কু ডাক দিতে দিতে ট্রেনটা খেলতে চলে গেল।

বই বন্ধ করে বলল, 'ঘটক।'

মা রান্না ঘর থেকে বেরিয়ে মাঝের ঘরে যাচ্ছিল। বারান্দায় টেবিলের সামনে বোকার মত দাঁড়াতে দেখে খুব করে তাকাতে তাকাতে পাশের ঘরে চলে গেল।

—'তুমি একটা কিছু কর না।' হাঁসের ঘরে হেরিকেনের আলো চলে গেছে। খয়েরি সাদা রঙের এক একখানা বোজান মোচার মত হাঁসগুলো পড়ে আছে।

ট্রেনটা তখনও দূরে দূরে বাঁশী দিচ্ছে। ঘোলসাহাপুর, রেলের মাঠ, পর পর পার হয়ে যাচ্ছে। একটা কিছু কর না—মানে হয় অনেক রকম। চাকরী কর, আমাকে বিয়ে কর, সামনের ঘর থেকে ঘটক তাড়াও।

তিনটের জন্যই দরকার ছিল একটি জিনিসের সেদিন। সাহস। কিন্তু সেই বয়সে তা হয়নি। কিংবা সাহসের বয়েসই হয়নি তখন। চুল ফাঁপিয়ে, পাঞ্জাবি উড়িয়ে, বয়েস বাড়িয়ে সহপাঠিনীর সঙ্গে প্রথমে কবিতা—পরে চুপ-চাপ পাশাপাশি বসে থাকার মহলা চালান হচ্ছিল। সাহসের ব্যাপারটা খুব মাথায় আসেনি। তাই, তোড়ের মুখে পাথর দিয়ে তা-না-না তা-না-না করে বারান্দা থেকে মাঠে নামলাম। ঘুরে গিয়ে শেষে বড় রাস্তায়। উঃ! মুক্তি। সন্ধ্যের সময়েই সব ঢিলে হয়ে যায়। সঙ্কল্প, পৌরুষ শিমুল তুলোর দানা হয়ে বাতাসে ওড়ে।

কালীঘাটের কাছে অনেকদিন পরে এনামেলের বাসন কিনছিল। সকাল বেলা বলে ডাক শোনা গেল। বাস, ট্রাম, শব্দ, লোক, সবকিছু কম। অন্য একটি ডগানো মেয়েকে টেনে এনে বলল, 'এর কথাই বলেছিলাম। মিলিয়ে দেখ।' মেয়েটি কি দেখবে? দেখার মত সাহসেরই বয়েস হয়নি।

'ননদ। বি. এ. পড়ে। দেখ পছন্দ কিনা।'

রীতিমত রসস্থ। হাতে একটা থালা, বলল, 'মাংস রাঁধতে বললে মুস্কিল হয়। মাঝারি মত ডেকচি একটা নিতে হবে।' তারপর হেসে বলল, 'যেওনা একদিন। এখন ত বাপের বাড়িই আছি।'

কাজ ছিল না—কারণ, নেই। গিয়ে শোনা গেল হাসপাতালে। সাবান প্রস্তুতকারক বাবা বলল, ব'সনা। আর একটু পরে ভিজিটার্স'রা যাবে।

কার ইচ্ছে করে হাসপাতালে যেতে!

বসিয়ে শোনাল—'হাসপাতালটা দেখতে অর্ডিনারি কিন্তু অ্যারেঞ্জমেন্ট খুবই ভাল। রুনু হওয়ার সময় খুব কষ্ট পেল সরকারী হাসপাতালে। তারপর দাসুর বেলায় এই মিশন হাসপাতাল। এখানেই দেওয়া—চেনা শোনা' —ইত্যাদি...

এর পর বসা যায় না। যেতে যেতে, 'আবার আসব' বলে চলে আসা হল।

এরও অনেক দিন পরে তখন আবার প্রেম করা হয়। এ অনেক কনসিডারেট। ট্রাম এত আস্তে যায়। যতদিন না ভাল কিছু হচ্ছে ততদিন অপেক্ষা করতে রাজী আছে। মাঝে মাঝে চুমু খাওয়া হয়—গা ঘেঁষে বসি—'ভীষণ ভালবাসি'—এই সব বলা হয়। ওমলেট খাই—দুধ খাওয়ার উপকারিতা ইত্যাদিও আলোচনা করি।

মোড়ের মাথায় বলল, 'মিকশ্চার আনার পয়সা নিলে, আনলে না-ত।' সব যায় যায়! এনি হাউ টাকাটা পূরণ করে দেওয়া উচিত। পয়সা নাই। হাতের বইখানা কোণের দোকানে বেঁচে বেরোচ্ছি—দেখি, সাবান প্রস্তুতকারকের মেয়ে দাঁড়িয়ে। লজ্জার খাতিরে দাঁড়াতে হল।

নিজেকেই বলতে হল, 'কেমন দেখছ?' সাবান প্রস্তুতকারকের মেয়ে কনসিডারেট মেয়েকে দেখল। 'ভালই মানাবে।' তারপর বলল, 'যাও দেরী কর না।' চলে যাওয়া হচ্ছিল, থামিয়ে বলল, 'চাঁপাকে মনে আছে? সেই যে কালীঘাটের ননদ, বিয়ে সহ্য হয়নি। বরটা গোঁয়ার।'

ভাবখানা এই আমি যেন কত মোলায়েম। আমার সঙ্গে বিয়ে হলে সুখে থাকত।

দূর শালা! তখন অল্পদিনের জন্য এক জায়গায় লিভ ভ্যাকান্সিতে আছি। বাইরে যতই বাড়িয়ে বলি—আসলে ত জানি আমি কি। পথে ঘাটে সাকসেস্‌ফুল মানুষগুলো খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে দেখা করে—খবর জানায়—জানার নামে জানাতে চায়—পোড়াতে চায়।

সেদিনটা কনসিডারেট মেয়ের সঙ্গেও ভাল কাটল না।

কনসিডারেট মেয়ে অন্ধকার মাঠে গাইল, 'জাগরণে যায় বিভাবরী মরি হরি হরি!' এরকমই কি একটা লাইন হবে। গানের পরে ফাঁকা পথে রিক্সার ঢাকনা ফেলে দিয়ে এলাম। আমাদের দুজনের ওজন ছিল তিন মণ এগারো সের—রিক্সাটা পঁয়ত্রিশ সের মত। মোট চার মণ ছয় সের। আমাদের আট-

খানা হাত পা পাল্লায় তুললে খুব বেশী হলে দেড় মণ হবে। আসল ওজন ধড়ের। বুক, পেট, মাজা, নাভি, এ সবেরই ত ওজন।

পরদিন সন্ধ্যেবেলা কনসিডারেট মেয়ের সঙ্গে দেখা হবে। দুপুরে তাই ঘুমোনো হচ্ছে। বিকেলে ঘুম থেকে উঠলে ফ্রেস লাগে।

সাধারণত আমার ঘুম হয় না। ঘুম হয় না—সাঁ সাঁ করে বুকের ওপর দিয়ে ট্রেন চলে যায়—অথচ ঝিনুকের বোতামটা আস্ত।

ঘুম থেকে উঠে যেই ভেবেছিলাম সেদিন, এবারে যাই, কনসিডারেট মেয়ের সঙ্গে কিছু প্রেম করি, অমনি কি হল মনের মধ্যে। সাবান প্রস্তুতকারকের মেয়ের কথা মনে হল। সে আমার বৌ হবে না কোনদিন। আমি তার প্রেমিক হব না কোনদিন। আমরা অর্ডিনারি হয়ে গেছি। দেখা হলে আর বুক কাঁপবে না।

দেখতে কর্পোরেশনের ম্যাথরানির মত। কিন্তু কেন যে ভাল লাগত—কেন যে এখনও একটু একটু লাগছে—দুপুরের ট্রামে বসে প্রমথ কিছুতেই বুঝে উঠতে পারল না। অনেকগুলো তেজী কাক ফুটপাথে নেমে এসেছে। দেওয়ালে উঠে পায়চারিই ত করে ওরা। জলে ছায়াটা অব্দি দেখে না। যদি ঠোঁট থেকে কিছু ফসকে যায়।

ময়দান পার হয়ে গেছে ট্রাম। পরশু অঞ্জুর সঙ্গে সন্ধ্যেটা কি সুন্দর কাটল। সুধা নিশ্চয় অফিসে। অঞ্জু কলেজ থেকে এসে চান খাওয়া করেছে। কোথায় যাওয়া যায়। গেলে অঞ্জু নিশ্চয় বসতে বলবে। প্রমথদা মেজদির লাভার।

॥ পাঁচ ॥

এখন বাড়ি গিয়েও লাভ নেই। এর আগে যেখানে যত ইন্টারভ্যু দিয়েছে বাড়ি ফেরার পরই অসংখ্য প্রশ্নের উত্তর দিতে হয়েছে। মা জিজ্ঞাসা করবে, 'তারা কি বলল। দেবে তোকে?' 'তারা' মানে যাদের ওখানে ইণ্টারভ্যু দিতে গিয়েছিল। বাবা বলবে, 'হবে তো?' সবচেয়ে করুণ হয় যখন বড়দা প্রশ্ন করে। সে আগাগোড়া শুনতে চায়। কোন উত্তর ভাল হলে সুখী হয়। বলে, 'তাহলে তোর এবার হয়ে যাবে।' না হলে প্রমথর চেয়ে সেই-ই বেশী দুঃখ পায়। বলে, 'লাকটাই তোর খারাপ।' চাকরীর জন্য মন প্রাণ দিয়ে মা ভগবানের নাম করে। এইসব যেন আকশীর মত চাকরী পেড়ে আনবে। মা'র দুর্গা দুর্গা নারায়ণ নারায়ণ তাই হ্যাংলামি মনে হয়।

আচ্ছা এখন দুপুরে প্রমথর বয়সী লোকেরা অফিসে এক ঘর থেকে অন্য ঘরে ফাইল নিয়ে যাচ্ছে। টিফিনে টোষ্ট খাচ্ছে। আর প্রমথ? লাভারের সবে যুবতী বোনটির সঙ্গে কাছাকাছি বসে হাসিঠাট্টা করার লোভে এই অদ্ভুত সময়ে সে গিয়ে হাজির হবে।

যৌবনে লোকে ব্যায়াম করে, সিগারেট খায়, ভাল বই পড়ে, বোকা হলে আদর্শ আঁকড়ে থাকে। প্রমথর খুঁটিটা মাটিতে ভালভাবে কোনদিন পোতাই হয়নি। সব সময় টলবল টলবল করছে। আকস্মিকতাবর্জিত দীর্ঘ ভবিষ্যৎ এই শূন্য অর্থহীন জীবনের একপাশে পড়ে থাকে আর ভয় দেখায়। আর দশ বছর পরে কি হবে। এভাবে চললে আটচল্লিশে তাকে কে দেখবে। এইসব দুশ্চিন্তা এবং বারবার মাথা কুটেও যখন এই বৃত্ত থেকে বেরোনো যায়নি—তখন প্রমথর পক্ষে বেশ কড়া কিছুর দরকার। আত্মীয় স্বজনের কাছে সব-চেয়ে বড় কথা—'ওর বেশ ভাল আয়।' দেখা হলে বলে, 'তুই কোথায় আছিস।' শুয়োরের বাচ্চা মাতৃগর্ভে নেই নিশ্চয়ই। আর হারামজাদা পৃথিবী ত চিনিস নিশ্চয়ই। তুইও তো থাকিস এখানে। তবে এসব প্রশ্ন কেন? আরও মজা, প্রশ্নগুলো করে মেয়েরা। কোন এ্যালাউন্সের সঙ্গে কোন এ্যালাউন্স যোগ দিলে কত হয়—কার মাইনে কত, সব তাদের মুখস্থ। যে বেগে, যে আবেগে গীতা চণ্ডী অর্থ না বুঝে আউড়ে যায়—ঠিক সেই নির্ভুলতায় তারা মাইনে-গুলো মুখস্থ রাখে। বরং ছেলেরা জানে (পিসেমশায়, মেসোমশায়, জ্যাঠা-

মশায়, খুড়োমশায় ইত্যাদি সকলে—এর মধ্যে দাদা, মামা, ভগ্নীপতি এবং জামাইও আছে) চাকরী করা একটা বিরক্তিকর জিনিস—সামান্য সম্মানবোধ থাকলে মাসের শেষের মাইনের টাকা কিছু অপমান মাখানো মনে হবেই। তাই তারা বিশেষ কিছু জিজ্ঞাসা করে না।

এই অবস্থায় বই বেশিদূর পড়া যায় না। ইতিহাস খানিক পড়ে মনে হয় এর সঙ্গে আমার কোন যোগ নেই। খেতে ভাল লাগে। তবে একটি সুরসিকা মেয়ে এখনকার উত্তম পথ্য। কথা বললে গুমোট কেটে যাবে।

অঞ্জু কিছু সুরসিকা। তাছাড়া দাঁতের মাজনের মত কালো মাড়ি, বেটে বেটে আঙুল এসব সত্ত্বেও অঞ্জু ঝক্‌ঝক্‌ করে জ্বলতে পারে। অনেক হাসে। ক'মাস আগে সুধাদের বাড়ির দোতালায় কাদের বিয়ে ছিল। বারান্দায় আলো নিভিয়ে অঞ্জু বসে ছিল। চোখ দোতলার ঝাঝরি ঢাকা বারান্দায়—বর সাত পাক দিচ্ছে। কেউ কোথাও নেই। এখন অঞ্জুকে জড়িয়ে ধরার পক্ষে সবচেয়ে ভাল সময়। প্রমথ এত ভাল সময়ে এসে পৌঁছবে ভাবতে পারেনি। পাশাপাশি বসে অন্যমনস্ক অঞ্জুর কানের পাশে ফুলকো চুলে গন্ধ নিল।

একটা জিনিস সম্পর্কে প্রমথ সিওর। প্রমথ অঞ্জুকে ভালবাসে না। এমনকি অঞ্জুকে তার ভালও লাগে না। মাঝে মাঝে এমন বোকার মত কথা বলে—তখন অফিসপাড়ার পানউলি পানউলি লাগে। বি. এ. ক্লাসে ওথেলো ওর কাছে ইতিহাসের জাপ-মার্কিন যুদ্ধের কুড়ি কি তিরিশ নম্বরের একটা প্রশ্নের চেয়ে বেশী না। তবু কিছু রহস্য আছে অঞ্জুর। এমন আন্তরিকভাবে ঠোঁট টিপে চোখ মটকায় যে ভীষণ লেপ্‌টে থাকতে ইচ্ছে করে। একেবারে গায়ে গায়ে। সুধা ওসব পারে না। একেবারে মাড়-গালা ভাত। অঞ্জুর চোখমটকানো অন্য বয়সে নিশ্চয় জঘন্য লাগবে। কিন্তু এখন—যৌবনে কুক্কুরীও ধন্যা।

তাছাড়া এমনিতেই অঞ্জু ইণ্টারেস্টিং। শাড়ি ঢাকা দুই বুক, পরস্পর বিচ্ছিন্ন দুই ঠোঁট, পিঠময় বেণী আছড়ানো আর বাগিয়ে তাকানো চোখ দুটো ত আছেই।

সেদিন বারন্দায় অঞ্জু বাধা দেয়নি। বাধা দিলেও বাধা টিকত না। প্রমথ বেশী দূর এগোয় নি। আলতো করে গরম নিঃশ্বাস শুদ্ধ খড়খড়ে ঠোঁট দিয়ে অঞ্জুর গালে একবার মুখ রেখেছে। কি হয় এসব করে। অঞ্জুকে পাওয়া যায়। প্রমথ জানে এসব পাওয়া নয়। তার নিজের দেহেরও ত দাম আছে। হৃদয়ের সম্পর্কবর্জিত অঙ্গপ্রত্যঙ্গের জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি আসক্তি মাখানো এক ধরনের যুদ্ধ—চট্‌চটে। একটা জিনিস প্রমথ বুঝতে পেরেছে। সারা রাজ্যের শ্রান্তি, অস্থিরতা, অস্বীকৃতি সব—একবারের চুম্বনে একবারের

নিবিড়তায় স্থির হয়, স্বীকৃত হয়—তা সে যত হৃদয়সম্পর্কবর্জিত হোক্ না কেন। নিবিড়তার ঘন মুহূর্তে কিছুতেই মনে থাকে না—আমি অঞ্জুকে ভালবাসি না, সুধাকে না, ইন্দিরাকে না, কর্নাসিডারেটকে না। কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু চাকরীই প্রতিবন্ধক না। আমিই আমার প্রতিবন্ধক। জান্তব ধস্তাধস্তিতে, সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই—ঘন মুহূর্তের স্বীকৃতিতে আমি প্লুত হই। এমনকি শারীরিক ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়—কিন্তু তবুও আমি নপুংসক। আমার চোখে একরকমের মহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আসটে গন্ধ সে কাজলে—আমার চোখ লাল হয়—আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি। ঘোৎ ঘোৎ করে এগোই। অঞ্জুর, সুধার, পথের মেয়ে ইত্যাদি সকলের বুকের কাপড় একরকম মেঘ মনে হয়। সরে গেলেই আশা করি একখানি গ্রাম্য শস্যভূমি কিংবা ঐ জাতীয় সতেজ নবীন কিছু দেখব। এইসব দেখে যদি ভালবাসায় পড়ি।

পরিতোষ সামনের ঘরেই ছিল। ঠাঁই করা হচ্ছে। বড়দি খাটের পাশে হাত দিয়ে ভর দিয়ে বসে আছে। বলল, 'কোথায় গিয়েছিলে? ইণ্টারভ্যু। বেশ মানিয়েছে।'

অঞ্জু বেরিয়ে এল, 'ওমা সত্যি কী সুন্দর দেখাচ্ছে।' তারপর গলা খাটো করে বলল, 'ওকি আমার দিকে তাকাচ্ছেন আবার?'

প্রমথ তাকায়নি। এই কথা বলে অঞ্জু প্রমথর চোখ তার ওপর নিল। মেয়েলোকই নরকের দ্বার। এমন সাবধানে চলাফেরা করে। কোন কথার ভেতরে গান তুলে দিয়ে সারাটা শরীর বিদ্যুৎ ভর্তি মেঘ করে রাখে। উঁচু কল্পনা আর দলিত মথিত দ্রাক্ষাবনের মাঝখানে ওরা ঠিক সাবধানী পায়রা। মেঘ বৃষ্টিতে অন্ধকার সন্ধ্যায় এক একটা পায়রা কেমন শ্যাওলা-পড়া কার্নিশে লাফিয়ে লাফিয়ে চলে—ওড়েও না—পড়েও না। ঐ এক খেলা।

একি সুধা বাসায়? সুধা ভাতের থালা নিয়ে আসছিল। দেখেই খচ্ করে ভেতরে চলে গেল। বড়দি বলল, 'অফিস যায়নি। শরীরটা ভাল না।' তবেই হয়েছে।

সুধা মুহূর্তে শাড়ি পালটে এসেছে। পরিতোষ বলল, 'খেয়ে এসেছ? দুটি খেয়ে যাও এখানে। কপি কই মাছ দুই-ই আছে।'

প্রমথ রাজী হয়ে গেল। খেয়ে এসেছে। তবু।

সুধা পরিতোষ আর প্রমথর আসন পেতে দিল। দূরে অঞ্জু আর বাচ্চারা বসল। এমনভাবে সুধা ভাত বেড়ে দিল যেন বাবার সঙ্গে জামাই খেতে বসেছে। প্রমথ এমনিতে ছড়িয়ে খায়। কিন্তু আজ সব খুঁটে-খুঁটে খেল।

সুধার ভারি ভাল লাগছে। প্রমথর মতিগতি ভাল হচ্ছে তাহলে। আগের মত হচ্ছে। সুধাকে ভালবাসে প্রমথ। এমন একটা লম্বা পুরুষ লোক সুধার স্বামী—যদি বিয়ে হয়—অফিস সুদ্ধ জ্বলে পুড়ে মরবে। খাওয়া দাওয়ার আগে বাবলুর একটা ধুতি পরতে দিয়েছিল অঞ্জু। আঁচিয়ে এসে প্যাণ্ট সার্ট পরতে যাচ্ছে প্রমথ—সুধা অঞ্জু সবাই বলল, 'দুপুরে কোথায় যাওয়া হচ্ছে। এখানে বসে গল্প করতে হবে।'

খাটের একদিকে বসে প্রমথ! ওঘরে গুরুজনেরা আশ্রয় নিয়েছে। এখানে তিনটি যুবতী ও একটি খাঁটি নপুংসক এখন বসে গল্প করবে। খানিক পরে বড়দি ঘুমোলো। অঞ্জু বোধহয় প্ল্যানমত পড়তে গেল। সুধা একা একা প্রমথর পিঠে চিমটি দিতে সুরু করল।

'তুমি খরগোসের মত কর কেন? এ্যাঁ। আমি কি খুব খারাপ দেখতে? বিয়ের পর যত্ন কোরো দেখবে কত সুন্দর হই।'

প্রমথ হাসল শুধু।

'টাই পরে তোমাকে ত খুব সুন্দর মানায়। পর না কেন?' তারপর নিজেই বলল 'অফিসারের পোষ্টে ইণ্টারভ্যু বুঝি?'

প্রমথ কোন উত্তর দিল না। অফিসার একটা স্বপ্ন। ছেলে কি করে—অফিসার।

ক'দিন আগে নীতিশ এসে হাজির। 'কিচ্ছু লিখছি না—কিচ্ছু হচ্ছে না -আসল লেখা একে বলে'—ইত্যাদি বলে সময়টা কাটল। হঠাৎ বলল, 'চল আমার বৌর সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই।'

নীতিশের শ্বশুরবাড়ি যাওয়া গেল ঘুরতে ঘুরতে। শিবপুরে বাস থেকে নেমে মিনিট দুইয়ের পথ। আলাপ হল। সেই বলল, 'আমার এক বোন আছে, বিয়ে করবেন? আমার দিদি।'

জবা লাগানো উঠোনে গোটা দুই বালতি পড়ে ছিল। সেদিকে তাকিয়ে বসেছিল। হেরিকেনটা ঠিক চোখের ওপর। নীলচে শাড়ি পরা একটি লম্বা মেয়ে মাথা নীচু করে সামনে দিয়ে কলতলায় কি বাথরুমেই হবে—ওদিকে চলে গেল।

'কেমন দেখলেন?'

'দেখিই নি। ওরকম সামনাসামনি দেখা যায় নাকি?' প্রমথ দেখেছিল, মুখখানা সুন্দর। কিন্তু ঐ পর্যন্ত। ওভাবে তাকাতেই লজ্জা করে। আসবার সময় বারান্দায় দাঁড়ালে নীতিশের বৌ বলল, 'সরে দাঁড়াবেন। শুয়ো-পোকা আছে শিউলি গাছটায়।' সরে দাঁড়িয়ে প্রমথ শিউলির গন্ধ পাচ্ছিল। নীতিশের শাশুড়িই হবেন। গলা পাওয়া যাচ্ছিল। খুব আস্তে—আর কার সঙ্গে কথা বলছেন। 'ছেলে অফিসার? ও না। হতে পারে। আ... হোক্।' সব ম্যাড়মেড়ে হয়ে গিয়েছিল সেদিন।

প্রমথ বলল, 'সুধা, তুমি আমাকে খরগোস বললে কেন?'

'বলব না ত কি। মাথা নীচু করে চোখ বুজে নরম নরম জায়গা দিয়ে চলাফেরা কর—তাই বলি।' সুধার আরও বলার ইচ্ছে ছিল। তুমি কত বড়। কত শক্তি আছে তোমার মধ্যে আমি জানি। লোককে কত হাসাতে পার ইচ্ছে করলেই তা আমি জানি। সব সময় মনে হয় ছদ্মবেশ পরে ধুকছ। খুলে ফেল। আমায় চুমু খেলে তোমার গন্ধ লাগে—আমি ভাল মাজনে মুখ ধুয়েছি। আমি রেডি।

প্রমথ নরম নরম জায়গাগুলো ভয় করে। কখন কি হয়। 'তুমি বুঝি খুব অফিসার ভালবাস?'

'খুব। তারা কেমন স্বাধীন। নিজের খাতায় নিজের টেবিলে বসে সই করে। বাইরে টুলে আর্দালি থাকে। শুধু সই করেই কাজ শেষ। কত বেশী মাইনে পায়।'

প্রমথ বলল, 'অফিসার তীর ছুঁড়তে পারে, ঘোড়ায় চড়তে, তরোয়াল ঘোরাতে—'

সুধা হেসেই থামাল। 'পাগল হলে নাকি। ওমা! ওসব করবে কেন?'

প্রমথ বাধা দিয়ে উঠল, 'অফিসার তাহলে রাজপুত্র নয়।'

সুধা বলল, 'বল, অফিসার যাত্রাদলের সং নয়। অফিসারকে কত জরুরী কাজ করতে হয় জান? তাকে তরোয়াল ঘোরাতে দেখলে মেডিক্যাল বোর্ড বসবে। পরীক্ষা করে দেখবে মাথা খারাপ কি না।'

তারপর বলল, 'কি হল। আজ যেখানে গেলে?'

'যথাপূর্বং!'

সুধা বলল, 'ঘাবড়াবার কিছু নেই। তুমি এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জে নাম লেখাও। কারখানায় এক্সপিরিয়েন্সের কথা লিখে দিও। ঠিক লাগবেই

একটা।' উঠে জানলাটা বন্ধ করে দিল, 'দেখনা আমিই ত' এক্সচেঞ্জ মারফৎ চাকরী পেয়েছি।'

এরপর সুধা কি বলবে প্রমথ জানে। কত সস্তায় একটু ভেতরে কত ভাল বাড়ি পাওয়া যায়। চাকর গোড়াতে লাগবে না। একটু সামলে বসলে —সুধা সব ম্যানেজ করবে। নীতিশও সেদিন তাই বলছিল। 'জান লোকে কত কমে সংসার চালায়?' প্রমথ বলেছিল, 'আমি যে তোমার শালীকে বিয়ে করব, চালাব কি করে। ধর একটা চাকরী পেলাম, কিংবা নিলাম—কিন্তু কতই বা পাব।' এই ধরনের আলোচনা ভীষণ লাবণ্যশূন্য। বেশীক্ষণ ভাল লাগে না। কোথাও বীরত্বের লাবণ্য নেই। সর্বত্র হিসেবের ন্যুব্জতা—চারিদিক আচ্ছন্ন করে দিচ্ছে।

অঞ্জু চায়ের কাপ নামিয়ে দিয়ে বলল, 'নিন খান। খাওয়ার পর সাহেবরা খায়। ফ্রেস লাগবে।' সুধাকে বলল, 'মেজদি খাবি নাকি?'

'বেশী আছে?'

'বাবার জন্যে করলাম।'

'বাবা ঘুমোয় নি। আবার রঙ্ দিচ্ছে?'

অঞ্জু হাসল। প্রমথ বলল, 'রঙ দিচ্ছে?'

'হুঁ। কোন্ মক্কেল খানিক বার্ণিশ দিয়ে গেছে। ওই ভাঙা চেয়ারটায় ক'দিন হল লাগাচ্ছে। কোর্ট কামাই করেও।'

ভেজান দরজার ফাঁকে পরিতোষকে দেখা যাচ্ছে। হাত ভর্তি বিভিন্ন আঙটি। মেঝেয় বসে চেয়ারটা উলটে রঙ লাগাচ্ছে পরিতোষ। এ সময়টা মেয়েদের জন্যে পাত্র খুঁজলে অনেক ভাল করত। প্রমথ বলল, 'তোমার বাবা খুব অধ্যবসায়ী!'

অঞ্জু বলল, 'খুব পরিশ্রম করতে পারে বাবা। স্টুডেন্ট লাইফে কি কষ্টে পড়াশুনা করেছে মেসে থেকে।'

সুধা বলল, 'ছবিটা নিয়ে আয়না। তোর প্রমথদা দেখুক।'

অঞ্জু আঁচল দিয়ে মুছে একখানা ফটো নিয়ে এল। বাঁধানো হয়নি আজ পঁচিশ ত্রিশ বছর। সৌম্যদর্শন এক যুবক। বড় বড় চোখ। পাতলা গোঁফের দাগ। সুধা বলল, 'বাবা খুব সুন্দর ছিল। সেই তুলনায় মা বিশেষ কিছু ছিল না। আমাদের দেখেই বুঝতে পারছ।'

প্রমথ বলল, 'তোমাদের বরগণ সুন্দর হইবেন!'

সুধা বলল, 'হ্যাঁ ভাল কথা, অঞ্জুর জন্যে একটা ছেলে দেখে দাও না। ওকে আমরা বিয়ে দিয়ে দেব।'

অঞ্জু খাটের ওপর চুপ করে বসে পা দোলাতে লাগল। প্রমথ বলল, 'কেন তোমার—বড়দির—কি হল? তোমরা যোগিনী সাজবে নাকি?'

সুধা গম্ভীর গলায় বলল, 'আমি ছাব্বিশ অব্দি দেখব। বিয়ে হল ভাল—নাহলে আর কোনদিন করব না। একটা এ্যাকসিডেণ্ট ইনসিওরেন্স করছি। প্রিমিয়ামের সঙ্গে আড়াই টাকা বেশী দিলে এ্যাকসিডেণ্ট রিস্ক নেবে।'

'কিরকম?'

'এমনি হাত পা ভাঙলে কিছু দেবে না। কিন্তু ধর যদি একদম খোঁড়া, কিংবা পুরো অন্ধ—না হয় কম করে যতদিন বাঁচব ততদিন বিছানাই আশ্রয় হল—তাহলে যত ইনসিওর করেছি তার ডবল দেবে—' সুধা আরও কি বলত। অঞ্জু বলল, 'থাম্‌তো মেজদি। কি বক্ বক্ করিস ভাল লাগে না। হ্যাঁ প্রমথদা আমার জন্যে একটি ছেলে দেখবেন তো। আপনার মত ঘ্যানঘেনে প্যানপেনে না হয়। বেশ স্মার্ট ডেয়ারিং।'

'বেশত পল্টুকে বিয়ে কর।'

'আপনার ভাই? পল্টুবাবু! এখন কোথায়?'

'অণ্ডাল কি আসানসোল বোধহয়। ওর সঙ্গে বিয়ে হলে অঢেল স্নো পাউডার পাবে।'

'ধ্যাৎ! আপনি একটা একের নম্বরের অসভ্য। একি যাচ্ছেন নাকি?'

সুধা বলল, 'আর একটু বোস না। তোমাকে কী সুন্দর দেখাচ্ছিল যখন এলে।'

'কেন এখন দেখাচ্ছে না?'

'সব সময় দেখায়।' সুধা এমন করে কথা বলে যেন একটা গান গাইছে। তন্ময়, তদ্গত ভঙ্গী।

'নাঃ! চলি।'

'ওকি টাইটা বাঁধ।'

'কি এখন বাঁধব। লোকে অফিসে গেলে বাঁধে। দুপুরে একা একা টাই বেঁধে—' বাকিটা মনেই থাকল প্রমথর। বাকিটা হল—'ঘুরছি, অথচ কোন চাকরী করি না, কি বলবে লোকে।'

অঞ্জু বলল, 'মেজদির সঙ্গে ছুটিতে যখন বেরোবেন দেখবেন আপনাকে কি রকম সাজায়।'

অঞ্জুর কথায় প্রমথ ভয় পেয়ে গেল। এযে সত্যি এ বাড়ির জামাই, সুধার বর করে তুলছে তাকে।

অঞ্জুও সঙ্গে সঙ্গে বেরোল। সুধা বলল, 'কোথায় যাবি?'

'যাই গল্পের বইগুলো ফেরৎ দিয়ে আসি। জানেন প্রমথদা এই বইটায়

আপনার মত একটা ক্যারেক্টার আছে। কিন্তু খুব মিশেটিশে শেষে কে জানে ঝুলে পড়ল। আপনার সঙ্গে মিল মানে শেষটুকু না—গোড়ার দিকে—সত্যি পুরুষ লোক খুব খারাপ হয়, না?'

'কাকে জিজ্ঞাসা করছ? আমিও ত—।'

'বাঃ! আপনি ত আমাদের লোক—আমি বলছি এই যারা—'

সুধা ধমকে উঠল, 'উঠোনে দাঁড়িয়ে আর কাব্য করতে হবে না। যা বই দিয়ে আয়।' প্রমথকে বলল, 'কবে আসছ?'

'দেখি একদিন—চলে আসব হঠাৎ।'

'দুর্গাপুরের ওটা এ্যাপ্লাই করবে নাকি? ডি এ নিয়ে মোট মন্দ হবে না।'

'আগে একটা পাই তো—পরে হিসেব। দুর্গাপুর এ্যাপ্লাইতে টাকা অনেক লাগবে।'

'তুমি কাগজপত্র নিয়ে এসোতো—তারপর দেখা যাবে।'

'আচ্ছা দেখি।'

'না আসবে কিন্তু—'

প্রমথ ততক্ষণে বেরিয়ে গেছে। সুধার আরও কিছু বলাব ইচ্ছা ছিল। অনেকদিন এমন করে অনেকক্ষণ থাকেনি প্রমথ। দুপুরে ভাত খায়নি। প্রমথ বোধহয় আবার আমাকে চায়।

মোড়ের মাথায় এসে টাইটা খুলে মুড়ে পকেটে রেখে দিল। এখন প্রমথ অফিসার না। তীর ছুঁড়তে পারে, তরোয়াল ঘোরাতে পারে, রাজপুত্র। ছেলেদের গল্প বইতে তার মত একটা চরিত্র আছে। তবে শেষটা নাকি তার মত না। শেষটাও ত হতে পারে। সে ত অন্যত্রও ঝুলে পড়তে পারে। তখন সুধা হারিয়ে যাবে। নীতিশের শালী হারিয়ে যাবে। সব পর পর হারায়। একটা পোস্টকার্ড পেয়েছিল। তাতে লেখা ছিল, 'প্রিয় প্রমথ, ভালবাসা নিও। হয়ত প্রথমে চিনতে পারবে না। হয়তো বা কেন, সত্যি চিনতে পারবে না, যতক্ষণ না পরিচয় দিই। তোমার এইবার হয়ত মনে পড়বে। তুমি যখন জেলা স্কুলে ক্লাস এইটে পড়তে তখন তোমার ক্লাসে যে মনিটর ছিল সে হলাম আমি। তোমার ঠিকানা পবিত্র দিয়েছিল। তাই নিয়ে দেখা করতে গিয়ে খুঁজে পেলাম না। তুমি যদি পার একটা কার্ড দিও। কবে কোথায় দেখা হবে। ইতি—রবি।'

...ফল, চিঠিতে কোন ঠিকানা নেই। রবি কিংবা পবিত্র ... চেহারাও মনে নেই। বরং দেখা হলেই মুস্কিল হত। চিরকালের ... হারিয়ে গেল রবি পবিত্র। সুধাও যদি যায়। আমিও কারও কারও কাছে যাব। চিরদিনের মত। এর মধ্যে হঠাৎ কিছু একটা ঘটে না কেন। ... রোজ ঘটে তা নয়। একেবারে নতুন। কোনদিন দেখিনি, শুনিনি।

॥ ছয় ॥

মার সঙ্গে বসে বসে লেপগুলো পাকিয়ে বস্তায় ভরা হল। ঠাকুর ঘরের তাকে লেপের বস্তা রেখে দিয়ে বারান্দায় দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছিল প্রমথ। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে একটা অতি পরিচিত ছবি রোজ দেখতে হয় বলে বারান্দায় দাঁড়াতে চায় না। রাসবাড়ির চুড়ো, বজবজের ট্রেন লাইন, নিমগাছ, বিড়ির দোকান, ট্রাম বাস—একঘেয়ে। এই গরমে চারখানা ঘরে সবার জায়গাই হয় না। ভাগ্যিস বড়দা বদলি হয়ে গেছে। মেজদা আলাদা। প্রথম খুব কষ্ট হয়েছিল। মেজদা চলে গেল। বয়স বাড়লে স্বর্গচ্যুতি ঘটে। তনুদা তো একেবারেই চলে গেল। মা বিকেলে খাবার দিয়ে ডাকত ভানু, মনু, তনু, পানু, পল্টু, রেবা, বিজু। এখন সব একসঙ্গে হলে মা দুজন করে খাবার জায়গায় ডাকে। ভানু-মনু, পানু-পল্টু, রেবা-বিজু।

তনুদা মারা গেছে এখন কারও তা মনেও নেই। বৃহস্পতিবার সন্ধ্যেবেলা মারা গেল। হাসপাতালে পাওয়া গেল শুক্রবার সন্ধ্যেবেলা। পোড়ানো হল শনিবার দুপুরে। ম্যাট্রিক দিয়েছে তখন প্রমথ।

বড়দার পরে তনুদার গায়েই জোর বেশী। মেজদা হাঁটলে মাথা দোলে। তনুদা হাঁটলে হাঁটুর গিটে শব্দ ওঠে মট্—মট্ মট্।

প্রমথ একদিন তনুদার পেছন পেছন গিয়েছিল। তনুদা হাঁটলে কোনদিকে তাকায় না। যতীন সিংঘির মাঠের কাছে বকুলতলা। সার্ভেয়ারদের ক্যাম্প। দাড়িওয়ালা পাজামাপরা লোকটা হ্যারিকেনের আলোয় ক্যাম্পখাটে বসে ম্যাপ দেখছে। তনুদা বকুলতলা দিয়ে ভাঙা সুরকিকলের পাশ কাটিয়ে বড় রাস্তায় গিয়ে পড়ল। নিমাইদাও আসছিল। একটু হাসল তনুদা।

নিমাইদা বলল, 'দূর কিছু ভাল লাগে না।' 'আমারও। সন্ধ্যে হলে কেমন বিশ্রী লাগে।'

কতদিন মনে হয়েছে প্রমথর, ডাক্তারের ভুল হতে পারে। যে ডাক্তার তনুদার নাড়ী দেখেছিল। বহুদিন পরে একদিন স্বপ্নে প্রমথর মনে হয়েছিল, তনুদাকে পোড়ানোর সময় হয়ত প্রাণ ছিল। কিংবা এও হতে পারে লোকটা আটেই তনুদা না। অন্য কেউ।

আজকাল আর স্বপ্ন দেখে না প্রমথ।

প্রমথর পরেও মনে হত, আর হলই বা তনুদা। না হয় মরলই। এ হাসপাতাল না হোক অন্য হাসপাতাল। অন্য হাসপাতাল না হোক অন্য ডাক্তার। যে ডাক্তার একশ বছর প্র্যাকটিস করছে এমন কাউকে দেখালে হয়। হয়ত প্রাণ বুড়ো আঙুলে লুকিয়ে ছিল—আমরা না জেনে পুড়িয়ে দিলাম।

কিছুদিনই তনুদা কেমন পালটে যাচ্ছিল। পড়ার বই না কিনে কি একটা বই কিনল। মলাটে এক মেমসায়েব আর পুরনো আদ্যিকালের ট্রেনের ছবি। এ্যানা কারেনিনা। রাশিয়ার গল্প। শুধু বরফ আর বরফ। সারা-দিন কাঁথা মুড়ি দিয়ে পড়ল। সন্ধ্যেবেলা একটা টেষ্ট টিউব মুখের কাছে নিয়ে নাড়তে লাগল। 'জানিস চিনি খাচ্ছি?'

'চিনি না হাতি। কি না কি মুখে দিও না। বড়বৌদি?' সেদিন লুকিয়ে ফেলল।

হাসপাতালের ডাক্তার মেজদাকে বলছিল—'এও এক ধরনের মনো মেলাঙ্কলিয়া। সন্ধ্যের দিকে মন খারাপ হয়ে যায়। যখন বলছেন অন্য কোন কারণ ছিল না তাহলে নিশ্চয়ই মনো মেলাঙ্কলিয়ায় থেকে সায়ানাইড খেয়েছে।'

চায়ের কাপটা টেবিলে রেখে চান করতে গেল প্রমথ। গরম পড়েছে।

॥ সাত ॥

শ্যামনগরে কী উৎসব যেন। ইলেকট্রিক কোম্পানীর ছেলেরা 'সাংস্কৃতিক' কিছু একটা করবার জন্যে অবিনাশকে নেমন্তন্ন করল। কিছু বলতে হবে। নীলিমাকেও নিয়ে গেল ওরা। গাইতে হবে। লম্বা ট্রিপ দিয়ে শ্যামনগরে পেঁছিতেই আটটা বেজে গেল। নীলিমা গাড়ি থেকে নামতে নামতে বলল, 'কোমর ধরে গেছে।'

অবিনাশ গাড়ির ভেতরেই জিরিয়ে নিচ্ছিল। বলল, 'আমি নামছি না, তুমিও এসে বস না।'

'না আর বসতে হবে না।' তারপর ধমকে বলল, 'নেমে এসো ত। এক ফোঁটা ছেলে সারাটা পথ জ্বালিয়ে খেয়েছ।' ছোট গাড়ি। ড্রাইভারও ছোকরা মত। কলকাতা থেকে শ্যামনগর অবধি একটানা পথ চোখ সামনে রেখে গাড়ি চালিয়েছে। ঘাড় টন টন করছিল। সামনের আয়নার মুখ ঘুরিয়ে অন্য দিক করে রেখেছিল। গাড়ি থামিয়েই সে কর্মকর্তাদের খবর দিতে ছুটেছে।

স্টেজে উঠে অবিনাশ খুব আস্তে আস্তে তার কথাগুলো বলল, 'এই যে সামাজিক অস্থিরতা, চারিদিকের অনিশ্চয়তা—মৃত্যুর একান্ত সত্য—এর মাঝে নির্জনে আত্মসংস্কৃতি শান্তি বহন করে আনবে।' কথা কটা বলে মাইক থেকে মুখ নামিয়ে সামনের শ্রোতাদের দিকে তাকাল। প্রথম সারিতে কারখানার সাহেব ম্যানেজার, অবাঙ্গালী কিছু হোমরা-চোমরা, পাশে বাঙ্গালীরাও আছেন। নীলিমা কিছু পরে গাইবে বলে সামনের সারিতে বক্তৃতা শোনার জন্যে বসেছে। 'দোষেগুণে মানুষ—তার অপরাধ অক্ষমতা সব নিয়েই মানুষ। বিশ্বজনীনতার কবি রবীন্দ্রনাথ স্খলিত মানুষের কথা বলেছেন।' নীলিমা ব্যাগ খুলে কি হাতড়াচ্ছে। নিশ্চয় ঘড়িটা। আসবার সময় চেন খুলে গেছে। অবিনাশের ইচ্ছে হচ্ছিল, চোখের বালির বিনোদিনীকে নিয়ে কিছু বলে। দোটানায় পড়ে রমণীরত্ন কেমন মাকু হয়ে যায়। তার নিজেরই একখানা উপন্যাসে এমন চরিত্র আছে।

অবিশ্যি নীলিমাকে তার স্বামীর কথা জিজ্ঞাসা করার মানে হয় না। নিজেই দুএক সময় বলে। সেবারে স্বামী-স্ত্রী দুজনে অবিনাশের বাড়ি এসে উঠল। দিন তিনেক থাকবে। অবিনাশ লিলিকে দরকার মত সব কিছু এনে দিয়েছে। লিলিও জন্মের সাধ মিটিয়ে রান্না করেছে। গোরাবাবু খাবেন। নীলিমাদিও। নিজের বাচ্চা দুটো নীলিমার খুব বাধ্য।

পাশাপাশি ঘরে বিছানা হয়েছিল। রাতে লিলি বলল, 'ওদের বাচ্চা নেই গো। পরে বুঝবে। এখন সুখ করুক—বুড়ো বয়েসে ট্যা ট্যা সামলাতে হবে।'

অবিনাশ আর বলেনি, কোনদিনই ট্যা ট্যা সামলাতে হবে না। কী ব্যাপারে গোরাবাবুর কথা বলতে গিয়ে নীলিমাকে এমন নিস্তেজ বিষাক্ত ঠাট্টা করতে দেখেছিল। বলেছিল, 'ঢোড়া সাপ।' লিলি তিনদিনেই খুব মুষড়ে পড়েছিল। স্বামী-স্ত্রী দুজনেই বেশ সুন্দর দেখতে। গোরাবাবু ত রীতিমত। কিন্তু ঘরের মধ্যে আছে যেন রুমমেট।

কাছেই কোথায় একটা কী পুজো ছিল। বিকেলে অবিনাশ আর নীলিমা বেরোবার জন্য তৈরী হলে—গোরাও সঙ্গ নিল। তার নিজের খুব পাহারা-দারী করার ইচ্ছে নেই। ইচ্ছে থাকলেও কতদূর কাজের হবে সন্দেহ। তাছাড়া আজই ছুটি ফুরিয়ে যাবে। কাল সকালের ট্রেনেই ফিরে সেই ড্যামসাইটে গিয়ে মাপঝোক। আর একটা কথাও আছে, লিলিবৌদি কি ভাববেন। সুতরাং গোরাবাবু চলল। অবিনাশ পথে বেরিয়ে টিন খুলে সিগারেট দিল। ভাবটা, তোমার বৌকে নিয়ে গল্প করছি। তুমি ততক্ষণ লক্ষ্মীছেলের মত সিগারেট খাও। 'নীলিমা তাকালও না।

গোরার ইচ্ছে হচ্ছিল খুব কষে একটা ঘুষি দেয় অবিনাশকে। কিংবা মাটিতে পেড়ে ফেলে বুকের ওপর পা রেখে বলবে, 'খুব বাড় বেড়েছিস।' এই কথাগুলো বলার সময় নীলিমা পাশে দাঁড়িয়ে কাঁপবে। বলবে, 'ছেড়ে দাও। বেচারা।' কিন্তু এসব কোনদিন ঘটেনি। হাত তুলতে গেলেই মাসেলগুলো কেমন জমে যায়।

শেষবার যেবার নার্সিং হোমে ছিল, ডাক্তার গোরাকে বলেছিল, লাইট একস্‌সারসাইজ করবেন। গা টিপে টিপে দেখিয়েছিল, কোথায় কোথায় বেশী চর্বি জমে যাচ্ছে। নার্সিং হোমে নীলিমাই এনে তুলেছিল। দুজনকেই পরীক্ষায় দাঁড়াতে হল। কে 'ঢোড়া সাপ' জানতে হবে। ব্যাটারি চার্জ করে নীলিমাকে যখন রবারের পটি দিয়ে হাত পা বেঁধে দিল তার কিছু পরেই নীলিমার সে কি কষ্ট। জায়গায় দাঁড়িয়ে কাঁপছে। গোরার ইচ্ছে হচ্ছিল, নীলিমাকে নামিয়ে এনে বাড়ি নিয়ে যায়। কি হবে পরীক্ষা করে। সে

নীলিমাকে খুব ভালবাসে। 'ঢোড়া সাপ' জেনে কার লাভ হবে। 'ঢোড়াকে' তার খুব কিছু আসেও যায় না। ঘামে যখন নেয়ে উঠল নীলিমা, চোখ একবার যেন জ্বলে উঠল—ডাক্তার হেসে বললেন, 'ও-কে—কনডিশন্‌স্‌ পার-ফেক্ট।' নীলিমা অত ভয়ের মধ্যে মারকারি বালবের দিকে তাকিয়ে ছিল—'প্রেসার কলাম' একটু একটু উঠছে দেখে, সে কি আনন্দ নীলিমার—'আমি ভাল, আমি তেজী, আমি পারি, আমার হয়, হবে'—এমনি সব মনে আসছিল। গোরাকে তখন নকুলদানার ঠোঙার মত লাগছিল। পায়ের দিকটা যেন দুমড়ে দেওয়া যায়। একটা অর্থহীন নিস্তেজ পুরুষ-পরী। পায়ের দিকটা মাছের লেজের মত—বাঁকানো।

পুজোমণ্ডপে যাওয়ার পথে অবিনাশ ক'বার পথের একটা খালি দেশলাইবাক্স পা দিয়ে ফুটবলের মত পেটাল। নীলিমা বারণ করল। অবিনাশ শুনল না। দেশলাই বাক্সটা ড্রেনে পড়ে গেলে ফিরে এল।

মণ্ডপে বসবার চেয়ার পেল তিনজনে। অবিনাশ মাঝে মাঝে গোরার সঙ্গেও কথা বলছিল। পাড়ার একটি খুদে ভলাণ্টিয়ারের বেলুন উড়ে এসে গোরার পায়ের কাছে পড়ল। গোরা ছোট একটা ঢিল তুলে ছুঁড়ে দিল। ফট্‌। ভলাণ্টিয়ারটি কাঁদ কাঁদ। তাকে সামলাতে হল অনেক কষ্টে। গোরা ফিরে এসে চেয়ারে বসতে অবিনাশ একটা সিগারেট দিল, 'নিন্‌ খান।'

ধরাতে, নীলিমা বলল, 'চেষ্টা করে কি আর অবিনাশ চৌধুরী হওয়া যায়!'

স্টেজ থেকে নেমে এসে বাইরে দূরে মাঠের মধ্যে গিয়ে সিগারেট ধরাল অবিনাশ। ক্লাবের সম্পাদকের বার্ষিক রিপোর্ট চলছে মাইকে। কর্মকর্তারা এ্যাপ্রেণ্টিস হোস্টেলে শোবার জায়গা করেছে। খাওয়া দাওয়া এখানেই। ভোরে গাড়িতে পেঁৗছে দেবে। ড্রাইভারকে ডাকতে সে জানাল স্যুটকেশ ঘরে রেখে দিয়ে এসেছে। অবিনাশকে ঘর দেখিয়ে দিল। খোঁজ নিয়ে জানল, আরও যারা বাইরে থেকে এসেছেন তাদের জন্যে পর পর পাশাপাশি ঘর গোছানো হয়েছে। 'কোন অসুবিধা হলেই খবর দেবেন।' অবিনাশ বলে দিল, রাতে খাবে না, কলকাতা থেকে খেয়ে এসেছে। আলোর সুইচটা কোথায় জেনে নিল।

স্খলিত মানুষের কথা রবীন্দ্রনাথ ঋষির ক্ষমাশীলতায় দেখেছেন। জাবালিকে কিন্তু ঋষিরা কোনদিন ক্ষমা করেননি। জাবালির দাহের তেজ ছিল। এখনকার স্খলনের তেজই নেই। অবিনাশ বিছানায় বসে স্যুটকেশ

খুলল। নিপাট ভদ্রলোকের মত বোতলটা শুয়েছিল। বিদেশী বিমান কোম্পানীর নতুন রুট উদ্বোধনের দিন উপহার পেয়েছিল কদিন আগে। অনেকটা উপুড় করে খেল। মাইকটা বড় জ্বালাচ্ছে। নিশ্চয়ই নীলিমার গলা। পাশে বসে শুনতে ভাল লাগে। অডিটোরিয়ামে বসে দুএকবার শুনেছে। নীলিমা চোখ বুজে জিভ বের করে হা করে গান গায়। তন্ময় তদ্গত ভঙ্গী আরও দূর থেকে হয়ত ভাল—কিন্তু কাছে থেকে জিভ, হা, দাঁতের মাড়ি এসব ভেতরের যন্ত্রপাতি—বোরিং।

ঘুম ভাঙলো ধাক্কায়। তরল ঝিম ঝিম ভাবে ডুবে ঘুমিয়ে পড়েছিল অবিনাশ। নীলিমা বলল, 'না খেয়ে ঘুমোলে তোমার বৌ কিন্তু আমার ওপর রাগ করবে। কি সুন্দর কালিয়া করেছিল।' অবিনাশ কথা না বলে টেনে নিল। নীলিমা খানিক ঝুঁকে পড়ল। অবিনাশ এই ঘুমে এমন একটা কাজ করতে চায় যার জন্যে পরে বলতে পারবে, 'আমি ত ঘুমে ছিলাম—কি হয়েছিল মনে নেই।' হেঁচড়ে বিছানায় ফেলে দিল নীলিমাকে। পড়তে পড়তে নীলিমা উঠে বসল, 'কি হচ্ছে?' দূরে জেনারেটর স্টেশন থেকে কড়া আলো ছড়িয়ে আছে চারদিকে। ঘরেও কিছুটা এসেছে। খোঁপা খোলা, বুকের কাপড়, কোমরে ব্লাউজের পটি, বডিসের ওপর ওথলানো চর্বি ভর্তি অনেকখানি বুক —নীলিমা উঠে দাঁড়াল। 'না অবিনাশ।'

উত্তেজনায় হাত পা কাঁপছিল। বিছানায় উঠে বসেছে অবিনাশ। পা ঝুলছে। মাটিতে রাখতে পারলে ভাল হত। নীলিমা যাবার জন্যে কিছুটা দূরে দাঁড়িয়ে নিজেকে গোছাচ্ছিল। এই দূরত্বটুকু মুহূর্তে অবিনাশের চোখ খুলে দিল। সত্যি এসব কি হচ্ছিল। তার বয়েস কুড়ি না। আর বছর কুড়ি সে বাঁচবে। পঞ্চাশে ধর্মসংকীর্তনও করতে পারে। এখন এই রাতে কলকাতা, অফিস, লিলি, নীলিমার গোরাবাবু থেকে এতদূরে এসে নিজের জড়াজড়ি করার ইচ্ছেটা সম্পূর্ণ উলঙ্গ অবস্থায় তার নিজের কাছেই ধরা পড়েছে।

নীলিমা যাবার সময় একগ্লাস জল দিয়ে গেল। 'চোখে মুখে দিয়ে শুয়ে পড়। কাল খুব ভোরে উঠতে হবে।'

অবিনাশ কথা না বলে সিগারেট ধরাল। বিয়ে না করলে অন্য মেয়েলোক জড়ান অনুচিত। বিধিবহির্ভূত। আমি যদি জড়াইও তবু জানি—আমি বিপদে পড়লে লিলির কাছেই যাব। লিলি এত তাড়াতাড়ি ক্ষমা করে। অথচ নীলিমাকেও মন্দ লাগে না। কিন্তু এসব লাগা ত উচিত না। সিগারেটটা টিপে বাইরে ছুঁড়ে দিল অবিনাশ।

॥ আট ॥

প্রমথর একটা গল্প বেরিয়েছে। নিজেই পড়ে দেখল অনেক খুঁত আছে। যা বলতে চায়, যত গভীরে যাওয়ার ইচ্ছে তার কাছাকাছিও যেতে পারেনি। অনেকেই খারাপ বলল। কিছু হয়নি। দু'একজন ভাল বলল। এই কলকাতায় অনেক লোক আছে। অনেক মেয়ে আছে। অনেক ছেলে আছে। প্রমথ ভালভাবে জানে সে কাউকে ভালবাসে না। বাসতেও চায় না। কিংবা এও হতে পারে, কোন মেয়েকে ভালবাসার ক্ষমতা তার নেই। গল্পে এসব কথা আসেনি। সবদিকে সে ব্যর্থ। সব জায়গাতেই সেই 'কিছু হয়নি।'

বাড়িতে আসতে বৌদি বলল, 'সুধা এসেছিল। কি দরকার—তোকে একবার দেখা করতে বলেছে।' মা বাবা কিছু বিরক্ত। চব্বিশ পঁচিশ বছর বয়েসের একটা মেয়ে অবিবাহিত একটা ছেলের খোঁজে এসে এতক্ষণ কাটিয়ে গেল। কিছুতেই যায় না। তাদের এসব ভাল লাগে না।

কাল পল্টুর একটা মানি-অর্ডার এসেছে। রেবার বিয়েতে তিনমাসি পাঁচশ টাকা দিয়েছিল। তার ক্যানসার হয়েছে ভয় করা হচ্ছে। অবিলম্বে টাকাটা দরকার। বড়দা এখানে নেই। মেজদা অফিস করে সময় পায় না। সময় পেলেও টাকা দেবার উপায় নেই। পল্টুর টাকায় সংসার চলে আর এসব শোধ দেওয়ার মত বাকি কিছু থাকবারও কথা না।

বুধবার একটা ইণ্টারভিউ লেটার এল। বৃহস্পতিবার দেখা করতে হবে। ইনফরমেশন অফিসারের চাকরী। সব নিয়ে শ' আড়াই। হাওড়া এলাকায় অফিস। ইণ্টারভিউ ভালই হল। কথাবার্তায় মনে হল হয়ে যেতে পারে। ফিরবার পথে মন ভাল লাগছিল। এতদূর যখন এলাম—নীতিশের বৌর খবর নিয়ে যাই। বাপের বাড়িতেই আছে। হয়ত বাচ্চা হয়ে গেছে এতদিনে। দুপুর দুটোয় বাড়ি খালিই থাকে। নীতিশের বৌ বলল, 'আমার শরীরটা খারাপ যাচ্ছে। আপনার বন্ধুর সঙ্গে দেখা হলে একবার আসতে বলবেন ত।' এক ভদ্রলোক বারন্দায় দাঁড়িয়ে ঘসে ঘসে পা ধুচ্ছিল। তাকে দেখিয়ে বলল, 'বড়দা, কথা বলুন। আমি বসতে পারছি না।'

প্রমথর ইচ্ছে ছিল নীতিশের শালীর সঙ্গে দেখা হয়। মেয়েটি কেমন, দিনের আলোয় দেখবে। আসলে তার যে বিয়ের ইচ্ছে আছে তা না। এই বয়েসে লোকে বিয়ে করে, বিয়ের কথা হয়, আলোচনা চলে—বেশ একটু গুরুত্বের সঙ্গে 'প্রমথ' নামটা উচ্চারিত হবে এইটুকুই আনন্দ। তাছাড়া, মেয়ে তো। কাছাকাছি থাকতে ভাল লাগে। তার চেয়ে বেশী কিছু না।

মেয়েটি সামনে এল না। বদলে এক প্লেট ভর্তি মিষ্টি। খাটের ওপর মেয়ের বড়দা, বারান্দায় মা, আসামী মিষ্টি খাচ্ছে। প্রমথর ইনসাল্টিং লাগল। কোন মানে হয় এভাবে খাওয়ার?

পথে বেরিয়েও মনে হল, এসবের মানে হয় না। চাকরীর স্থিরতা নেই। উটকো গিয়ে হাজির হওয়া, আর মেয়েও বেরিয়ে এসে গান গাইবে—চায়ের পেয়ালা হাতে ধরিয়ে দেবে। হয় না, হয় না। এই বিশ্রী নেশা প্রমথর ছাড়তে হবে। নেশা ত ভাল জিনিস। নেশা না বলে 'হ্যাংলা ইচ্ছে' নাম দেওয়াই ভাল।

সুধা অফিসেই ছিল। বলল, 'বিজ্ঞাপন দেখেছ? দুর্গাপুরে অপারেটর চায়। আই-এস-সি আর তিন বছরের ফার্নেস এক্সপিরিয়েন্স। দু বছর ট্রেনিং তারপর আড়াইশ-পাঁচশ স্কেলে আরম্ভ। উন্নতি আছে। এ্যাপ্লাই কর। আমি ফর্ম সব আনিয়েছি।'

'টাকা লাগবে। করেও হবে না ত কিছু।'

'দেখই না করে।'

'খালি চাকরীর কথা। থাম ত।'

ক্যান্টিনে অনেকটা সময় গেল। গঙ্গার দিকে রোদ্দুর বেশী। রেড রোডের পাশে গাছতলায় খানিকক্ষণ কাটালো দুজনে। সুধা আজকাল বেশী কথা বলে না। মাঝে মাঝে এক আধটা কথা বলে। তারপরই চুপ করে যায়।

'বুঝলে, গানের ইস্কুল ছেড়েছি। হপ্তায় একটা লেসেন—তাও আমার হাতে ওঠে না। গীটারটা বেচে দেব।'

'শিখলে পারতে।' অনেকক্ষণ পর বলল, 'আমি ত গান জানলে কারও সঙ্গে মিশতাম না।'

'কি করতে?'

'একা একা সন্ধ্যে হলে ছাদে বসে গাইতাম। আকাশের দিকে চেয়ে।'

সুধা হাসল। বলল, 'পারতে না।'

'কেন?'

'তাই কেউ পারে নাকি?'

প্রমথ পারে। এই এখানে, কলকাতায়। কিংবা যেখানে লোকজন আত্মীয়স্বজন থাকে সেখানে থাকতে প্রমথর খুব ভাল লাগে না। বিশ্বাস যোগ্য একটা আশ্রয়ও এখানে নেই। খেলাধুলো জানে না। জানলে মন দিয়ে খেলতে পারত।

বাদাম খেল, পরে দুকাপ চা, সন্ধ্যে হতে ঘুগনি—শেষে হেঁটে গিয়ে লেমনেড। হাওয়া দিচ্ছিল, পথে আলো। সুধা বলল, 'ঘোড়ার গাড়ি চড়বে?'

'চল।'

খানিকদূর যেতে পর্দা ফেলে দিল প্রমথ। সুধাকে টানতেই গায়ে হেলান দিয়ে বসল। এত ঘাম হয়েছে—তারপর বাদাম খেয়েছে। প্রমথর ইচ্ছে হচ্ছিল বুকের সঙ্গে বুক লাগিয়ে আটকে ধরে সুধাকে। জিজ্ঞাসা করে, কেমন লাগে--কিন্তু এসব কিছু করল না। দম বন্ধ গুমোট ঢাকনা ওপরে তুলে দিল। রাণী ভিক্টোরিযার স্মৃতিসৌধে লোকজন বেড়াতে এসেছে। পারিবারিক টিফিন ক্যারিয়ার ঘিরে হিন্দুস্থানী পরিবার--জলের কুঁজো।

'ভাড়া মিটিয়ে দাও। এই গাড়ি রোখ্‌খো।'

হাঁটতে হাঁটতে রেসকোর্স। সাদা বার দিয়ে ঘেরা। সুধার হাত ধরে প্রমথ বুনো ঘাসের চাপড়া পেরিয়ে ভেতরে গিয়ে বসল। এদিকটায় পুলিশ আসে না। সমাজবিরোধী কাজের জন্যে তাকে নিশ্চয় পুলিশ ধরবে না। পথে ঘাটে সমাজ রাখবার জন্যে আইন আছে। প্রমথ জানে সে নিজে একজন দাগী সমাজবিরোধী। সে একা না। এই সমাজে যারা বাস করে তারা সবাই।

প্রমথ গুণ্ডামি করে নি, পকেট কাটে নি কিন্তু তাব চেয়েও বড় অপরাধে অপরাধী। খুব সাবধানে সে মনের মধ্যে একটা সাপ পোষে। সাপটা অন্য কাউকে কামড়ায় না। নিজেকে অষ্টপ্রহব কামড়াচ্ছে। নীল আরও নীল করে দিচ্ছে।

'এই জায়গাটায় ঘোড়া দৌড়য়। তাই না?'

'না আর একটু ওপাশে। এখান দিয়ে লোক দৌড়োয়। ঘোড়ার পিছু পিছু। যারা পাঁচ আনা দশ আনা খেলে।'

সুধা বলে, 'তুমি কোনদিন খেলনি?'

'আমি ওসব ফাঁকিবাজিতে নেই।'

'ভাল।' খানিক থামল সুধা। তারপব বলল, 'আজকাল মদ খাওনা?'

'এ কথার মানে?'

'খেতে তো। অবিশ্যি নেশা কোনদিনই ছিল না তোমার—'

প্রমথ সুধার চোখের দিকে সোজা তাকাল 'তোমাব বাবা খায়—?'

'হু। শনি, রবিবার তো খাবেই।' বলতে বলতে সুধা যেন গানে চলে

গেল। বলল, 'কেন যে খায় বুঝি না। আমরা কি খাই বল? বাড়িতে আজকাল ভাল খাবার থাকেই না!'

প্রমথ একটা কড়া কথা বলবে ভেবেছিল। নিজেকে ভেতরে টেনে নিয়ে বলল, 'না সুধা আমি খাই না। ফাঁকি বাজি। শুধু পেট ব্যথা করে।'

তারপর হঠাৎ কি ইচ্ছে হল। সুধাকে বলল, 'মাথায় ঘোমটা তুলে দাও ত।'

'কেন?'

'দাও না। তোমার গালের হাড় ভাল না। বৌ বৌ লাগে। কাপড়ে ঢাকা পড়লে মুখখানা গোলাপের মত লাগবে।'

সুধা কিন্তু কিন্তু করে মুখ ঢেকে দিয়ে ঘোমটা দিল। প্রমথ হামাগুড়ি দিয়ে পর পর তিন চারটে চুমু খেল। খেয়ে দেখল তেমন ত কিছু লাগছে না। আবার কেমন দীর্ঘ একটানা অবসাদে ডুবে গেল। কি দরকার ছিল চুমু খাওয়ার!

সুধা বলল, 'জান গরমে সাপ বেরোয়। গর্তে থাকতে পারে না। এতবড় মাঠ একটাও কি নেই?'

প্রমথ বলল, 'অনেক আছে। আমাদের কামড়াবে না।'

'তাহলেও উঠে পড়াই ভাল।'

'আর একটু বোস না। তোমাকে একটা কথা বলব।'

'না চল, বাইরে গিয়ে বলবে।'

'এখানেই বলব।'

সুধা চুপ করে বসে থাকল।

প্রমথ আকাশে একটা তারা বেছে নিয়ে সেটাকে মনে মনে ঠিক করে নিল 'ধ্রুব' নিশ্চয়। আরও ভেবে দেখল জীবনে সৎ হওয়া দরকার। কতবার ভগবান বলে একটা জিনিসের চিন্তা করেছে। খুব একটা কোন চেহারা আসে নি। আগে ভগবানকে বলত, এটা যেন হয়, ওটা যেন ফলে। এখন ভীষণ ভয়—যা আছি তাও যদি না থাকি। আমাকে সৎ কর, সৎ কর। কিন্তু একটা বিশ্বাস প্রমথর ইদানীং তীব্র হয়ে উঠেছে। যত বয়েস বাড়ে মানুষের ততই নিজের চেষ্টা ছাড়াই বেশির ভাগ মানুষ দিন-কে-দিন পাপীর থেকে সাধু, সাধুর থেকে আরও সাধু—আরও সাধু হয়। যখন সে মরে তখন সে একখানি পুরো সাধু।

'কি, বসিয়ে রাখবে. না কিছু বলবে?'

'আমি তোমাকে ভালবাসি না সুধা।'

চোখ ছোট হয়ে গেল সুধার। প্রথমে কিছু বলতে পারল না। শেষে অনেক কষ্টে মাথা নামিয়ে বলল, 'তুমি সত্যি কথা বলছ?'

'হ্যাঁ। আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি এইযে যেসব করি—এগুলো আমার অভ্যেস।' কথাটা বলে প্রমথ বুঝল, হ্যাঁ সে সত্যি কথা বলেছে। প্রায় সত্যি কথা। প্রায় কেননা ব্যাপারটা আর একটু তলিয়ে দেখার মত। মানে, আমি প্রমথ দত্ত মাঝে মাঝে নিজেকে বোঝাই যে আমার ভালবাসা উচিত। সামনে ভালবাসার আদর্শটাকে রেখে সেটার দিকে তাকিয়ে ভালবাসতে যাই। লোকে যা যা করে আমিও তাই তাই করি। খানিকদূর এগিয়ে মনে হয়, যাঃ! সিনেমা হয়ে যাচ্ছে!

সুধা হু হু করে কেঁদে উঠলো. 'প্রমথ আমি বাঁচব না। প্রমথ আমি বাঁচব না—প্রমথ—'

প্রমথ তাকাতে পারল না মুখের দিকে। জমানো থুথুর রেখা হা-করা দুই দাঁতের পাটিতে লেগে আছে. নাকের বাঁশী ফুলছে, নামছে—চোখ একদম ভিজে। খুব জোরে সুন্দর একটা বুনো পশু লাঠির বাড়ি দিয়ে মাটিতে ফেলে দেওয়া হয়েছে। মাটিতে গড়াচ্ছে। বুঝতে পেরেছে আর বাঁচবে না। কেন মরতে লোকালয়ে এল'

এতটা হবে বুঝতে পারেনি। নিজের বানানো ধ্রুব তারাটা খুঁজে না পেয়ে প্রমথ বলল, 'এই দেখ আমি মিথ্যে কথা বলেছি। বিশ্বাস করলে? একটুখানি পরীক্ষা করে দেখলাম মাত্র। আমি ত তুমি না হলে বাঁচব না।'

সুধা অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তার ঠিক বিশ্বাস হয়নি এখনও। কোন্ কথাটা সত্যি। কোন্ কথাটা মিথ্যে তা সুধাই এখনও ঠিক ধরতে পারেনি। তারও দুএকদিন মনে হয়েছে। প্রমথ এইযে তার সংগে যা সব করে তা সত্যি. না কেবল করতে হয় বলেই করে।

প্রায় ঘণ্টাখানেক গেল। প্রমথ বলল, 'চল পেঁছে দিয়ে আসি।'

পথে রিক্সায় কথা হল। প্রমথকে দিয়ে দিব্যি করাল। প্রমথ দেখল, সুধা যদি খুব ব্যথা পায় বা কষ্ট পায় তাহলে সে সত্যি কথা বলতে পারে না। তারও দুঃখ দেখে কষ্ট হয়।

আবার এও মনে হয়েছে—সুধার আর বর জুটবে না। অন্তত দেখে বিরক্তি আসে না এমন বর জুটবে না। সামনে অনেক বছর—অফিসের সিঁড়ি-গুলো এগারোটার সময় অন্তহীন মনে হয়। সেইজন্যে একবার যে আপনি-ভেসে-আসা ভেলাটা পাওয়া গেছে—সেই প্রমথকে. সুধা কিছুতেই ছাড়তে পারবে না। একটু যা গাই গুই করে তা বিয়ের পরে সেরে যাবে। আর চাকরী ত পাচ্ছেই।

প্রমথ তার সত্যি কথাটা মিথ্যে প্রমাণ করার জন্যে বলল, 'চল আজ তোমার বাবাকে পষ্টাপষ্টি বলব। ভবিষ্যতে যা একদিন বলতেই হবে তা না হয় আগেই বলে আসি।'

সুধা হাত দুটো জড়িয়ে ধরল। 'না লক্ষ্মীটি, আজ থাক। আর একদিন বোলো।' এই হাত জড়ানো প্রমথর খুব খারাপ লাগল। কিছু বলল না। সুধা বলল, 'এখানে নেমে যাও লক্ষ্মীটি।'

কী লক্ষ্মীটি লক্ষ্মীটি করছে। কিন্তু কিছু বলাও যাবে না। ধাক্কা সহ্য করার জোরই নেই।

প্রমথকে নামিয়ে বাড়ির কাছাকাছি এসে রিক্সা ছেড়ে দিল। আজ বড়দিকে বলতে হবে সব। বড়দি বলেছিল, 'ওদের জাগিয়ে রাখতে হয়—নাহলে ঘুমিয়ে পড়ে।' প্রমথকে ঘুমোতে দেবে না সুধা। কিন্তু বড়দি যে সুনীলকে একদম ঘুমোতে দিচ্ছে না। মাঝখান দিয়ে বড়দি না অকূলে পড়ে। মাস চার-পাঁচ হল প্লাস্টার খোলা হয়েছে। অফিসে যাচ্ছে—টিউটোরিয়ালে পড়ছে—তার পরেও সুনীলকে নিয়ে টইটই। মঙ্গলবার ত পা ফুলে ঢোল। তিনদিন ক্যাজুয়াল লিভ গেল।

বাড়ি ঢুকবার মুখে ভিড়। বাবলুর তিন-চার বন্ধু বাইরে দাঁড়ানো। পাড়ার আরও কটি ছেলে আছে। এক একবার হুংকার দিচ্ছে দলটা আর সুধাদের উঠোনের দিকে তাকিয়ে বলছে, 'বেরিয়ে আয় না বুঝি।' সুধাকে দেখে কিছু থামল, কিছু সরে গেল।

উঠোনের কোণেই মা শাড়িতে মুখ চেপে বসে আছে। জিজ্ঞাসা করে কোন উত্তর পেল না। সামনের ঘরে অজয় বসে। জামাটা বুকের কাছে ছিঁড়ে গেছে। চুপচাপ জ্যামিতি বইখানা খুলে বসে আছে। সুধাকে দেখে জড়সড় হয়ে গেল। এখানে জিজ্ঞাসা করে সুবিধা হবে না। ভাঁড়ার ঘরের বারান্দায় ঢুকেই আশ্চর্য হল।

বড়দি চেয়ারে বসে চাকুতে আলু কুটছে। বাবলু মাথা নীচু করে জল-খাবারের বাটিটা নিয়ে ঘরে বসল। আর অঞ্জু ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।

বড়দির দিকে তাকাতে বলল, 'অঞ্জু অজয় এক্জিবিশন দেখে ফিরছিল, কোত্থেকে নৃপেন এসে এক চড় দিয়েছে অজয়ের গালে—তারপর জামা ছিঁড়ে—।' বড়দি দম নিয়ে বলল, 'পুলিশ ভ্যান যাচ্ছিল। নৃপেনকে তুলে নিয়ে গেছে মারতে মারতে।'

সুধা স্তব্ধ হয়ে গেল। নৃপেন ত চিঠি ছুঁড়ত অঞ্জুর নামে। ওর যে এত সাহস তা ত জানা ছিল না।

বড়দি বলল, 'বাইরের ওরা বলছে অজয় পুলিশে খবর দিয়ে রেখেছিল।'

সুধা এমনিতে খুশি মনেই ছিল। ভাবল ব্যাপারটা মিটে যাবে। বলল, 'বাবা কোথায়?'

'হুগলিতে পার্টির সঙ্গে গেছে।' বড়দি কি ভেবে বলল, 'অজয় ত কেঁচো হয়ে বসে আছে।'

এতক্ষণ বাবলু একটা কথাও বলেনি। রুটি খেয়ে জল খেল। বলল, 'থাকবে না ত কি। আমি নিজে দেখেছি দুপুরের দিকে থানায় বসে গল্প করে। ওই ধরিয়ে দিয়েছে। বেরোক্ না।'

'তুই থাম।' সুধা ভেবে দেখল এখন অজয়কে কি করে বের করে দেওয়া যায়। অন্তত ট্রাম লাইন অব্দি পৌঁছে দিতে পারলে মার খাওয়ার কোন ভয় নেই।

'মেজদি তুই জানিস না। নৃপেন রোজ ফলো করে। ছোড়দি আর অজয় শালা যখন লাইব্রেরিতে যায়—দেখি নৃপেনও দূরে দূরে যাচ্ছে।'

সুধা কিছু অবাক হল। বলল, 'তুই এতসব জানলি কি করে?'

বাবলু বলল, 'আমি জানি যে। দেখেছি। আর—'

'আর কি—'

বাবলু মাথা নামাল।

'বল্। ভাল হবে না বলছি। বাবা এলে সব বলে কিন্তু বলাব।'

'ভয় করি নাকি। নৃপেন দোকান থেকে আমায় একদিন সিনেমায় নিয়ে গেছে। সব বলেছে। আমি সব জানি। ছোড়দিটা রাক্ষুসী। তুমি পেত্নী। আর এই—বড়দিটা—বড়দিটাও খারাপ হয়ে যাচ্ছে। সব জানি।'

রেখার আলুকোটা হয়ে গিয়েছিল। চাকুটা বন্ধ করে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর বড় দুটো আলু তুলে বাবলুকে লক্ষ্য করে ছুঁড়ল, 'এই জন্যে তোমাকে পড়ানো হচ্ছে। বড়দের মুখের ওপর কথা। যত খারাপ ছেলের সঙ্গে মেশা?'

বাবলু ক্ষেপে গেল আরও। বলল, 'জানি জানি সব। প্রমথদা আগে অত আসত কেন? মেজদি মোটা সোটা ছিল। এখন আসে ছোড়দির জন্য। রাক্ষুসীটার জন্য। সব শালাকে আমি চিনি। চান্স পেলে সব শালার মাথা ফাটাব।'

সুধা একটা চড় দিল। 'অসভ্য, বাঁদর—অজয় সামনের ঘরে বসে—শুনতে পাবে।'

আজ সুধাকে কিছুই স্পর্শ করতে পারবে না। যেখান থেকে যা খুশী আসুক--যে কোন দুঃসংবাদ সুধা পাশ ফিরে গায়ে মেখে নেবে। আজ প্রমথ আগের মত হয়ে গেছে।

নীহারিকা ঘরে ঢুকে বলল, 'পাক না শুনতে। সব ভাল ভাল কাজ করে আসবে—নাম ডাক হবে না!' সুধা শক্ত হাতে মার কাঁধ ধরল। বাবলুকে সাপোর্ট করে করেই মা ওকে এতদূর খারাপ করেছে। এই মেয়েলোকটাকে সুধা কিছুতেই সহ্য করতে পারে না। বলল, 'যাও বলছি, ও ঘরে যাও।' প্রায় ধাক্কা দিয়ে পাঠিয়ে দিল। সুধা রেগে গেলে নীহারিকা মুখ খুলতে পারে না।

বাবলু পা ফাঁক করে মেঝেতে দাঁড়িয়ে ছিল। রাগে গুলি পাকিয়ে গেছে। দাঁতের গোড়া রি রি করছে। তিনটে দিদিকেই আজ চড় কষাতে ইচ্ছে হচ্ছে। ঠাস ঠাস করে মারবে। সবাই খারাপ হয়ে যাচ্ছে। মাকে সরিয়ে দিতে বাবলু ক্ষেপে গেল, বলল, 'একশোবার বলব। রোজ সকালে উঠে দেখি—রাস্তার উপর চক দিয়ে লেখা—অজয়+অঞ্জু—এসব কার মুছতে হয় ঘুম থেকে উঠে? আমি মুছে দিই।' একটু থামল, তারপর গলা ছেড়ে কেঁদে (কান্না এলে বাবলু থামতে পারে না) বলল, 'সব খারাপ হয়ে যাচ্ছিস তোরা —আমি কিন্তু এক শালাকেও পেলে রক্ত-গঙ্গা করব মেজদি।' সুধা এগিয়ে এসে পিঠে হাত রাখল, বলল, 'যা ছাদে গিয়ে ঘুরে আয়।'

বাবলুর তখনও কান্না থামেনি, 'আমাকে সবাই যা-তা বলে—'

বাবলুকে ছাদে পাঠিয়ে অঞ্জুকে বলল, 'তুই গিয়ে একটা দুটো কথা বল, আমি চা করে দিই।' অঞ্জু চোখ বড় করে তাকাল, তারপর বলল, 'কক্ষনো না।'

তখন কি করতে হবে, সুধা একাই ঠিক করল। আজ কেউ তার কথা শুনছে না। অঞ্জুও বেয়াড়ার মত করছে। জানে উঠোনে বেরোলে বারান্দায় বারান্দায় ছোটদিদু, মানুপিসি, চিলেকোঠার কাকী সবাইকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখবে।

অজয়কে বলল, 'চলুন আমার সঙ্গে।'

'যাব?'

সুধা হেসে ফেলল, 'এই সাহস নিয়ে প্রেম করেন?'

অজয় চুপ করে আছে। দেখে সুধার আরও রাগ হল।

'হয়েছে, চলুন ত। আমি সঙ্গে আছি—কেউ কিছু বলবে না।'

বেরোতেই হো হো করে হেসে উঠল সবাই। সুধা বলল, 'পথ ছেড়ে দে—বাঁদর কোথাকার। সবকটাকে শায়েস্তা করাব। দাঁড়া—না।'

একজন কে বলল, 'তুমি সরে যাও সুধাদি। ও শালাকে একবার দেখে নি। পুলিশের ফ্রেন্ড!'

'যা বলছি।' প্রথমে কেউ সরতেই চায় না। সুধা অজয়কে একরকম ঢাকা দিয়েই এগোল। কেউ কেউ মোড় অবধি এল। অজয় বাসে উঠতে দু'একজন বাসের গায়ে দমাদম চড় দিল। বাস ছেড়ে দিতে চেঁচিয়ে উঠল, 'দালাল! দালাল, পুলিশের দালাল!'

ফেরার পথে সুধার খুব গর্ব হল। বাবলুর জন্য তার খুব গর্ব হল। বাবলু আমাদের খুব ভালবাসে। আমরা খারাপ হয়ে যাচ্ছি এইজন্য বাবলু কেঁদে ফেলেছে। ছোটমানুষ--বোঝে না কিছু। বাড়ি ফিরে ছাদে গেল। কার্নিসের পাশে হাঁটু মুড়ে বসেছিল। বলল, 'নেমে আয় বলছি, পড়ে যাবি।'

অনেক কথা হল। বাবলু বলল, পাটিগণিত তার মাথায় ঢোকে না তাই জিরো পায় অঙ্কে। সুধা বলল, একজন ভাল মাষ্টার রেখে দেবে। বলল, 'ব্যায়াম করিস না কেন আজকাল?'

'ভালই লাগে না।'

'না না করবি।' সুধা জানে, এখন উঠতি বয়েস—পরিশ্রমে থাকলে আজে-বাজে জিনিস মাথায় ঢোকার পথ পাবে না।

'মেজদি, কাল সকালে মাংস আনাবি? অনেকদিন মাংসু খাই না।'

'আনিস। দেখে শুনে আনবি কিন্তু। দেড় সের।'

রাতে শুয়ে বড়দির পা টিপে দিতে হল। পা ফোলাটা কমছে না। একটু পাশ ফিরে শুয়েছিল। কান্নায় ঘুম ভেঙে গেল। অঞ্জুটা ফোঁস ফোঁস করছে। ঠেলা দিতেই হাউমাউ করে উঠল, 'মেজদি ভাই খুব মেরেছে রে—মাথায়।'

'কাকে রে? আমি তো পৌঁছে দিয়ে এলাম।'

'না, পুলিশের গাড়িতে তোলার সময় বাধা দিচ্ছিল। ধা করে মাথায় মেরেছে—উঃ! মেজদি আমি পারছি না—'

সুধা প্রথমে গম্ভীর হয়ে গেল - পরে অবাক হল। এই না তুই নৃপেনকে রিজেক্ট করেছিলি। মুহূর্তের মধ্যে পৃথিবীটা দুলে থেমে গেল সুধার

চোখের সামনে। 'আমি বাঁচব না প্রমথ, আমি বাঁচব না প্রমথ, প্রমথ—'। মুখে বলল, 'নৃপেনের জন্যে কষ্ট হচ্ছে তোর?'

কোন কথা বলল না অঞ্জু। সুধা বলল, 'অজয় যে রোজ আসে?'

অঞ্জু যেন ফণা তুলেই ছিল। বলল, 'রাস্কেলটা রোজ থানায় যায়। বাবলু ঠিক দেখেছে।'

সুধা হেসে ফেলল। 'তাতে তোর কি?'

'তুমি বুঝবে না মেজদি।'

'নে ঘুমো, বুঝেছি। কাল সকালে উঠে দেখা যাবে।'

ঘুমোলো সবাই। শুধু সুধার ঘুম এল না। দুবার জল খেল। চোখের ওপর হাত চেপে ঘুম আনার চেষ্টা করল। হল না। শেষে জানলায় গিয়ে বসল। মাঠের দিকে পাল্লা খুলে দিয়ে পা মেলে দিল। আজও আকাশে একটা চাঁদ আছে—মাঠের সেই গাছটাও জায়গা বদলায় নি। শুধু জ্যোৎস্নাটা খানিক ঘসা ঘসা লাগছে—বাবার পুরনো ব্লেডের মত।

প্রমথ আজ বাবাকে বলতে চাইছিল। আচ্ছা প্রমথ তার বর। বাবলু তার ভাই। বিয়ের আগে নিশ্চয় একটা চাকরী পাবে প্রমথ। তাহলে সুধা চাকরী ছেড়ে দিয়ে বিয়ের আগে কদিন শুধু ঘুমোবে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে ফুলে যাবে। আচ্ছা বাবলু এসব কথা কোথায় পায়—'প্রমথদা আগে অত আসত কেন। মেজদি মোটা-সোটা ছিল। এখন আসে ছোড়দির জন্য। রাক্ষুসীটার জন্য।' এসব নিশ্চয় নৃপেনের শেখানো। আচ্ছা নৃপেনের জন্যে অঞ্জুর একি কান্না। 'আমি পারছি না মেজদি ভাই—' সুধা কেঁপে উঠল। 'আমি বাঁচব না প্রমথ, আমি বাঁচব না প্রমথ, প্রমথ—'। 'আমি তোমাকে ভালবাসি না সুধা। হ্যাঁ। আমি আমাকে জিজ্ঞাসা করেছি। আমি এইযে—যেসব করি, এগুলো আমার অভ্যেস।'

'না প্রমথ। এতদিন পরে এসব বললে চলবে কেন। আমি কোথায় দাঁড়াব।' সুধা ভাবতে গেল কোন কথাটা সত্যি প্রমথর। আগের? না শেষে যে বলল—'চল আজ তোমার বাবাকে পষ্টাপষ্টি বলব।'

উঃ! এযে কি গোলক ধাঁধাঁয় পড়া গেল। চোখে জল দিয়ে মশারিতে ঢুকল। বড়দি অঘোরে ঘুমোচ্ছে।

॥ নয় ॥

পাড়ায় পাড়ায় রবীন্দ্রজয়ন্তী। পল্টু ছুটি পায়নি। অন্যবার রেবার বর রেবা ওরাও আসে। ক'দিন ধরে বাড়িতে বাজার হচ্ছে না। বাড়িতে ফিরে দেখল বাবা আফিস থেকে এসে চা খাচ্ছে। তাও গ্লাসে করে। কাপে খেলে ভাল লাগে। কিন্তু গ্লাসেই খাবে।

মা বলল, 'যে কোন একটা কাজ নে না। মানুষ একবারে কি লাট হয়।'

কোন উত্তর দিল না প্রমথ। এবারে একগাদা উপদেশ। সবচেয়ে খারাপ লাগে বাবার চাকরী। তার একটা কিছু হয়ে গেলে বাবার চাকরী ছাড়াতে হবে। তবে সন্দেহ, ছাড়বে কি-না। সেইযে বাজার করা অভ্যেস—নিজের কাছে কিছু টাকা রাখার অভ্যেস—বাবা কিছুতেই চাকরী ছাড়তে পারবে না। পেনশন যা পেত—তার অর্ধেক ক'মুট করে রেবার বিয়ের সময় দিয়েছে।

নিজে চাকরী করে না। করলে বাড়ির একটা সিস্টেম পাল্টাবার চেষ্টা করে দেখত। মাসের গোড়ায় যে টাকাটা আসে তা যদি কিছু শক্ত হাতে নিয়ম মত খরচ হয় তবে মাসের শেষ দিকে এতটা অসুবিধায় পড়তে হয় না। বাবা যা টাকা পাবে তার এক পয়সাও বাড়িতে দেবে না। অবিশ্যি যা পাবে তাই—আর আরও কিছু বাকি রেখে সারা মাসের বাজার করে বাবা। মেজদা—বাড়ি ভাড়া, বড়দা—ইলেকট্রিক বিল, মান্থলি, ধোপা, মেথর ইত্যাদি দেখে। আর পল্টুর টাকায়—রেশন, মুদি ইত্যাদি চলে।

মুস্কিল হয়েছে সবার টাকা একজায়গায় জমা পড়ে যদি একটা বুদ্ধিতে খরচ হত—তাহলে কিছু সুরাহা হত। কিন্তু প্রমথ বলবে কি। তার কথার দাম কি। সে কি কিছু বাড়িতে দেয়? আর দিলেও কেউ বোধহয় কথা শুনত না। বলত—এইসবে কিছু করছিস। এখনই এত টাইট।

ভাগ্যিস তনুদা মারা গেছে। থাকলে এতদিনে বিয়ে করত। 'ভাগ্যিস' বলা উচিত না ঠিক। তনুদা বিয়ে করলে কিন্তু একটা অসুবিধা দেখা দিত। শুতো কোথায়। তনুদারও বদলি হয়ে অন্য কোথাও যেতে হত। প্রমথও হয়ত একদিন বিয়ে করবে। কিন্তু আর যাই হোক্ সুধাকে সে কিছুতেই বিয়ে করবে না। সুধাকে সেদিন রেসকোর্সে বসে সত্যি কথাটাই বলেছে

প্রমথ। কিন্তু ওর সামনে যখন সত্যি কথা বলা যাবে না—তখন সামনাসামনি না যাওয়াই ভাল।

পরদিন দুপুরে কষে ঘুম দিল। ঘুমের পর চোখে খুব আরাম হয়। বিকেলে ঝম ঝম বৃষ্টি হল। সন্ধ্যেবেলা চাপচুপ ভেজা এক পিওন একখানা চিঠি দিয়ে গেল। বাড়িতে কেউ নেই।

পল্টুর চিঠি।

ইরিগেশন বাংলো,
রামপুরহাট।

নদা,

তোমাকে অনেকদিন কোন চিঠি লিখি না। এখন যেখানে বসে চিঠি লিখছি—জায়গাটা লোকালয়ের বাইরে। কাছেই দুমকা-রামপুরহাট পীচ সড়ক। রামপদ বেয়ারা রান্না করছে—আমি দুপুরে খেয়ে নলহাটি যাব কাজ করতে। কাল সকালে সাঁইথিয়ার পথে।

কাল সারারাত একটা বই পড়লাম, 'দি ক্লাইমেট্স অব লাভ'। কলকাতায় গিয়ে লেখাটার স্ট্রাকচার-এর কারুকার্য তোমাকে বলব। অনেকগুলো ভাল ভাল বই এবার পড়েছি।—সেগুলোও কলকাতায় নিয়ে যাব।

এবার সারাটা ট্যুর ভীষণ ভিজেছি। প্রায় একনাগাড়ে সাতদিন। তাই শরীরটা ঠিক দুরস্ত নেই। তোমাকে বলেছিলাম ডায়েরি রাখব। কিন্তু রাত্তিরে যখন ফিরি তখন ডায়েরীর কথা আর মনে থাকে না। তবে এইটুকু বুঝি যে ডায়েরি ধরনের একটা কিছু রাখা আমার উচিত। তাহলে পরে সেগুলো পড়ে প্রচুর আনন্দ পাওয়া যেতে পারে।

যেমন ধর—আজ সকালে ঘুম থকে উঠে হাত মুখ ধুয়ে বাইরে ডেক চেয়ারে বসেছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক এলেন। কথা বলে বোঝা গেল উনি এসেছেন আমার কাছে আমাদের কোম্পানীর সাবানের কম্পিটিশনের বিষয়ে কিছু আলোচনা করতে। খবর পেয়েছেন,—'দি গ্রেট নিউ ইণ্ডিয়ার' মিষ্টার দত্ত এখানে আছেন—তাই আর কি।

জিনিসটা এমন কিছু না—চিঠিতে হিউমারের সূক্ষ্মতাটা—ঠিক প্রকাশ করতে পারছি না—তবে একধরনের ম্যানারিজম্, যা কিনা হাত পা ছুঁড়ে বোঝানো যেতে পারে।

তুমি আমাকে অনেক সময় বলেছ—যে, আমি যে ধরনের কথা বলে বাইরের জীবনের হালচাল ব্যক্ত করি—সেগুলো লিখিনা কেন? আমার মনে হয় লিখতে গেলে আমি সেই সব মুহূর্তগুলোকে হত্যা করে ফেলব হয়ত। আমার মনের এই ভাবটার ব্যাখ্যা একটা বইতে ভারি সুন্দরভাবে পেলাম। 'কোট' করার লোভ সামলাতে পারছি না।—

We always wish to look for the eternal elsewhere than here. We always direct our spiritual look towards something other than the present situation and present appearence; or we wait for death and new life. Every moment a new life is offered to us. 'Today', 'the now', 'the immediate', is all we can get hold of.

দেখ আমি ইচ্ছে করলে আজ সন্ধেবেলা সুন্দরভাবে এই চিঠিটা লিখতে পারতাম।

কিন্তু মনে হল লিখতে যখন বসেছি—আমি ডিউটি বাউন্ড—কালি-কলমের সুবিধা অসুবিধা গৌণ। তাই পেন্সিল দিয়েই লিখে দিলাম। তোমার মধ্যে এই ফিলিংটা থাকা দরকার—কারণ তুমি লেখ।

আজকের সকাল অন্য দিনের চেয়ে পৃথক—ঘরের জানলার পর্দাগুলো আধখোলা—ফাঁক দিয়ে মেঘ-ভর্তি আকাশ দেখা যায়। এরকম দিন আমার ভীষণ ভাল লাগে।

তোমার কাজকর্মের ব্যাপার কতদূর এগোলো। কলকাতায় গিয়ে শুনব। মাকে বল, দোসরা তেসরা নাগাদ বাড়ি যাব। আশা করছি টাকা নিয়ে যাব।

বাইরেও বৃষ্টি হচ্ছে। জামের ডালা মাথায় দিয়ে জামওয়ালা যাচ্ছে। গতবার বর্ষার সময় পল্টুর হোটেলে ছিল প্রমথ। আসানসোল কি ঘিঞ্জি।

প্রমথ সকালে ওর সঙ্গে বেরোলো। পল্টু পাজামা আর গেঞ্জি কিনে দিল দোকান থেকে। হোটেলে ত প্যান্ট পরে থাকা যায় না। প্রমথ ঝোঁকের মাথায় একবস্ত্রে এসেছে। দোকানে গিয়ে কফি, টোস্ট আর ডিমসেদ্ধ খেল দুজনে। বাইরের দিকে পিঠ দিয়ে বসেছিল পল্টু। প্রমথকে জিজ্ঞাসা করল, 'দেখতো বৃষ্টি হচ্ছে নাকি।' বৃষ্টিই হচ্ছিল।

প্রমথ বলল, 'না। একটু যা ছিট ছিট। এখুনি থেমে যাবে।' বলে প্রমথ দেখল অজান্তে মিথ্যে কথা বলেছে। তনুদার চেয়ে প্রমথ প্রায় ছ'বছরের ছোট। তনুদার যাও বা একখানা ছবি ছিল--হাফপ্যান্ট পরা, বড়দার পাশে দাঁড়িয়ে--সেখানা আর নেই। শ্মশানের শোয়ানো ছবিখানা প্রথম কবছর সামনের ঘরে থাকত। মা কিছুদিন ঠাকুর ঘরে রাখল। শেষে শোয়ার ঘরেও ছিল। এখন ট্রাঙ্কে। আর কবছর পরে—হয়ত প্রমথর ছবিও ট্রাঙ্কে যাবে। পল্টু তার চেয়ে বছর তিনেকের ছোট। পল্টু একা একা এই দূরের শহরে সাবান স্নো বিক্রি করে। দেড়টা দুটো অব্দি খাটে—তারপর স্টেটমেণ্ট তৈরী করে পাঠায়—হোটেলের খাওয়া, বিকেলে আবার টই টই—আর শেষে নাইট শোতে হিন্দি ছবি—'রিক্রিয়েশন'! অনিয়মে, পরিশ্রমে, বেশী খাওয়ায় এবং ঘোরাঘুরিতে মোটা হয়ে গেছে পল্টু। মাঝে মাঝে পেটে ব্যথা হয়। এখুনি আবার বেরোতে হবে। প্রমথর নিজেক অপরাধী লাগছিল। তনুদা বেঁচে থাকলে তাকে এভাবে ঘোরার চাকরীতে ঠেলে দিত না নিশ্চয়। নিজে চাকরী না করে বাড়িতে বসে অন্ন ধ্বংস করত না নিশ্চয়। সেই অপরাধ বোধ থেকেই পল্টুকে মিথ্যে কথা বলে ফেলেছে প্রমথ। 'না বৃষ্টি হচ্ছে না।' নিজেই পল্টুর পরিশ্রমের অংশটা লঘু করে দেখবার এবং দেখাবার চেষ্টা করেছে।

পল্টুদের কোম্পানীর তিনজন আর পল্টু একসঙ্গে জি. টি. রোডের ওপর

থাকে। পল্টু বলল, 'আমরা ঘুরে আসছি—তুমি হোটেলে গিয়ে বস। স্যুটকেসে তোমার জন্য নতুন বই আছে।'

ওরা চলে গেলে, প্রমথ ফিরে এল হোটেলে। পাতা ওলটালো—ভাল লাগে না। ঘুমিয়ে ছাদে গেল—শ্যাওলা-পড়া পুরনো ছাদ। নীচে উঁকি দিল। আঙুর বসেছে পথে। গামছার দোকান। ঘরে ফিরতে দেখল, অনেকগুলো খালি বোতল। বিয়ারেরই বেশী।

ঘুমিয়ে ছিল। সন্ধ্যে নাগাদ ওদের হৈ হৈ-তে জেগে উঠল। পল্টু আর শর্মা চান করে এল। প্রমথ জিজ্ঞাসা করল, 'গুহ, রায় এরা কোথায়?'

শর্মা হেসে বলল, 'আসছে।' খানিক পরে এল ঠিক। সঙ্গে তিনটে বোতল। মাংসের বড়ার ঠোঙা, কাটলেট আর শশা।

পল্টুই বলল, 'এক্সকিউজ আস।' শর্মা বলল, 'আমরা রোজ খাই না।' তারপর থেমে বলল, 'বৃষ্টি হচ্ছে, খারাপ লাগবে না। দেখুন না আপনি একটু।' প্রমথর আপত্তি ছিল না। খানিক খেল। কিছুই হল না। শর্মা চিনি মিশিয়ে কড়া করল। বলল, 'ওকি আপনার শেষ? আস্তে আস্তে খান—তা না হলে ত ধরবে না। সময় দিন একটু।'

নেশার জন্যে তারিয়ে তারিয়ে খাওয়া ত ভয়াবহ। এমনিতেই শর্মার চোখ ট্যালটেলে। এরা আমার কেউ না। জগৎশুদ্ধ সবার ভাল করা আমার পক্ষে সম্ভব না। আর ইচ্ছেও নেই। কিন্তু পল্টুকে দেখে প্রমথর মন একদম অন্ধকার করে খারাপ হয়ে গেল। দু'গ্লাস প্রায় র খেয়েছে—তারপর হাতে একখানা ইংরাজি বই নিয়ে পড়ছে। চোখ টক্‌টকে লাল, একটু একটু ছোট-বেলার মত করে হাসছে। রায় বলল, 'পল্টু খেলেই গম্ভীর হয়ে যায়। বই পড়ে। ভেরি সোবার।' মন একেবারে কালো হয়ে গেল শুনে। কী সর্বনাশ, প্রায়ই খায় তাহলে, গম্ভীর হয়—বন্ধুরা সোবার ভদ্র বলে—এবং তাতে গর্বিত হয়।

সেদিনই শেষ রাত্তিরে পল্টুর ঘুম ভাঙিয়ে ট্রেন ভাড়া নিয়ে ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতা চলে এসেছিল প্রমথ।

চিঠিটা ভাজ করে ড্রয়ারে রেখে দিল। বাইরে বৃষ্টি। উপুড় হয়ে শুয়ে গান ধরল, 'আমি তোমায় যত—' অনেক গাইবার পর প্রমথর কেমন বিশ্বাস হল তার গান শানাইয়ের একটা সুন্দর রাগ হয়ে কানের কাছে বাজছে।

এমন সময় মা এসে পাশে বসল। হাতখানা পিঠের ওপর বোলাতে লাগল। প্রমথ উঠে বসে বলল, 'যাই ঘুরে আসি।'

॥ দশ ॥

প্রমথ সুধা সম্পর্কে কি ভাবে কিংবা প্রমথর মনে কী কী উচ্চ চিন্তা উদিত হয় তার সঙ্গে প্রমথর বাবা, মা, বাড়ি ইত্যাদির কোন যোগ নেই। প্রমথ যা ভাবে তা যদি তারা জানতে পারে তাহলে সামনাসামনিই বলবে, হাতে সময় আছে তাই ছাইপাশ যা ইচ্ছে ভাবা হয়। 'আমি সুধাকে ভালবাসি না'— এই কথাগুলো বাবার পক্ষে নিতান্তই বাহুল্য—মা বলবে, ভালবাস না—তা ত ভালই। এ নিয়ে এত ভাবার কি আছে। পরিশ্রান্ত বাবার সামনে এসব কথার গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে প্রমথ।

দুপুরবেলা সুধা বাড়িতে এল। শনিবার, সকাল সকাল অফিস শেষ। মাকে দুর্গাপুরের বিজ্ঞাপন দেখাল। প্রমথর হওয়ার চান্স আছে বোঝাল। এখনও লাষ্ট ডেট যায় নি। বন্যা বলে দুমাস ডেট পিছিয়ে দিয়েছে।

প্রমথর মা'র খুব ভাল লাগেনি প্রথমে। আগে মেয়েটিকে তার বিষের বড়ি মনে হত। কিছুদিন হল প্রমথর জন্যে সুধার আন্তরিকতা তার চোখে পড়েছে। এখন তাই আর কঠিন কথা বলতে পারে না। মা চা করে আনতে গেল। প্রমথর আগের কারখানার পাল সাহেব এখন দুর্গাপুরে। প্রমথ একবার ভাবল, যাবে নাকি।

সুধা বলল, 'তোমার রেজাল্টও ভাল হয়ে যেতে পারে।' তারপর থেমে বলল, 'অঙ্কে কিরকম ছিল?'

'ম্যাট্রিক ইণ্টারমিডিয়েট দুটোতেই লেটার।' কথাটা একেবারে মিথ্যে। সুধার মত প্রমথও ম্যাট্রিকে থার্ড ডিভিশন। সুধার ভাল রেজাল্টের ওপর ভক্তির মত ভাব আছে। প্রমথ সেই ভাবনার ওপর উঠে সুধার পুজোর মত ভক্তি দেখার লোভ সামলাতে পারে না। এতদিন ধরে বিভিন্ন সময়ে বাড়িয়ে বলতে বলতে প্রমথ আজকাল নিজের কানেই যখন নিজের নম্বর শোনে তখন মনে হয় সত্যি বুঝি এগুলি তার নিজেরই কৃতিত্বের ফল। মাঝে মাঝে নিজেকে তার স্কলারও মনে হয়।

শেষ রাতে দুর্গাপুরে গিয়ে হাজির হল। মা দিয়েছে পনের, সুধা কুড়ি। মা সুধার দেওয়া জানে না। ঠিক করল, সকালবেলা গিয়ে পালসাহেবকে ধরতে হবে। ওয়েটিং রুমে শেষরাতে চান করে রিক্সায় করে প্রোজেক্ট অফিসে গিয়ে উঠল। একখানা স্টেশন-ভ্যান যাচ্ছিল, থামাতে, সব শুনে বলল, 'সে ত এখানে নয়—নিউ টাউনশিপে থাকেন।' প্রমথকে খানিক দেখে বলল, 'চলুন ওদিকেই যাচ্ছি। এই গাড়িতেই তিনি যাবেন।'

পথে একজায়গায় থামিয়ে এক ভদ্রলোককে তোলা হল। দুটো টিফিন ক্যারিয়ার সঙ্গে। ড্রাইভারের কথায় বোঝা গেল পালসাহেব গাড়ি পৌঁছনো মাত্র তাতে চড়ে পিকনিকে যাবেন—আশি মাইল দূরে—কি একটা লেক আছে, সেখানে।

প্রথমে চিনলেনই না। তারপর বললেন, 'কাল অফিসে যেও।'

প্রমথর গোনা টাকা। গরম। হোটেলে খালি খাটের সঙ্গে ফ্যান নিলে রাত প্রতি দশ আনা। কপাল ঠুকে থেকে গেল। বিকেলে হোটেলে অন্ধ্রের এক ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল। বহুদিন চাকরী খুঁজছে। ডিপ্লোমা কোর্সে ইঞ্জিনীয়ারিং পাশ করেছে। বয়স বেড়ে গেছে বলে দুর্গাপুরে হচ্ছে না।

বিকেলে শুকনো কাপড় নিয়ে রেল স্টেশন টপকে ধোপার বাড়ি গেল দুজনে। ইস্ত্রি হল।। এমনি অনেক কথা হল। অন্ধ্রতে মাইনে বড় কম। গরম ধুলো এখন আর উড়ছে না। প্রোজেক্টের ইঞ্জিনীয়াররা দুএকজন জিপে বেরিয়েছে—পেছনে হপ্তার বাজার, ডাই-করা তরকারি, সোডার বোতল—অনেক কিছু।

একটা রাত্রি কাটানো দরকার। কেটেও গেল।

পরদিন সকালে গিয়ে শুনল, পাল সাহেব একটু আগে অফিসে চলে গেছে। মানে আট মাইল দূরে প্রোজেক্ট অফিসে।

স্টিল টাউনের বাসে করে যখন প্রোজেক্ট অফিসে গেল, তখন শুনল, সাহেব লাঞ্চে গেছেন বাড়িতে। মানে যেখান থেকে প্রমথ এখন বাসে করে এল।

জুতোর গোড়ালি শক্ত—মোজাটাও পাতলা, পায়ের পাতায় মাংস কেমন কমে গেছে। দেখা করার জন্যে কাল প্যাণ্ট সার্ট নিজে কেঁচে ইস্ত্রি করিয়েছে। দুর্গাপুরে জল কম, লণ্ড্রীর কাপড় ট্রেনে চড়ে রাণীগঞ্জে যায় কাঁচতে। সব ভাঁজ নষ্ট হয়ে গেছে। এ্যাপ্রেণ্টিসদের নিয়ে নিউ টাউনশিপে একটা ওয়েপন ক্যারিয়ার যাচ্ছিল। কয়েকবছর আগে প্রমথও এ্যাপ্রেণ্টিস ছিল। তখন এত সুযোগ সুবিধা ছিল না। দল ছেড়ে গেছে প্রমথ। আর কি নেবে!

এবার দুঃখও হল না। রাগ না, এমনকি কষ্টও না। এবারেও পালসাহেব

বাড়ি নেই। দুপুরে খাওয়া দাওয়া করে প্রোজেক্ট অফিসে ফিরে গেছেন। একটা লরি থামিয়ে তাতে চড়ে ফিরল প্রমথ। পেছন দিকে সাঁ সাঁ করে পিচের রাস্তা সরে যাচ্ছে--দুপাশে শালের সারি। হঠাৎ চারিদিক কড় কড় করে একটা শব্দ সব ঢেকে দিল। এতবড় বাজ কোথায় পড়ল। শব্দটা কি দ্রুত এগিয়ে আসছে। মাথার ওপর খুব নীচু দিয়ে তিনখানা জেট প্লেন চলে গেল। কাছের পাহাড় সে শব্দ অনেকক্ষণ ধরে রাখল।

এইবার প্রমথর সেই স্বপ্নটা দেখার ইচ্ছে হল।--মানে ঠিক করল, সে এখন সেই স্বপ্নটা দেখবে। এত ইন্টারেষ্টিং।

রাস্তার দুপাশে বিভিন্ন পরীক্ষার এ্যাডমিট কার্ড, কোশ্চেন, ইণ্টারভ্যু লেটার সব ছড়িয়ে পড়ে আছে। এসপ্ল্যানেড অঞ্চলে ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। রাত দশটা। বিরাট বিরাট বাল্ব থেকে কড়া আলো এসে পড়েছে তার গায়ে। সে একটা ধুতী পাঞ্জাবী পরে (পায়ে পাম্প) রাস্তার মাঝখান দিয়ে ময়দানের দিকে চলেছে। পথের দুপাশে হাজার হাজার লোক। সবার মুখে এক কথা, সবাই হাততালি দিচ্ছে—'সে যাচ্ছে,' 'সে যাচ্ছে'। প্রমথর আর পথ ফুরোয় না।

দৌড়তে দৌড়তে প্রোজেক্ট অফিসে এসে হাজির হল। আর একটু পরেই পাঁচটা বাজবে। অফিসের লোক বলল, 'দৌড়ে যান—প্রোজেক্ট অফিসের সামনে —ঐতো দাঁড়িয়ে কথা বলছেন।' প্রায় দৌড়েই গেল। মনে হল ঠিকাদারের সঙ্গে কথা বলছেন।

শেষ হতে মিষ্টার পাল বিদ্যুৎগতিতে অফিসে ফিরলেন। ভাল না খেলে এত জোরে হাঁটা যায় না। সব শুনে বললেন, 'তোমার ত এক্সপিরিয়েন্স কিছু কম আছে। হবে না তো।' চাকরী চাইতে গেলে পা জড়িয়ে ধরতে হয়। কিংবা খুব তোয়াজ করতে হয়। প্রমথ ভাবল তখন যদি ছেড়ে না দিত—তাহলে আজ এসব চাকরী হামেশা রিফিউজ করতে পারত।

পালের পা জড়াতে গিয়ে চেয়ার টেবিলে বেঁধে বিশ্রী একটা ব্যাপার ঘটে গেল। পাল শেষে কড়া কড়া কথা শুনিয়ে দিল। ছোট চেয়ারটা উলটে পড়েছে।

প্রমথ বাইরে এসে পকেট থেকে এ্যাপলিকেশনটা বের করল। কত পরিশ্রমে তৈরী। রেলের ড্রেন দিয়ে বড় বিলের জল যাচ্ছে। ঝুপ করে তার মধ্যে ফেলে দিল।

দুর্গাপুরে থাকার আর মানে হয় না। হোটেলে ফিরে শুনল এখুনি একটা মেল পাশ করবে। বাকি মিটিয়ে প্ল্যাটফর্মে এসে দাঁড়াল।

গাড়িতে বসে ঠিক করল, কাকে কি বলবে প্রমথ। মাকে বলবে, পাল খুব ইণ্টেলেকচুয়াল ইঞ্জিনীয়ার। যেতেই যত্ন করল—বলল, 'তুমি কি থাকবে?' প্রমথ জানে এই অবধি বলবার পর মা আনন্দ পাবে—সেই তোড়ে লেগে থাকার উপকারিতার উপর কিছু বলবে।

প্রায় সন্ধ্যের সময় বর্ধমান চলে গেল।

সুধার সঙ্গে অফিসে দেখা হবে—কিংবা বাড়িতে। সে একরকম করে বলতে হবে—যাতে বোঝায় যে প্রমথর এখানে হওয়ার অন্তত সেভেণ্টি পারসেণ্ট চান্স আছে।

পালের আশা করে এখানে আসা তার নিজেরই বোকামি হয়েছে। সুধা এই নিয়ে অনেকগুলো টাকা দিল।

ফেরার তাড়াতাড়িতে অশ্বের সেই ছেলেটির সঙ্গে দেখা করে আসা হল না।

॥ এগারো ॥

নীলিমাকে চা দিল লিলি, অবিনাশকে লেবুর সরবৎ। দিয়ে বুঝিয়ে বলল, 'ওর শরীরটা কদিন ধরে ভাল চলছে না।' লিলি চলে যেতে নীলিমা বলল, 'কি গো খারাপ হল কিসে?'

অবিনাশের বাড়িতে নীলিমা এসেছে। অনেকদিন পর। গোরাবাবু দিল্লিতে অফিসের কনফারেন্সে গেছে।

নিজের বাড়িতে অবিনাশ অনেক স্বচ্ছন্দ—কিন্তু লিলি সামনে এলেই—মানে নীলিমা যখন আসে—তখন অবিনাশ এমনভাবে কথাবার্তা বলে, মনে হবে নীলিমার সঙ্গে তার বুঝি এই প্রথম আলাপ।

কাল রেকর্ডিং করে বিকেলের দিকে এসেছে। অবিনাশ অফিস থেকে ফিরে লিলি আর নীলিমাকে একসঙ্গে গল্প করতে দেখে ঘাবড়ে গিয়েছিল।

প্রথমত, লিলিকে সে ভালবেসে বিয়ে করেছে। একটা পয়সা নেয়নি। দ্বিতীয়ত, বিয়ের পর একটানা কয়েক বছর রাতে শুয়ে এত বেশী ভালবাসার

কথা বলেছে—লিলি কি তার দু'এক কণাও নীলিমাকে শোনায়নি। শুনে নীলিমার নিশ্চয় ভাল লাগবে না। তৃতীয়ত, নীলিমার মনে এমন একটা বিশ্বাস জন্মানো হয়েছে—যার অর্থ, লিলি যথেষ্ট কনসিডারেট না। অবিনাশের মত পুরুষ লোক যে পঞ্চাশের দশ বছর আগেই পুরুষ সিংহ—নাম, অর্থ যে দরজায় বেঁধে রেখেছে—তার স্ত্রী স্বামীর প্রতি যথেষ্ট যত্নশীলা নয়, একথাটা অন্য মেয়েলোকের পক্ষে চিরাচরিত পুরুষ-লোকের দিকে এগোবার বাধানিষেধ, বিবেকের শাসানি—সব সরিয়ে দেয়। সুতরাং পাঁচ মিনিট একসঙ্গে থাকলে যদি টের পায় লিলি যথেষ্ট কনসিডারেট—এবং নীলিমার এই উপলব্ধি অবিনাশের পক্ষে খুব সুবিধার নয়।

তবে অবিনাশ একটা জিনিস টের পেয়েছে। কলকাতায় কি অন্য যে কোন শহর কি গ্রামের কয়েক কোটি স্বামীর গম্ভীর থাকার মানে হয় না। সব সময় অস্থিরতার ভান করে—কিছু (ছেলে যেমন অল্প বয়সে মার কাছে করে) দুষ্টুমি করে—স্ত্রীর পরিশ্রম বাড়িয়ে দিয়ে সবকিছু সরস করে তোলা যায়।

শ্যামনগর থেকে ফেরার পথে সেদিন বিশেষ কথা হয়নি নীলিমার সঙ্গে। নীলিমা বোকারোতে যাবে। গোরাবাবু স্টেশনে থাকবে গাড়ি নিয়ে। নীলিমাই বলেছে। তাকে হাওড়া স্টেশনে নামিয়ে দিয়ে অবিনাশ সোজা বাড়ি চলে এসেছিল।

অবিনাশ তার মনের খুব নীচুতে জানে তার ছেলে মেয়ের মা লিলিকে সে ভালবাসে। কিংবা ভালবাসা যদি নাও বলে—তবু, লিলি অসুবিধায় পড়লে অবিনাশ এগিয়ে আসবেই। এমনকি লিলির রাস্তা পার হওয়ার সময় অবিনাশ দম আটকে অপেক্ষা করে। যা আনাড়ি।

অবিনাশ এমন একটা জায়গায় এসে দাঁড়িয়েছে—যেখানে আগের বয়েসের অস্থিরতা, লাবণ্য, প্রাচুর্য সব ত্যাগ করে বয়েসের গাম্ভীর্যে প্রবেশ করা দরকার। কিন্তু বয়েসই তাকে প্ররোচিত করে। অস্থিরতা যেয়েও যায় না। এখন এই সময় সে কোন মেয়েকেই মন দিয়ে একাগ্র হয়ে ভালবাসতে পারে না। ভালবাসা বলা ঠিক হবে না—সঙ্গসুখ।

অথচ আগে হলে, যখন তার বয়েস কুড়ি বাইশ ছিল। একটি মেয়েকে অবিনাশ কুকুরের মত ভালবাসত। এখন বোঝে, বনজ আকর্ষণের মোহে অবিনাশ তখন ভুগত। মেয়েটা তাকে দেখিয়ে অন্য একটা ভারি বয়স্ক লোকের সঙ্গে শুতো—আর বা পা খাটের বাইরে ঝুলিয়ে পায়ের নখ দিয়ে অবিনাশের পিঠ খুঁচিয়ে তাকে জাগিয়ে রাখত। তিরতির নদীর জলের মত একরকমের জ্বর সময়মত রোগীর গায়ে কাঁপে—অবিনাশও তখন সেইরকম একটা জ্বরের আবহাওয়ায় আচ্ছন্ন হয়ে থাকত।

লিলি নিজের জন্যে মুড়ি মেখে আনতে গেছে। অবিনাশ জানে তার আগের সেই বয়েসে আর সে ফিরে যেতে পারবে না। খুব মন দিয়ে ভেবে দেখলে বোঝা যায়, অবিনাশ সেই বয়েসে গিয়ে আর খাপ খাওয়াতে পারবে না।

লিলির মন নীলিমাকে ধরতে পারে না। নীলিমা একটা তীব্র আবেগের সঙ্গে দুলতে ভালবাসে। বহুদূর থেকে অনেক দেখা করার ইচ্ছে নিয়ে আসবে —কয়েকদিনে ক্লান্ত হয়ে বিশ্রাম নিতে ফিরে যাবে। প্রতিজ্ঞা করবে, আর আসব না। কিছুদিন পরে আবার আসবে। এতসবের মাঝে গোরা বলে যে একটা লোক আছে তা কখনই মনে হয় না।

লিলি কিছু মুড়ি নীলিমাকে দিল। পথ দিয়ে দুটি মেয়ে যাচ্ছিল। অবিনাশ উঁকি দিল। 'বাঃ! বেশ ত—ফলো করার ইচ্ছে হচ্ছে।'

নীলিমা শাসনের ভঙ্গীতে বলল, 'কি হচ্ছে।'

লিলি হেসে ফেলল, অবিনাশকে দেখিয়ে বলল, 'ও মুখেই অমনি—কাজের বেলায় কিচ্ছু না।'

কথাটায় অবিনাশ মুহূর্তে কালো হয়ে গেল। অবিনাশের সাফাই গাইছে লিলি—তার বৌ, সৎ বিশ্বাসে। যে শুনছে সে জানে অবিনাশ লিলিকে লুকিয়ে তার সঙ্গে শ্যামনগর গিয়েছিল। অবিনাশ লিলির ঐ কথায় মুহূর্তে মরে গেল। কি দরকার ছিল নীলিমার সঙ্গে মিশবার।

এমন সময় প্রমথ আসাতে বেঁচে গেল অবিনাশ। লিলি ওদের বসতে বলে প্রমথর সঙ্গে বেরোল। খানিক গিয়ে রিক্সা। দুর্গাপুরে প্রমথর কিছু হয়নি শুনে খানিকক্ষণ চুপ করে থাকল অবিনাশ। জলের ট্যাঙ্কের মোটা পাইপ আকাশের উঁচুতে অনর্গল ধোঁয়া বের করে দিচ্ছে।

রিক্সায় বসে আজ বিকেলের পুরো ঘটনাটা বলল অবিনাশ। 'লিলির তুলনায় আমি ক্রিমিকীট প্রমথ, আমি ক্রিমিকীট।' শ্যামনগরের সেই রাত্তিরের কথাও বলল।

প্রমথ নিজের কথা ভেবে দেখল। অবিনাশ চৌধুরী চল্লিশে ক্রিমিকীট। এখনকার যত প্রমথ দত্ত আছে তারা সবাই তিরিশের আগেই ঝানু ক্রিমিকীট। প্রমথ চল্লিশে পেঁাছে হয়ত এতটা ভাববেও না। তখন কিছুই স্পর্শ করবে না তাকে।

আচ্ছা পৃথিবীর সবাই মিলে পঞ্জিকা দেখে ভাল দিনে ভাল হওয়ার চেষ্টা করতে পারে না।

সুধার দিদি রেখা রাস্তা পার হচ্ছে। হাতে বই খাতা—অফিসের পর

টিউটোরিয়ালে পড়ছে তাহলে। দুর্গাপুর থেকে ফেরার পর সুধাদের বাড়ি আর যাওয়া হয়নি অনেকদিন। অফিসে ফোন করে বলে দিয়েছে।

একটা সুবিধা—সুধার কথা মনেই পড়ে না আজকাল।

'অবিনাশদা এবার ফিরি।'

'চল।'

॥ বারো ॥

কথামত পল্টু টাকা নিয়ে এসেছে। কিন্তু আসতে অনেকদিন দেরী করেছে। বাবার মুখে হাসি। মার মুখেও হাসি। দুজনেরই শেষ দিক্‌কার ছেলে পল্টু। ভানু মনু ওদের তুই তুই করে ডাকে। প্রমথকেও তুই। কিন্তু পল্টু রেবা, বিজু ওদের তিনজনকেই কেন তুমি বলে দুজনে। ডাকতে গেলে যেন মনে হয় বহু দূর থেকে ডাকছে। ওপরের তিনজনের ভুল হলে, কিংবা ওদের কিছু মনোমত না হলে বাবা বকতে কসুর করে না—কিন্তু শেষ তিনজনের বেলায় দুজনেই প্রায় সব কিছু এড়িয়ে যায়।

বিকেলে পল্টু আর প্রমথ গিয়ে মাংস কিনে আনল। মা এসবই চায়। আলু কোটা, বাটনা বাটা, গরম মশলা আনানো এবং মাংস মাখা ইত্যাদি নিয়ে মা বড়বৌদিকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। যা অল্পক্ষণে হয়ে যাওয়ার তাই নিয়ে অস্থির হয়ে মা ঘরে ঘরে ঘুরতে লাগল।

পল্টু দেখল প্রমথর সঙ্গে মা'র ঝগড়া বাঁধতে পারে। মা যে কেন সব ব্যাপারে এত ব্যস্ত হয়ে পড়ে? বলল, 'চল ন'দা ঘুরে আসি। পরমেশ, বৌদি, বিরুয়া ওদের খবর কি, দেখা হয় না।'

দেখা হয় মাঝে মাঝে—তবে বলার মত কিছু হয় না। আগে প্রমথ ওদের সঙ্গেই অনেক সময় কাটাত।

রাসবাড়ির পথ দিয়ে চলল দুজনে। আগের মত আর রাস হয় না। শ্যাওলা পড়ে চুড়োগুলো কালো হয়ে আছে।

পল্টু বলল, 'তনুদা কেন বিষ খেল জান?'

প্রমথ বলল, 'না। কেউ জানে না।'

'আগে ভাবতাম আমি ছোট বলে আমাকে কারণ বলা হয় না।'

'নারে, সত্যি কেউ জানে না।'

'জানি', থেমে বলল, 'মেয়েদের ব্যাপার নিয়ে কিছু নয় ত?'

'পাগল নাকি। তা হলে কিছু একটা প্রমাণ থাকতই। তাছাড়া তনুদার ওসব বাল্লাই ছিল না।'

প্রমথ ভেবে দেখল কোন মেয়ের জন্যে সে আত্মহত্যা করতে পারে কি না। অসম্ভব। লোকে বলে কাপুরুষরা আত্মহত্যা করে। হবেও বা—যারা আত্মহত্যা করে তারা কাপুরুষ। কিন্তু, ইলেকট্রিকের সুইচ খুলে তাতে হাত দেওয়া, ইঞ্জিনের চাকার নীচে গলা রাখা—কিংবা বাসের নীচে গড়িয়ে পড়ার মত সাহসও তার নেই। ব্লেডে আঙুল কেটে গেলে কিংবা হঠাৎ আলপিন ফুটে গেলেই লাগে। যারা আত্মহত্যা করে তারা যতটা কাপুরুষ প্রমথ তাদের চেয়েও কাপুরুষ।

হাঁটতে হাঁটতে পল্টু বলল, 'কুড়ি বছর বয়েসে তনুদা অত্যন্ত অন্যায় করেছে। মার চুল পেকে গেল। গোড়ায় কেমন পাগল হয়ে গিয়েছিল মা।' তখন মার চোখ পাগলের মত ঘুরত—এক জায়গায় স্থির থাকত না। 'কুড়ি বছর বয়েসের লোক—এটা তার বোঝা উচিত ছিল।'

তনুদা বেঁচে থাকলে পল্টুর চেয়ে প্রায় দশ বছরের বেশী বয়স হত। পল্টু যা বলল, প্রমথও সেই কথাগুলো আরও রাগে রাগে বলত কয়েক বছর আগে। ভীষণ রাগ হত তনুদার ওপর। কুড়ি বছরের দামড়া। এখন নিজেরই লজ্জা হয়—সে একদিন এই সব কথা বলত। পরে পল্টুর মনে পড়লে পল্টুও লজ্জা পাবে।

প্রমথ এখন বোঝে কুড়ি বছরের একটা ছেলের কতই বা বুদ্ধি হতে পারে। মুহূর্তের তাড়নায় যে কোন কাজ করে বসতে পারে। তার বয়স বাড়তে বাড়তে কবে কুড়ি পঁচিশ পার হয়ে গেল। অথচ তনুদা সেই কুড়িতেই পড়ে আছে। এখন তনুদাকে তার নিজের চেয়ে ছোট মনে হয়। একদিন স্বপ্ন দেখেছিল—মরার বছর দুইয়ের মধ্যে। বহুদিন পরে তনুদা ফিরে এসেছে। পোড়ানোতে তনুদা মরেনি। কারণ যাকে পোড়ান হয়—সে তনুদা নয়। তনুদা অনেকদিন এক সাধুর আখড়ায় ছিল। পালাবার সুযোগ পেয়েই চলে এসেছে। স্বপ্নের মধ্যে আনন্দের চোটে কেঁদে কেঁদে বালিশ ভিজিয়ে ফেলেছিল প্রমথ।

পল্টু সিগারেট কিনে নিজে ধরাল—প্রমথকে দিল।

কোন মেয়ের জন্যেই প্রমথ আত্মহত্যা করতে পারবে না। নিজের জন্যেও না। বিকেলে এই ফাঁকা পথে, ইটের ভাঁটি, ডুবন্ত সূর্যের আলো সব দেখে প্রমথ বুঝতে পারল সে কিছুতেই আত্মহত্যা করতে পারবে না। তাতে ব্যথা

লাগে। এখান থেকে একবার চলে গেলে ইচ্ছে হলেই আর ফিরে আসা যায় না। প্রমথ অনেকদিন বাঁচতে চায়।

পল্টু বলল, 'আমার আজকাল ঘুম থেকে উঠে ট্যুরে বেরোতে ইচ্ছে করে না। একঘেয়ে লাগে ন'দা।'

প্রমথর লজ্জা হল। সে একটা মাঝারি চাকরি পেলে পল্টুর এত কম বয়েসে বাইরে বাইরে চাকরী করতে যেতে হত না।

'আমি ত কোন চাকরী এখনও পাইনি। তোর খুব কষ্ট হয়।' পল্টুর মুখের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আর কিছুদিন দেখ্।'

পল্টু ভেবে দেখল—সত্যি তার খুব কষ্ট হয়। কিন্তু এও সত্যি তাকে ত চাকরী করতেই হবে। জন্মেছি যখন মরতেই যেমন হবে চাকরীও তেমন করতেই হবে। ন'দার চাকরী হলেও তাকে চালিয়ে যেতে হবে।

'এমনিতেও আমার বয়স বাড়ছে।' প্রমথর সব পথ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। চাকরি বাকরিতে টাটকা ছেলে চায়। অন্য সময় পল্টু বলে, 'একি! তোমার ত তিরিশ হতে চলল। তোমার আরও গম্ভীর হওয়া উচিত।' তারপর নিজেই বলে, 'কি মন খারাপ হয়ে যাচ্ছে?' পুরোটাই ঠাট্টা। কিন্তু আজ আর পল্টু ঠাট্টা করল না। বলল, 'তোমার আবার বয়েস কি, সেদিন হুড্রুতে গেলাম পিকনিকে। প্রায় সবাই চল্লিশের ওপর—কেবল আমিই তিরিশের নীচে। কী হৈ হুল্লোড়—কে বলবে, কারও বয়েস হয়েছে।' থেমে প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কলকাতায় থাকলেই বুড়িয়ে যাবে।' রাসবিহারী এ্যাভিন্যুতে এসে দাঁড়াল দুজনে।

পল্টু বলল, 'আমার গায়ের জামাটা দেখেছ—এটা পরে তুমি বেরোতে পারবে? —না। আমি এটা পরে সর্বত্র যেতে পারি।'

প্রমথ ভাবছিল কোথায় যাওয়া যায়। পল্টুর কথায় খেয়াল হল। পল্টু তখন বলছে, 'এটাকে তুমি লাউড কালার বলবে।'

'চল্ মেজদার বাড়ি ঘুরে আসি।' প্রমথ পল্টুর কথা একদম শুনতে পায়নি।

মেজদার বাড়ি থেকে ফিরতে ফিরতে সন্ধ্যে হয়ে গেল। মেজদা মেজবৌদি টেবিলে বসে মিষ্টি খাওয়ালো। ছেলেমেয়ে দুটি ফুলের কুঁড়ি। পল্টু ভাবছিল নিজের ভাইয়ের বাড়ি টেবিলে বসে খেতে হল। হয়ত বসার সুবিধা —কিন্তু বয়েস কত দূরে সরিয়ে দেয়। ন'দা এর নাম দিয়েছে স্বর্গচ্যুতি। আরও বয়েস হলে বিজুকে আমরা আমাদের বাড়িতে টেবিলে বসিয়ে খাওয়াব। আচ্ছা তনুদা বেঁচে থাকলে তার বাড়িতেও যেতে হত।

'ন'দা? তনুদা কতদিন নেই?'

প্রমথ চলন্ত ট্রামে কথা বলে না। শব্দের মধ্যে ভাবল পল্টু বুঝি সাধারণ কী জিজ্ঞাসা করছে। শুনতে না পেয়ে জিজ্ঞাসা করে শুনল 'তনুদা কতদিন নেই?' 'প্রায় চোদ্দ বছর।' বলে বুঝল পল্টু ঐসব চিন্তা করছে। পল্টু ভীষণ ভাবে। রক্তের চাপে ভোগে বলে চোখের নীচেটা কালো—তাই আরও বিষণ্ন আরও ক্লান্ত দেখাচ্ছে। যদি তার একটা চাকরি থাকত তাহলে পল্টুকে এবার আর ফিরে যেতে দিত না। এখানে প্রোফেসারিতে লাগিয়ে দিত খুঁজে পেতে। হোক্ না মাইনে কম।

প্রমথ একটা জিনিস ঠিক করতে পারল না। সে পল্টুকে ভালবাসে, মেজদাকে, বড়দাকে, বিজুকে, রেবাকে, মাকেও (যদিও ঝগড়া হয়)। বাবার কিছু হলেও প্রমথ কষ্ট পায়। কিন্তু সেই প্রমথ—সংসারী টানে বাঁধা প্রমথ, কি করে সুধার সঙ্গে কিংবা একের পর এক অন্য কোন কিংবা যেকোন মেয়ের সঙ্গে যুক্তিহীন হৃদয়সম্পর্কবর্জিত ভালবাসার ভান করে। ইন্দিরাকে ভালবাসার বয়েস হয়নি যখন তখনও ভালবাসার ভান করত—আর এখন যখন বয়েস হয়েছে তখন সুধার সঙ্গেও সেই একই ভান। ভান বলা অন্যায়। সুধার জন্য তার কষ্ট হয়। অথচ সে সুধাকে ভালবাসে না। ভালবাসতে না পেরে কষ্ট হয় তার। আমি সুধার আগেকার লাভার—এখনকার কি—তা জানি না। কি হয় এসব করে। অঞ্জুকে পাওয়া যায়, সুধাকে ত ইচ্ছে হলেই। প্রমথ জানে এসব পাওয়া নয়। তার নিজের দেহেরও ত দাম আছে। মনশূন্য হাত-পা'র জড়াজড়ি ধস্তাধস্তি আসক্তি মাখানো এক ধরনের যুদ্ধ—চট্‌চটে। একটা জিনিস প্রমথ বুঝতে পেরেছে। সারা রাজ্যের শ্রান্তি, অস্থিরতা, অস্বীকৃতি সব—একবারের চুম্বনে, একবারের নিবিড়তায় স্থির হয়, স্বীকৃত হয়—তা সে যত মনশূন্যই হোক্ না কেন। নিবিড়তার ঘন মুহূর্তে কিছুতেই মনে থাকে না—আমি অঞ্জুকে ভালবাসি না, সুধাকে না, ইন্দিরাকে না, কনসি-ডারেটকে না, নীতিশের শালীকেও না। অবিশ্যি তার সঙ্গে আলাপও হয়নি। কাউকে ভালবাসি না। ভালবাসার ক্ষমতা নেই আমার। শুধু চাকরিই প্রতিবন্ধক না। আমিই আমার প্রতিবন্ধক। জান্তব ধস্তাধস্তিতে, সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই—ঘন মুহূর্তের স্বীকৃতিতে আমি প্লুত হই। এমনকি শরীরে শরীরে ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়—কিন্তু তবুও আমি নপুংসক। আমার চোখে একরকমের মহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আঁসটে গন্ধ সেই কাজলে—আমার চোখ লাল—আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি।

ঘোৎ ঘোৎ করে এগোই। অঙ্কুর, সুধার, পথের মেয়ে ইত্যাদি সকলের বুকের কাপড় একরকম মেঘ মনে হয়। সরে গেলেই আশা করি একখানি গ্রাম্য শস্যভূমি কিংবা ঐ জাতীয় সতেজ নবীন কিছু দেখব। এই সব দেখে যদি ভালবাসায় পড়ি।

অথচ পল্টুকে ভালবাসি। সুধাকে হয়ত বাসি—কি জানি হয়ত বাসি। কেননা সুধাকে সত্যি কথা বলে চোখে দেখা যায় না তার এমন কষ্ট দেখে আমি কষ্ট পাই কেন।

পরমেশকে দেখে দুজনেই লাফিয়ে ট্রাম থেকে নামল। সঙ্গে পরমেশের বৌদিও আছে। দুভাইকে একসঙ্গে দেখে পরমেশ অবাক হয়ে গেল। হেসে বলল, 'দি গ্রেট রি-ইউনিয়ন!'

পল্টু বলল, 'এখন কি পরীক্ষা দিচ্ছেন?'

পরমেশ যথারীতি বিনয়ের সঙ্গে জানাল, এবারও একটা এম. এ. দিচ্ছে। আরও জানাল, সরকারী স্কলারশিপে রিসার্চের পাশাপাশি গোপনে চাকরীও চলছে—রাতে টিউটোরিয়ালও বন্ধ হয়নি। কারণ, বাবা চাকরী ছেড়ে দিয়েছেন এবং ভাইবোন কলকাতায় আসায় তাদের জন্য বাড়ি ভাড়া করতে হয়েছে।

প্রমথ বলল, 'বৌদির থিয়েটার কতদূর।'

'কাল ত ম্যানশন ইন্সটিটিউটে আছে। যাবে?'

পরমেশ বলল, 'তুমিও যেমন! ও যাবে।' প্রমথকে বলল, 'কোথায় চললি? চল্ না।' পল্টুর দিকে তাকাল। পল্টু বলল, 'যাও ঘুরে এস। আমিও একটু পৃথ্বীরাজের ওখানে যাব। দুলু আসবে কথা আছে।'

পরমেশ পল্টুকে বলল, 'আসুন না একদিন আমাদের বাড়িতে। গ্রাণ্ড আছি।'

'সেই বাড়িতেই?'

'হ্যাঁ। বৌদিও আছে।'

পল্টু কিছু অবাক হল। অন্য লোকের মেয়ে শুদ্ধ ফেলে-যাওয়া বৌ—পরমেশের সঙ্গে আছে। তবে যে ন'দা বলে—পরমেশ ভীষণ স্নেহপ্রবণ মানুষ—ওদের ছোটবেলার পড়শীর মেয়ে—বোকার মত মালা বদলের বিয়েতে বিশ্বাস করে পঁচছে—পরমেশই পায়ে দাঁড়াবার ব্যাপারে সাহায্য করছে। পল্টু ঠিক করে রাখল রাতে ব্যাপারটা ন'দার কাছে ভেঙে শুনতে হবে।

'যাব একদিন' বলে পল্টু চলে গেল।

প্রমথ পল্টুর মুখ দেখে গণ্ডগোলটা বুঝতে পেরেছে। প্রমথ নিজে পরমেশের ওখানে গেছে। বস্তী বাড়ীর ওপর সিঁড়ি তুলে দোতলার মত জায়গায় দুই ঘরের এক প্রায়-ভদ্র ফ্ল্যাট। পরমেশের বাবা যখন মেনে নিয়েছে—যেখানে পরমেশের মৌন সম্মতি আছে (বোধহয় কিছু চাপা ভালবাসাও আছে। বাড়িতে বিড়াল থাকলে লোকে বিড়ালটাকেও ভালবাসে), পরমেশের ছোট ভাইরা, দিদি যখন সহজভাবে নিয়েছে—সেখানে আমি তুমি কে। জানে, পল্টুকে এসব বোঝালেও বুঝবে না। বড়বৌদি শুনলে বলবে—ভয়াবহ। তার ওপর আবার মেয়ে আছে।

রেবা, রেবার বর সেবার কলকাতায় আসবার আগে টাকা পাঠিয়ে প্রমথকে দিয়ে ঘর ভাড়া করাল। আসতে মাসখানেক বাকি। ফাঁকা বাড়ির পাহারাদার প্রমথ আর এম. এ. পরীক্ষার্থী পরমেশ। দুজনে দুঘরে থাকত। কতদিন দুপুরে গিয়ে দেখেছে দরজা জানালা আটকানো, ঘরে পরমেশ আর বৌদি।

প্রমথ নিজে কোনদিন কোন প্রশ্ন করেনি। অপেক্ষায় আছে—কোনদিন পরমেশ নিজেই সব বলবে। তবে প্রমথর সবচেয়ে খারাপ লাগে পরমেশের ঐ 'বৌদি' বলে ডাকা। মাঝে মধ্যে দূরে দূরে নাম ধরে ডাকে অবশ্য।

প্রমথ পরমেশকে জিজ্ঞাসা করেছে, 'বিয়ে করবি না? চাকরী করিস—বয়েস হয়েছে।'

'দেখি, পড়াশুনো যাক। তারপর ভাবব।'

এখন বৌদির প্রায় তিরিশ। পড়াশুনো পরমেশের রোগ। কবে সারবে ঠিক নেই। তার পর বিয়ে। প্রমথ ভেবে দেখেছে, তাহলে কপালে দুঃখ আছে অনেক। এর চেয়ে প্রমথ ভাল। কোন ঢাকাঢাকি নেই।

পথে শঙ্কর আর অনুতোষ জুটল। পরমেশ দুজনের মধ্যে ডুবে গিয়ে খানিক এগিয়ে গেল। উত্তেজিত আলোচনার বিষয়—পরমেশের অপ্রকাশিত কবিতা। প্রমথ আর বৌদি কিছু পিছিয়ে পড়ল।

বৌদি সেভেন এইট অব্দি পড়েছে। মালাবদলের স্বামী নাচতে পারত। গায়ে অনেক লোম। তার দলে পড়ে থিয়েটারে হাতে খড়ি। এখন থিয়েটারের প্রায় বই-ই বৌদির মুখস্থ। এই ত সেদিন মিশরকুমারীতে নাহারিণের প্লে করল—নগদ চল্লিশ আর একটা থার্মোফ্লাস্ক দিয়েছে 'কয়ার এ্যাণ্ড কোম্পানীর' ড্রামাটিক ক্লাব। প্রায়ই ডাক আসে—কিছু কিছু হাতেও আসে। মালাবদলের বিয়ে ভাইরা ভালচোখে দেখেনি। ভাঙা বিয়ের পর পরমেশদের ওখানে ওঠায়

জানাশ্বনো প্রায় মুছেই গেছে। এক প্রমথর সঙ্গে দেখা হলে কিছু খোলাখুলি কথা হয়। একা পেলে প্রমথও জিজ্ঞাসা করে।

ওরা এগিয়ে যেতে বলল, 'কি বলছে, বিয়ে করবে?'

'বুঝছি না গো। তোমরা এক একটি বদমাইস', কৌটটা খুলে প্রমথকে পান দিল, জরদা দিল। নিজে মুখে দিয়ে বলল, 'বুঝলে, আজকাল আর চিনতেই পারি না তোমাদের বন্ধুকে। সারাদিন পড়ে।' প্রমথ একথায় অবাক হল না। পরমেশের পক্ষে পড়াই স্বাভাবিক। পড়াশুনোয় পণ্ডিত জীবনে ব্যর্থ বাবার আদর্শ পরমেশই কতদিন গলা ফুলিয়ে বকে গেছে। তাছাড়া বৌদির সঙ্গে পরমেশের যোগাযোগ জমেই বা কি করে। তবু বলা যায় না —বিচিত্র গতি নাকি তার, সবই ঘটিয়ে ছাড়ে। আঃ! যদি তার জীবনে ঘটত। সুধাকে নিয়ে এই টানাপোড়েন তাকেও ভারি করে তোলে। আমি মুক্তি চাই।

স্পষ্ট বলল, 'কেন তোমরা ত একসঙ্গে থাক।'

'তাতে কি? বড় চালাক। কোন ভাবলেশ নেই।' একটু হেসে বলল, 'বেচাল বুঝলেই ভাইদের সঙ্গে গিয়ে শোয়।'

'বাবা কিছু বলে না।'

'তিনি ত চান আমরা বিয়ে করি। তার এরকম ছাড়া ছাড়া ভাব ভাল লাগে না। আমি রাঁধি তিনি খান।'

'কেন, আগে কোনদিন একসঙ্গে থাকনি?'

'কত!' যেন অনেকদূর থেকে কথা বলছে বৌদি। এই মুহূর্তে পল্টু এসব শুনতে পেলে বৌদিকে খারাপ মেয়েলোক বলবে। সুধা শুনলেও তাই বলবে। কিন্তু প্রমথর তা মনে হচ্ছে না।

'তাহলে?'

'তখন কি আর বুঝেছি! তাহলে কিছুতেই সাবধান হতাম না।' বৌদির হাঁটার বেগ অনেক কমে গেছে।

প্রমথ যেন ইটের ভাঁটি বানাবার পরামর্শ দিচ্ছে—কিংবা সুড়কির কলে কিভাবে ইট গুঁড়ো করতে হয় তাই বোঝাচ্ছে—বলল, 'এবারে যেদিন বিছানায় আসবে সেদিন আর সাবধানী হবে না। কি বল? আটক পড়লে ঠিক ঠাণ্ডা হবে।'

বৌদি এসব কি আর ভাবেনি। কিন্তু সারাদিন পরে পরমেশ যখন আসে তখন পানে, সিগারেটের কাশিতে পরমেশের গলা বুজে আসে—ঘড় ঘড় নিঃশ্বাসে বুকটা মটোরের নাকের মত কাঁপে। তখন জাগিয়ে পরিশ্রম করালে দেখতে না দেখতে ক্লান্ত হয়ে পড়ে পরমেশ। বৌদির মনে হল, কেউ কারও

সুবিধা অসুবিধা বুঝতে চায় না। বুঝেও এগিয়ে আসে না। এই যে ফুলপ্যাণ্ট, পাঞ্জাবী, সার্ট গায়ে সব পুরুষলোক যাচ্ছে এরা কাপড় দিয়ে ঢাকা দয়ামায়াহীন হিংস্র সব লোক। অল্প বয়সে যখন মালাবদল হয় তখন জানত, ভালবাসা জিনিসটা সবচেয়ে সোজা জিনিস। এতে খেলিয়ে ডাঙায় তোলার মত কিছু নেই। এখন পরমেশের বাড়িতে রান্না করে সবাইকে খাইয়ে তারপর নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হয়। কোন্ কৌশলে পরমেশ এসে ধরা দেবে এই ভাবনা ভাবতে গেলে এখন এই তিরিশে বৌদির যেই নিজেকে হিসেবী মনে হয়—তখনই একা একা প্রশ্ন করে, 'আমি কি পরমেশকে ভালবাসি? না, সামনে কি আছে জানিনা বলে পরমেশের মত একজন লোকের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে চাই।'

পরমেশ ওরা থেমে দাঁড়িয়ে প্রমথদের ধরল। বৌদির থিয়েটার আছে। সিনেমার কাগজের কোন্—'দাকে টিকিট দিতে ছুটল. কাছেই বাড়ি।

শঙ্করের কথায় প্রমথ বলল, 'যতই যা বল, নীতিশের সঙ্গে অনেক ব্যাপারে আমার মেলে না—কিন্তু তার লেখা আমার সবচেয়ে ভাল লাগে।'

পরমেশ লণ্ড্রীতে গেল। বৌদির অনেকগুলো কাপড় পড়ে আছে।

কথায় কথায় অবিনাশ চৌধুরীর 'আকাশে বিহঙ্গ' উপন্যাসের কথা উঠল। অনুতোষের ভাল লাগে নি, শঙ্করের না, প্রমথরও না। অথচ আঠারো উনিশে কি মন দিয়ে অবিনাশ চৌধুরীকে পড়েছে এরা সবাই এবং আরও অনেকে। গল গল করে গল্পগুলো বলে যেতে পারে। শঙ্কর বলল, 'ঐ লোকটির লেখা আমাকে এত আচ্ছন্ন করে। অন্তত একসময় ত করত।'

প্রমথ অনেকদিন লেখে না। যা লেখে তা ছাপতে দেয় না। কারণ, কিছুই হচ্ছে না। অবিনাশ চৌধুরীর পুরনো লেখার কথা উঠতে তার সংযম ভেঙে গেল। আজকাল অবিনাশ চৌধুরী কি লেখে তাতে তার আসে যায় না। প্রমথর একটা আশ্চর্য দুর্বলতা আছে অবিনাশের ওপর। বয়েসে বড় হলেও তাকে প্রমথর ছেলেমানুষ মনে হয়— মনে হয় বিপদে পড়তে পারে, এবং তার কর্তব্য বিপদে পড়লেই ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে রক্ষা করা। ছেলেমানুষির মুহূর্তে এতখানি উদার মানুষ দুর্লভ।

যখন অনুচিত ব্যবহার করে কারও সঙ্গে তখন দেখেই বোঝা যায় অভ্যেস নেই—জোর করে কড়া হয়ে করতে হচ্ছে। পুরনো লেখার কথায় প্রমথ অবিনাশের প্রথম উপন্যাসের একটা চরিত্রের কথা তুলে বলল, 'এখন যে আমরা যেসব আধুনিকতার কথা বলি সেসব সুরু সেই ক্যারেক্টারে।' অবিনাশদা যেখান থেকে সুরু করেছিল, কয়েক বছর হল সেখান থেকে আস্তে আস্তে

সরতে আরম্ভ করেছে। আর কিছুদিন পরে তার লেখা (বোধহয় এখনই ফেলা যায়) রাবিশ বলে ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়া যেতে পারে। একথা খুবই কঠিন। তবু সত্যি। অথচ এই লোকটিই আধুনিকতাকে খাঁটি অর্থে ধরতে পেরেছিল—এবং আরও পারত। আগেকার কি সব লেখা আছে—এক একটা গল্প এক একটা হীরে। পড়ে স্তব্ধ হয়ে যেতে হয়। এখন একপাল ফেউ সারাদিন ঘিরে বসে থাকে। একটাও লেখা বোঝে না। স্তাবকতার রসে মজে অবিনাশদা এখন রসস্থ লেবু—মানে পচা লেবু।

হাঁটতে হাঁটতে সিনেমা হল, থানা, পেঁয়াজির দোকান—নিওনের দপদপানো বিজ্ঞাপন। জমিদার বাড়ির থামের মত বিরাট সাবু গাছ পার্কে। শঙ্কর বলল, 'আমাদের কিছু হবে নারে!' হাঁটতে হাঁটতে পার্ক পার হল। অনুতোষ বাবার জন্যে পরিমল নস্যি কিনতে চলে গেল। শঙ্করের রঙ ফর্সা ছিল—এখন একেবারে তামা। হাসতে হাসতে বলল, 'ট্রামটায় ঢিল ছুঁড়বি। দেখ্ বুড়োটা কেমন বসে আছে—যেন ট্রামের মধ্যেই পেচ্ছাব করবে।' বলে দমাদ্দম প্রমথর কাঁধে চড় মারতে আরম্ভ করল। আর সঙ্গে এলোপাথাড়ি হাসি। প্রমথ জানে এর মধ্যে হাসির কোন কারণ নেই। কিন্তু একসঙ্গে আছে—তাছাড়া দুজনেরই বহুদিন (বোধহয় জন্ম থেকেই) কিছু হয় না। হওয়ার না। তাই প্রমথ দলের খাতিরে হাসতে আরম্ভ করল—জোরে, অর্থহীন ভাবে—'পেচ্ছাব করবে ট্রামে! ওঃ! হোঃ! হোঃ! পেচ্ছাব করবে!'—প্রমথ আরও কল্পনা করে নিল—লোকটা যখন পেচ্ছাব করছে তখন ট্রাম কোম্পানীর নোটিশে যে সাহেবটার সই থাকে সেই সাহেব ঐ ট্রামখানার ভেতরে ঢুকে চেঁচিয়ে উঠবে, 'হোয়াট?' লোকটার পেচ্ছাব বন্ধ হয়ে যাবে। 'হোঃ! হোঃ!' শঙ্কর চড় মেরে প্রমথকে থামাল, 'কি হচ্ছে এসব। ইউ আর এ সিটিজেন অব ফ্রি ইণ্ডিয়া।'

শঙ্করের এই ইংরেজি আর সিটিজেনের যুক্তি শুনে আরও হাসি পেল প্রমথর। কিন্তু তখন আর দম নেই। বরং হাঁপ ধরে গেছে। এই মুহূর্তে প্রমথর মনে হল এতক্ষণ হাসির তোড়ে ভেসেছিল। এখন। এখন সে হাঁপাচ্ছে। এখন ক্লান্তি। কোন আশা নেই সামনে। এখন এই সময়টুকু প্রমথ ডায়েরিতে ধরে রাখতে পারবে না। 'টুডে', 'দি নাউ', 'দি ইমিডিয়েট' সব চলে যাচ্ছে। কোন কিছু ধরে রাখার উপায় নেই।

দুটি মেয়ে গেল। শঙ্কর বলল, 'কদ্দিন আওয়াজ দিই না।' তারপর প্রমথকে বলল, 'দিবি?'

প্রমথ রাজীই ছিল। বলল, 'চল্। ঐ মোড়ে দাঁড়িয়ে দিই গিয়ে।'

শঙ্কর অনেক রকম আওয়াজ আবিষ্কার করেছে। আওয়াজের মজা—অন্য লোক মানে বুঝবে না, নিজেরা মানে বুঝে মজা পাবে—অথচ কেউ কিছু বলতেও পারবে না। শঙ্কর এমনিতে আওয়াজ দিয়েই খুশী। বছর চারেক পাঁচেক আগে দুজনে একসঙ্গে আওয়াজ দিত। শঙ্কর সম্ভবত কোনদিন প্রেম করে নি। কিংবা পড়েনি হয়ত। একদিন বহুদূরে একটা মেয়ে দেখতে পেয়ে লাফিয়ে উঠেছিল। 'আমায় চেনে,' বলে প্রথমে রুমাল তুলে উঁচু করে দোলালো, তারপর স্কাউটদের মত পথের মাঝখানে দাঁড়িয়ে হাত দিয়ে সিগন্যাল দিতে লাগল। ভাবখানা, জলে ডুবে যাচ্ছি, লাইফবোট পাঠিয়ে বাঁচাও। মেয়েটি বহুদূর দিয়ে একটু হেসে চলে গিয়েছিল।

সুধাকে একদিন সামনে বসিয়ে চোখ টিপেছিল প্রমথ। সুধার কিছু হয়নি। বলেছিল, 'এসব কর কেন?'

একটা মোটা মত মেয়ে গেল। শঙ্কর বলল, 'গ্রুইৎস্কায়া লাসাঙ্কা।' বলে হাসতে হাসতে ফেটে গেল। নিজেই বলে দিল 'গ্রুইৎস্কায়া' মানে 'গাট্টা-গোট্টা', 'অতিকায়া!' রুশ আওয়াজ দিয়ে শঙ্কর শুরু করল। এসব শঙ্করের আবিষ্কার। 'লাসাঙ্কা' প্রমথ জানে। ওটা আবিষ্কার হয় ফিফটি ফোরে। লাস মানে আলিসান মোটা। তার সঙ্গে রুশ প্রত্যয় 'আঙ্কা'। মানে রুশদের মত দারুণ ভদকা ফদকা মোটকা—ঐ জাতের যে কোন একটা কিংবা সব কিছু। শঙ্কর একা একা মোড়ে দাঁড়িয়ে চেঁচাচ্ছে 'লাসাঙ্কা। লাসাঙ্কা।' একা একা হাসছে। প্রমথও চেঁচাতে যাচ্ছিল। হঠাৎ অনুতোষের দিদিকে দেখে দুজনেই দৌড়ে অন্য ফুটপাতে গিয়ে উঠল। ভাগ্যিস দেখতে পায়নি। দৌড়টা যেন প্রায় প্রাণভয়ে দেওয়া। যারা আওয়াজ দেয় তারা চেনা লোককেই সবচেয়ে বেশী ভয় করে।

খানিক হাঁটতে হাঁটতে শঙ্কর বলল, 'জানিস আমাদের লেখা কেন হয় না। আমরা পরগাছা।' শঙ্কর একথা আরও বলেছে। অবিনাশদাও বলে, 'দেড়খানা গল্প লিখে আজকাল সব লেখক।' নিত্য বলেছিল, 'ঐ সময়টা ট্যুইশানি কিংবা চুরি করলে হয়—লিখে কি লাভ!' অবিনাশদা বলে, 'তোমাদের সঙ্গে সমাজের কোন যোগ নেই।' শঙ্কর বলে, 'আমরা দেশের ভেতরে ঢুকতে পারি না। আমরা আমাদের বিকৃতির কথা লিখি। আমরাই তার পাঠক। উই আর আইল্যান্ডস্! কেউ আমাদের চেনে না।'

আমরা তবে কারা? আমার মত অনেকে আছে। যত দেখেছি তার চেয়েও আরও অনেক বেশী আছে—তাও জানি। আমি আমার এইসব নিয়ে সত্যি। যদি এর নাম বিকৃতি হয় তাও সত্যি। প্রমথ এসব কথায় ঘাবড়ায় না। কিন্তু শংকরের অন্য একটা কথায় প্রমথর ভেতরটা অব্দি বিষণ্ণ অসহায় হয়ে ওঠে।

শংকর বিপ্লব বোঝে না। কিন্তু একটা কথা প্রায়ই বলে, 'সামনে একদিন দেখা যাবে—আমরা নেই। এই যারা কলেজে পড়ে, চাকরী করে, ছেলে হয়, পণ নিয়ে বিয়ে দেয়—এই মধ্যবিত্ত সবাই সরে গিয়ে ভেঙে গিয়ে নতুন শ্রেণীকে জায়গা করে দেব।'

কথাটা শুনে কিংবা ভেবে প্রমথর বুকের মধ্যে 'উঃ!' করে একটা শব্দ হয়। আমি থাকব না—তার চেয়েও ভয়ের কথা আমরা এত করে যা এতদিন ধরে সাজালাম—তার কিছুই থাকবে না। সব অর্থহীন হয়ে যাবে।

যত্ত গাঁজাখুরি। হয় নাকি তা কখনও? বিশ্বাসই করতে চায় না প্রমথ।

'পল্টু এসেছে বুঝি। ভালই ত। কাল একটা প্রোগ্রাম কর—বেশী না দশ টাকার মধ্যে।'

'পল্টুকে বলি।'

'বলার কি আছে। বলবি, ইটারনাল স্টোকার বলেছে। বলবি অনাদি-কালের খালাসির প্ল্যান। তিনজন একসঙ্গে সিনেমায় যাব—আর্মিনিয়ায় বিরিয়ানি—আর, আর যা ইচ্ছে—'

শংকর খালাসিদের রঙের একটা প্যাণ্ট সার্ট পরে। দুটোরই আগে অন্য রঙ ছিল। কেঁচে কেঁচে এই অবস্থা। তামাটে গায়ের রঙ। পায়ে সাধের এ্যাঙ্কেল বুট—মাথায় অনেক চুল। স্বাস্থ্যটাও পেটানো। দেখে মনে হবে জন্ম থেকেই এই প্যাণ্ট সার্ট পরে আছে। মৃত্যুর আগের দিন লণ্ড্রীতে আর্জেণ্ট কাঁচতে যাবে। কাঁচিয়ে গায়ে দিয়ে মরতে হবে। পল্টুর সঙ্গে মেলে বেশ। নিজেকে ইটারনাল স্টোকার বলে। বলে, 'জান পল্টু, ড্রেসটা এমনই—মনে হবে নোয়ার জাহাজের কলঘরে বেলচায় করে কয়লা দেওয়া আরম্ভ করেছিলাম, যেন এখনও দিচ্ছি—শেষ হবে না। কোন দিন শেষ হবে না।' কথাগুলো বলার সময় আকাশে ভালো লাগে এমন সব তারা দিয়ে বানানো ছবি ছিল। পথের দুপাশে অনেক গাছ ছিল। 'কোনদিন শেষ হবে না' বলতে বলতে শংকরের থেমে যাওয়ার কারণ প্রমথ জানে। গলায় কান্না এসে গেছে। গাছ-পালা, পথঘাট সুন্দর লাগলে শংকর আবেগ দিয়ে, দরকার হলে নিজের হীন বর্ণনা দিয়ে কথা বলে যায়—তারপর এক সময় কেঁদে ফেলে। কবিতা লেখা হয়ে গেলেই আবেগ দিয়ে পড়ে।

'দেখি, বলে দেখি পল্টুকে।' দাদা হয়েও নিজের আর শঙ্করের প্রোগ্রামের জন্যে পল্টুকে বলে পয়সার ব্যবস্থা করতে হবে। প্রোগ্রাম মানে বেরিয়ে পড়া, খাওয়া—খানিক ঘোরাঘুরি, তারপর পয়সা যখন ফুরিয়ে আসে তখন গুনে গুনে খরচ করা—মন খারাপ হয়ে যায়। শেষে সেই বাড়িতেই ফিরে আসতে হয়।

॥ তেরো ॥

যে অফিসে ডিরেক্টর মারা গিয়েছিল সেখানে গিয়ে ঘুরে এল প্রমথ। কিন্তু সেখানেও সেই আশ্চর্য ঘটনাটা ঘটল না। অফিসটার ভেতরে খসখসের গন্ধটা খুব সুন্দর। পল্টু সেবারে আসবার পর এক বছরের ট্রেনিংয়ে বোম্বে গেছে। কী করে লোক ভুলিয়ে সাবান স্নো কেনাতে হয় তার ট্রেনিংয়ের ব্যবস্থা বোম্বেতে। মাস দুই বাকি ফিরতে। হাওড়ার যে কোম্পানীতে ইনফরমেশন অফিসারের চাকরীর জন্যে ইন্টারভ্যু দিয়েছিল তারা চিঠি দিয়েছে। তার নাম কোম্পানীর খাতায় রিজার্ভে আছে—দরকার হলেই তাকে ডাকবে। খুব ভাল খবর!

এখনকার এই ফাঁকা ভাবটা তার কেটে যাবে শীগ্‌গির। বোম্বে থেকে ফিরে পল্টু একটানা অনেকদিন কলকাতায় পোস্টেড থাকবে। পল্টু ভীষণ ব্রুডিং টাইপের। মাঝে মাঝে কি বিষণ্ণ সব চিঠি লেখে। শঙ্করের কথার ঢঙের সব কথা ওর চিঠিতে থাকে। 'আমাদের এইসব সাজানো জিনিসপত্র সব মুছে যাবে।' প্রমথর যেন আজকাল মনে হয় যা হওয়ার তাড়াতাড়ি হোক্। তনুদার সব কত তাড়াতাড়ি হয়ে গেল। এই ত সেদিন—। আগে ভাবত পনের বছর কতদিন পরে হয়। হয়ে গেলে টের পাওয়া যায় না। পল্টু জিজ্ঞাসা করেছিল, 'তনুদা কতদিন নেই?' প্রমথ জানে কতদিন নেই।

বড়দা অসুখ হয়ে বিছানায় শুয়েছিল সেদিন। প্রমথর ম্যাট্রিক পরীক্ষা হয়ে গেছে। মেজদা অফিসে। তনুদা কলেজ থেকে এসে খানিক আগে বেরিয়ে

গেল। প্রমথর ভয়ে মা সাইকেল বেচে দিয়েছে। যদি গাড়ি চাপা পড়ে। একটু পরে সন্ধ্যে হবে। তনুদা বেড়িয়ে ফিরে ছোট টেবিলটা বারান্দায় এনে সাজিয়ে পড়তে বসবে। ঘরের মধ্যে গোলমাল। প্রমথর সব মনে আছে।

একটা নীল রঙের বই থেকে সে মাছ ধরবার গল্পটা বের করে পড়ছিল। পাড়ার বিড়ির দোকানগুলোতে আঁচ ধরিয়েছে। পোড়া বিড়ি তামাকের গন্ধ নাকে গেলেই বমি পায়। কে ডাকল। উঁকি দিয়ে দেখল—বিমলদা।

'তনুদা তো বাড়ী নেই। চিনে এলেন কি করে?'

'চিঠি দিয়েছিল।' বিমলদা চলে গেল। যেদিন রেশন আসে সেদিন দুপুর বেলায় একটা মেয়ে এসেছিল। হেসেছিল। 'শোন'। বড়বৌদির মত শাড়ী পরা।

'তুমি ত পানু। তোমার তনুদা কোথায়?'

'বাড়ী নেই ত। মাকে ডাকব?'

'না না। থাকগে।'

'তনুদা এলে বলব? চলে যাচ্ছেন?' রুমাল বের করে মুখ মুছল মেয়েটা।

'না। দরকার নেই।' প্রমথ প্রথমে ভয় পেয়েছিল। তবুও তনুদা বাড়ী এলে বলেছিল।

'চিবুকে কাটা দাগ?'

'হ্যাঁ। কি করে জানলে?' তনুদা সব সময় কথার উত্তর দেয় না। পল্টু বলেছিল, কোনো মেয়ের জন্য তনুদা ওসব করেনি ত? প্রমথ সিওর—তনুদার ওসব বালাই-ই ছিল না। সেই মেয়েটি তাদের বাড়ি এসেছিল সত্যি। তবু তার বিশ্বাস তনুদা প্রেমে পড়েনি কোনদিন।

সন্ধ্যে হলে মার সঙ্গে মেয়ে দেখতে গিয়েছিল মেজদার জন্যে। যখন খেতে বসল তখন ঘড়িতে নটা বাজে। বড়দা বলল, 'তনু এখনও ফেরেনি। কি একখানা পাতলা চাদর মাত্র গায়ে দিয়ে গেল।'

মেজদা বলল, 'দেখ গিয়ে হেঁটে ফিরছে। গাড়ীভাড়া খেয়ে বসে আছে।' তনুদা খায় বেশী।

রাত এগারোটা হয়ে গেল সেদিন। তখনও তনুদা ফেরেনি। মেজদা রিক্সা নিয়ে ন'মাসীর বাড়ী গেল। ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। তনুদা ন'মাসীর ছেলেকে মাঝে মাঝে পড়া দেখিয়ে দিত। বাবা না খেয়ে বসে। তনুদা কলেজ থেকে ফিরে দুধের সর খেয়েছে কি না মাকে আলাদা ডেকে জিজ্ঞাসা করত বাবা। তখন কেউ থাকে না ঘরে। বাবা দরজা ধরে দাঁড়ায়। মা বিছানা পাততে পাততে উত্তর দেয়। বাবা আদর করে ডাকে 'দুদুন্'। মা বলে, 'পৌষ মাসে তনু হল। এগারো পাউন্ড।'

সকালে ঘুম ভাঙল প্রমথর। বাড়ীতে গোলমাল। হরিদা পিসিমার ছেলে। মা তাকে মেদিনীপুর পাঠাচ্ছে। তনুদা তার বন্ধু নিমাইর ওখানে যায়নি তো? তনুদার বই প্রমথ গিয়ে দিয়ে আসত নিমাইদাকে। দরকার পড়লে আনতও। মাঝে মাঝে তনুদা নিজেও যেত। ফিরত একা একা। মোটা গোঁফ—লোক লোক লাগত। কাছে এলে চেনা যেত—তনুদা।

হরিদা হাসপাতালগুলো দেখতে গেল। খোঁজ না পেলে বিকেলের ট্রেনে মেদিনীপুর যাবে। সেজমামা দুপুরে এল। সারা সকাল জিপে করে মাসী পিসি বাড়ী ঘুরে এল। তনুদা নেই। পাশের বাড়ীর টুটুদা বলল, 'তনুবাবু ফেরেননি?'

টুটুদা কলেজে যাবার সময় সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে জিভ দিয়ে ঠোঁট ভেজায়। তনুদা বুকের কাছে ভি অক্ষরের মত সার্টের কলারটাকে চেপে দেয়। রবিবার বিকেলে বোস বাড়ীর রেকর্ড বাজায়।

ঘরে ঠাণ্ডা। বাইরেও রোদ ছিল না সেদিন। বড়দা লাল লেপ মুড়ি দিয়ে ঘুমোচ্ছিল। সন্ধ্যেবেলা হরিদা এল। হাতে একখানা আনন্দবাজার পাকানো। মা বলল, 'দেখ্ একবার মেদিনীপুর গিয়ে।' হরিদা কথা বলল না। ন'মাসি হরিদার দিকে তাকিয়ে থাকল। মাকে বলল, 'চল সেজদি, দুটি খেয়ে নেবে।'

বাবা বৈঠকখানার আশে পাশে ঘুরছিল। বাঁ চোখ লাল। শোয়ার আগে পিচুটি হয়। বড়বৌদি ওষুধ দিয়ে দিল।

হরিদা বড়দার ঘরে।

ন'মাসীমা মা একসঙ্গে খেতে বসল।

হরিদার কাগজখানা পড়তে পড়তে বড়দা উঠে বসল। কাগজখানা ছপ্ করে মেঝেতে পড়ল। মেজদা কুড়িয়ে নিল। বড়দা পালঙ্কের ওপর মাথাটা রেখে বুকের ওপর হাত দিল। ওষুধের শিশিটা, মেজার গ্লাস সবগুলোতে মাছি বসে ছিল। একটু উড়ে গেল শুধু।

তনুদার সেইদিনটা প্রমথ এখন গল্পের মত বলে যেতে পারে। সব মনে আছে তার।

মেজদা এঘরে তনুদার টেবিলে বসে ঢাকনাশুদ্ধ বইগুলো টান দিল। ঝপ্ ঝপ্ করে ভারি বইগুলো মেঝেতে পড়ে গেল। বড়দা ব্রাকেটে ঝুলোনো তনুদার হাফসার্টটা দেখিয়ে হরিদাকে জড়িয়ে ধরল। ফরসা মুখ। নীল দাড়িতে ভর্তি।

প্রমথর হাঁটু আর দাঁত টকাটক নাচতে লাগল। খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়াল। থামে যদি।

ন'মাসীমা খেতে খেতে উঠে এসেছে। এঁটো হাত। বাঁ চোখে একটা অঞ্জনি হয়েছে। 'দিদি এখনও খায়নি। পানু মাঝের দরজাটা বন্ধ করে দে।' প্রমথ দৌড়ে গিয়ে বন্ধ করে দিয়েছিল।

রেবা জেগে উঠল। পল্টুও জেগেছে। বিজু ঘুম ভেঙেই কাঁদতে সুরু করল। তনুদা বাড়ীতে নেই।

'হ্যাপ্', বলে এক ধমক দিতেই পল্টু মাথা অবধি লেপ টেনে কাঁদতে থাকল ভেতরে। ঘরের ডুমটা নীচুতে টানান।

পাখাখানা হাতে নিয়ে পাশে বসে ছিল প্রমথ। 'উঠেছো কি ঠান্ডা।' পল্টুকে মারা যায় না তনুদা থাকলে।

রেবা ঘুম থেকে উঠে বসে মাথার পাশে গোছানো পুতুল নিয়ে একমনে সাজাতে বসল। যেন সকাল হয়ে গেছে।

বাবা বলল, 'তোর মেজদাকে ধর।'

প্রমথ মেজদাকে জড়িয়ে ধরল। 'মা এসে পড়বে।'

বড়দার ঘরের বাতিটা নিভিয়ে দিয়ে মশারিটা গুঁজে দিল। অন্ধকারে মশারির মধ্যে বসে থাকল বড়দা। চোখ খোলা। পথের ইলেকট্রিক আলো মশারির মধ্যে চলে গেছে।

মেজদা খিঁচিয়ে উঠলো। 'জুতোটা দে।'

'আবার কাটা-ছেড়া করে দরকার কি?' নখ দিয়ে গা চুলকে নিল বাবা। 'হরি বলছিল হাসপাতালে যে লোকটা দিয়ে আসে—সে নাকি খড় কাটাই কলের ওখানটায় থাকে।'

ফিতে বেঁধে ফেলল মেজদা। 'পানু চল ত।' প্রমথ খালি পায়েই চলল।

গলির মধ্যে অন্ধকার কলতলা। মেজদা বলল, 'নে ডাক পানু। এই বাড়িটাই ত? ক্লাব ঘরে কি বলল?'

চেনা না থাকলে ডাকা কঠিন।

চাদর দিয়ে মাথা জড়ান একটা লোক দরজা খুলল। খুব কাছে এসে চোখ নীচু করে পানুকে দেখল। তারপর হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠল, 'কেন?' লোকটার মাথা নীচু হয়ে গেছে। তার পেছনে ধোঁয়ায় ভর্তি ঘর। 'এইটে—র বাড়ি?'

'আমি। ব্যাপার কি?'

মেজদা পেছনে ছিল। 'কোন্ বাড়িটা রে?'

'কাল যাকে হাসপাতালে দিয়ে এলেন—আমি তার ভাই।' আলোর মধ্যে গিয়ে দাঁড়াল পানু। এখন বুঝতে পারে প্রমথ—তখনও কিন্তু ঠিক কোনো দুঃখ বা কষ্ট হয়নি তনুদার জন্যে। অন্ধকারে লোকটা ঘরে নিয়ে বসাল। 'আমি ত

ঘাবড়ে গেলাম মশাই।' ঘরের মধ্যে হোমের পোড়া কাঠ, আগুন, কোশাকুশি—গুটোনো আসন। 'মাঠে গেছি বেড়াতে। ছুটি ছিল। লোকটা পাগলের মত জড়িয়ে ধরে কঁকিয়ে উঠল—বাবা মা প্রাণ বাঁচাও। চীৎকার! সেদিন ত ধাক্কা দিয়ে ছাড়া পেলাম।' খানিকক্ষণ থেমে থেমে কাশল লোকটা 'আমারও ধুম জ্বর রাত্তির থেকে। বলা ত যায় না—অপঘাতে কত কি হয়। তাই স্বস্তয়ন করালাম আজ।'

পাগলের মত লোকটা তনুদা। কতদিন প্রমথ ভেবে দেখেছে পাগল হলেও ডাক্তার দিয়ে সারানো যেত। না সারলেও বাড়ীতে থাকত। খুব দুর্দান্ত হলে ঘরে আটক থাকত। জানলায় দাঁড়িয়ে তার দিকে তাকিয়ে হেসে বলত, 'জানিস আমি পাগল। কামড়ে দিতে পারি।' জানলা দিয়ে খাবার দেওয়া হত।

'ছাড়াতে গিয়ে লোকটা টাল খেয়ে পড়ল। আর ওঠে না। দেশলাই জেবলে দেখি খুব জ্বর হলে যেমন কাঁপে তেমন শুয়ে শুয়ে কাতরাচ্ছে। দৌড়ে গিয়ে হাসপাতালে ফোন করলাম। এ্যাম্বুলেন্স এল প্রায় আধঘণ্টা বাদে। হাসপাতালে পৌঁছলে ডাক্তার হাত দেখেই কাপড়ে ঢেকে দিল।'

মেজদা জিজ্ঞাসা করেছিল, 'এসব কটার মধ্যে ঘটে গেছে?'

'কত আর? ধরুন পৌণে আটটা।'

পৌণে আটটা? সেদিন সে সময় প্রমথ মেয়ে দেখতে গিয়ে সন্দেশ খাচ্ছিল। লোকটা বলেছিল, 'আমার কোন দোষ নেবেন না। অন্ধকারে ভয় পেলে আপনিও ফেলে দিতেন ধাক্কা দিয়ে।'

টুটুদা পাড়ার দারোগার সঙ্গে থানায় গিয়েছিল। হরিদাও গেল। যেন কাটা-ছেঁড়া না করে তনুদার শরীর। আলপিন ফুটলেই যা চেঁচাত। ডাক্তার খুঁজে দেখবে বিষ কোথায়।

মা ভাত খেয়ে উঠে বড়বৌদির কাছে পান চাইল। বড়বৌদি মাথাটা দুলিয়ে বুকের ওপর কাত করে রাখল। যাতে মুখ না দেখা যায়। চোখে চোখ পড়ে না তাহলে। মা পান মুখে দিয়ে দাঁড়াতেই হরিদা বলল, 'তনু নেই।'

মা বড়বৌদিকে বলছিল, 'ভাতের ওপর বড় থালাখানা দিয়ে তার ওপর ওজনে ভারি পাথর বাটিটা চাপিয়ে দিবি।' খানিকদূর বলে থেমে গেল। 'কি বললি হরি?'

'তনু নেই।'

মা প্রমথর দিকে, মেজদার দিকে, বিছানা থেকে উঠে-আসা বড়দার দিকে তাকাল। চোখ দুটো থেমে আছে। 'যাঃ!'

বড়দা মুখ ঘুরিয়ে বিছানায় গিয়ে থামল। ন'মাসীমা এসে মাকে ধরল। 'তুই দিদি শক্ত হ।'

মা কাঁদল না। মেজদাকে বলল—'তনু কোথায়? আমি যাব।' টুটুদা ট্যাক্সি থামিয়ে সিঁড়ি দিয়ে ধপ ধপ করে ওপরে উঠে এল। 'মেজদা চলুন।' মা মাঝখানে বসল। এক পাশে প্রমথ, মেজদা সামনে। ন'মাসীমা ওপাশে।

ঠাণ্ডা ভীষণ। ট্যাক্সি সাঁ করে হাসপাতালের গেটে ঢুকল।

ওয়ার্ডেন ওদের হাঁটিয়ে হাঁটিয়ে ঠাণ্ডা ঘরের সামনে দাঁড় করাল। অন্ধকার, এদিকটায় আওয়াজ নেই।

ধাঙড় বলল, 'ভেতরে ত যেতে পারবেন না। কাল সকালে বডি নিবেন। বাতি দিচ্ছি।'

হুট করে সুইচ টিপতেই আলো জ্বলল। মেঝেতে শোয়ানো। মশার কামড়ে ব্যতিব্যস্ত ডেলিপ্যাসেঞ্জারের মত আপাদমস্তক চাদর জড়িয়ে শুয়ে। চাদর খুললে হয়ত দেখবে তনুদা নয়। কিন্তু সত্যি সেদিন তনুদাই শুয়ে ছিল। গায়ের পাচড়াগুলো বিষে শুকিয়ে গেছে একদিনে।

ধাঙড় লম্বা একটা আকশী কোলাপসিব্‌ল্‌ গেটের মধ্যে ভরে দিয়ে ষ্ট্রেচারটা কাছে নিয়ে এল। একেবারে সামনে। মাঝখানে শুধু কোলপাসিব্‌ল্‌ গেট। মা হাতদুখানা ঘসটে দিল লোহায়।

না নিয়ে গেলে সেদিন মা সারারাত গেট ধরে পড়ে থাকত। গলার কণ্ঠায় রুলি হার হাওয়ায় উড়ে-আসা সুতোর মত গলায় লেপটে আছে। ঠোঁট ফাঁক হয়ে নিঃশ্বাস পড়ছে। তাল পাকানো মাটির লেই হয়ে মুখখানা কান্নায় তুবড়ে থেমে আছে। মাথার পাকা চুলের একটা গুছি শুকনো কপাল বেয়ে চোখের ওপর ভাঙা মন্দিরের সেঁটে-থাকা অশত্থঝুরি হয়ে নেমেছে। ট্যাক্সি চলে গেল মাকে, মেজদাকে নিয়ে। হরিদা ডাক্তারের সঙ্গে কথা বলছে। প্রমথকে অফিস ঘরে পাঠান হল। মৃতের পকেটে যা যা পাওয়া গেছে সব নিয়ে যেতে হবে। ডাক্তারের এ্যাসিস্ট্যাণ্ট একখানা নোংড়া রুমাল, আনা ছয়েক খুচরো আর বড় নস্যির ফাইলটা দিয়েছিল।

তারপর দীর্ঘ একটানা অনেকগুলো বছর প্রমথ পাড়ার মড়া পুড়িয়েছে। এক পিসিকে পোড়ালো। পাগলি ছিল। মরবার আগে খুব জ্বালিয়েছে। পোড়াতে পোড়াতে অন্ধকার করে সন্ধ্যে এসে গেল। নাভিটা গঙ্গামৃত্তিকা দিয়ে তাল পাকিয়ে গঙ্গায় ছুঁড়ে দিয়েছিল প্রমথ। সাহস লাগে না এসবে ঠিকই। কিন্তু এখন যে কেমন নরম নরম জায়গা দিয়ে যাতায়াত করে প্রমথ। সুধা যে বলে, 'খরগোসের মত কর কেন তুমি?'

প্রমথ মোটেই খরগোস না। ইন্দিরা যেদিন সামনের ঘর থেকে ঘটক তাড়াতে বলেছিল তার বছর দুই পরে প্রমথ ইন্দিরাদের বাড়িতে গিয়েছিল। সেই একই ঘরে—দেয়ালে দুখানা থাবড়ানো ঘুটের ওপর সিঁদুরের চার পাঁচটা লাইন টানা ছিল। সেদিন আর ইন্দিরার মা ওরকম করে তাকাননি। খবর পেয়ে পাশের ঘর থেকে ফুলো চোখে উঠে এসেছিল ইন্দিরা।

বাক্স খুলে চিঠি দেখালো। 'ওই দেখ ঠিকানা অব্দি লেখা ছিল। ডাকে দেওয়া হয়নি।'

তারপর বসিয়ে এক এক করে শুনলো, কি করা হয়। ইনক্রিমেণ্ট বোনাস এসব দিয়ে সারা বছরের একটা শাঁসালো ছবি দিলাম। বিশ্বাস করেছিল বলে মনে হয় না। করতে পারলে বোধহয় সুখীই হত।

ওপক্ষের সংবাদ।

তক্কে তক্কে বসে থাকতে হয়েছিল। পাত্র ডাক্তার। শুনে নাক মুখ কালি। শেষে ইন্দিরার মা-ই বাঁচিয়ে দিল—বাপের হোমিওপ্যাথি প্র্যাকটিশ ছিল—সেখানেই বসেছে।

শুনে স্বস্তি। শাদা শাদা ওষুধের গুলি—একবার নারকোল রুটির সঙ্গে একশিশি নক্স ভৌমিক সাবাড় করেছিলাম! কিচ্ছু হয়নি।

বাইরে বেরিয়ে কষ্ট হচ্ছিল—বাসে উঠে ভুলে যাওয়া গেল।

প্রমথ জানে—অন্তত এখন জানে, ট্রাম, বাস, কোষ্ঠকাঠিন্য, অ্যাপ্লিকেশনের পোষ্টাল অর্ডার সব কিছু কুলোয় শুকোতে দেওয়া ভেজা আটার রুটি—বিকেলের জল খাবার। খেলে লাবণ্য হয়। ক্ষিদে মেটে—পেট পরিষ্কার হয়—পেট মোটা হয় না—তাছাড়া, সস্তা। আসলে প্রেম ট্রেম কিচ্ছু না।

রোজ শেষ রাত্তিরে ইঁদুরটা বাসি রুটি চুরি করে। বিছানায় শুয়েও হুট-পাট শুনে বোঝা যায় ব্যাপারটা। খুট্—একটা লোভী ইঁদুর আসছে। তারপর এক রকম শব্দ। অবর্ণনীয়। শুনে মনে করতে হবে—একটা ইঁদুর গোগ্রাসে রুটি খাচ্ছে।

সকালে মিটশেফের পাশে কালো গুলি মত দেখে বোঝা যায় ইঁদুরটার কোষ্ঠ পরিষ্কার হয়েছে। ইঁদুরটারও লাভার আছে।

মোড়ের সিগারেটওয়ালা অনেক পয়সা পায়। লোকটা সেদিন দুপুরবেলা কোত্থেকে একটা কোদাল নিয়ে এসে প্রমথর বুকে ছোটোখাটো একটা

গর্ত করল কুপিয়ে কুপিয়ে—তারপর কাঁচা কয়লা দিয়ে আঁচ দিল। ধোঁয়া কমে এলে তার ওপর ঝাঁজরি বসিয়ে বিড়ি শুকোতে দিল। যত বলে 'ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও—লাগছে,'—লোকটা একদম গা করে না। পার্টিশানের ওপরে বসেছে—বলে, 'খাড়াও, জল ছাড়িয়া আসি।' বলে, একটা বিড়ি ধরায়, তারপর হিন্দি সিনেমার তিনতলার কার্নিশে বসে লম্বা ধারায় দুর্গন্ধ ছড়ায়।

গন্ধে, চড়বড় শব্দে ঘুম ভেঙে গেল সেদিন। উঠে বসে মনে হল কতক্ষণ ঘুম হল। এক ঘণ্টা, পাঁচ মিনিট, একশো আঠারো মাইল। সতের গজ লংক্লথের মত ঘুম হল। সেদিন পুরোটাই তাহলে স্বপ্ন!

পল্টু, বীরুয়া, পরমেশ, সুধা—এদের মধ্যে কার সঙ্গে দেখা হলে ভাল লাগবে এখন। ঠিক করতে পারল না প্রমথ। মা ঘুমোচ্ছে। ইনফরমেশন অফিসারের কাজের অবস্থাটা মাকে বলা দরকার। কিন্তু তার আগে জানতে হবে—'আমি কি খরগোস?'

॥ চৌদ্দ ॥

ছোটবেলায় একবছরের পর আরেকবছর আসতে দেরী হত। ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কি একটা কোম্পানী খবরের কাগজের একটা পাতা জুড়ে নতুন বছরের ক্যালেণ্ডার ছেপে দিত। বিজ্ঞাপন আর কি। উনিশশো তেতাল্লিশ শেষ হতেই চুয়াল্লিশের ক্যালেণ্ডার ছাপা হল। প্রমথ তখন হিসেব করে দেখেছিল—আমরা উনিশশো চল্লিশ সাল থেকে চার বছর এগিয়ে গেছি। কিন্তু এখন যে আরও তাড়াতাড়ি বছর শেষ হয়ে যাচ্ছে।

বড়দা সাতদিনের ছুটিতে এসেছিল। যাওয়ার দিন বলল, 'বেশত, কিছু না পার মাসে পঞ্চাশটা টাকা বাড়িতে দাও। নিজের খরচটাও চালিয়ে নেবে।'

খুব যুক্তিপূর্ণ কথা। বড়দা কিছু রেগেও বলেনি। বলল, 'খবরের কাগজটা নিয়ে আয়, দেখাচ্ছি কত বিজ্ঞাপন থাকে। মন দিয়ে লাগলে একটা না একটা বাধবেই।'

বেরোবার তাড়া ছিল। বড়দা চলে গেলে প্রমথ কয়েকদিনের কাগজ নিয়ে

পড়ল। মাঝেরপাড়া হাই ইস্কুল, দিগনগর মালটিপারপাস, রাঙগয়া বেঙগলী হাই,—সব দূরে দূরে। শেষে মনের মত একটা মিলল।

বেলেঘাটার কাছে পুরনো ইস্কুল। সকালের প্রাইমারি সেকসনে—'ভাল প্রমাণিত হইলে দুপুরেও বদলি হইবার সুযোগ আছে।' দুপুরের দিকে সাহস করে ইস্কুলটায় গেল। টিচার্স'রুমে কিছু সংবাদ পাওয়া গেল না। হেডমাষ্টার শুনে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকাল। শেষে প্রমথর আগ্রহ দেখে বলল, 'যান বলাই দত্তর সঙ্গে দেখা করুন।' বলাই দত্তকে পাওয়া গেল। এখানকার মাতব্বর লোক। নতুন বাড়ি তৈরী হচ্ছে, দাঁড়িয়ে দেখাশুনো করছেন। সব শুনে বলল, 'আপনাকে তো নেবো না। গ্রাজুয়েট আছেন, ভাল কিছু হলে চলে যাবেন।' বলাই দত্তকে কিছুতেই রাজি করান গেল না। বলল, 'সে আমি জানি। গোড়ায় গোড়ায় সবাই ওরকম বলে—শেষে ভাল চান্স পেলেই উড়ে যায়।' তার চেয়ে ইণ্টারমিডিয়েট কি ইস্কুল ফাইনাল পাশ করা টিচারও ভাল। লেগে থাকবে। জানে এটা গেলে আরেকটা হতে ভোগ আছে।

শীতের রুদ্দুর। কলেজ ষ্ট্রীটের কাছে বাস থেকে নেমে পড়ল। কফি হাউসে ঢুকে দেখল, চেনা কেউ নেই। অস্পষ্ট চেনা দুচারজন যারা আছে তাদের টেবিলে গিয়ে বসলে কথা বলবে কিনা সন্দেহ। ফিরে যাচ্ছিল, সিঁড়িতে নীতিশ—বলল, 'চল বসবে খানিক, এখন আর যাবে কোথায়?'

বসিয়ে কফি খাওয়ালো। সিগারেট হাতে ধরিয়ে দিয়ে বলল, 'তোমার গল্পটা ভাল হয়েছে।' তারপর কি ভেবে বলল. 'আমি যদি কোনদিন ছবি তুলি তাহলে তোমাকে বিষণ্ণ প্রেমিকের একটা রোল দেব।'

প্রমথ অবাক হল। নীতিশের এসব কি ভাবনা। হবে হয়ত কোথাকার কি মনে এসেছে—তালগোল পাকিয়ে আমার ভাগ্যে এসে পৌঁছচ্ছে। প্রমথ দেখল, এখন এখানে বসে ঠাণ্ডায় কফি খেলেও, এই কফির টেবিল তার কাছে অর্থহীন। বেলেঘাটার সেই বলাই দত্তটা যদি বাগে আসত।

ভাল কথা—একটা কথা মনে পড়েছে। 'তোমার বৌর ছেলে না মেয়ে হল?' প্রমথ প্রায় মাস ছয় সাত পরে প্রশ্নটা করেই বুঝল বোকার মত হয়েছে প্রশ্নটা। এতদিনে হয়ত মুখেভাত হয়ে গেছে। নীতিশ চুপ করে থেকে অলস একটু হাসল। বলল, 'কিচ্ছু না।'

'মানে?'

'কিচ্ছু না।'

আর কথা বলা ঠিক হবেনা। খানিকক্ষণ চুপচাপ কাটল। নীতিশ বলল, সে এখন ডিকসনারির কাজ করছে। শব্দ প্রতি টাকার হিসেব। খুব

পেইনস্টেকিং, তবে খাটতে পারলে পয়সা আছে। পয়সা মানে প্রমথ জানে। দুশো, আড়াইশ, কিংবা জোর তিনশ টাকা। অন্ধকার ঘর—লম্বা টেবিল, আটদশখানা ডিকসনারি আর কড়া আলোর টেবিল ল্যাম্প। খানিকক্ষণ কাজ করলে ঘাড় চোখ দুই-ই টন টন করে।

নীতিশ আর একটা সিগ্রারেট ধরাল।

প্রমথ নিজের সঙ্গে নীতিশের তুলনা করে দেখল। প্রায় একই অবস্থা। তবে নীতিশদের বাড়ি আছে। মারা যাবার সময় নীতিশের বাবা ছেলেদের জন্যে কিছু কিছু ব্যাঙ্কে রেখেও গেছেন। তবে তা কি এতদিনেও আছে?

নীতিশ বলল, 'অবিনাশবাবুর ওখানে যাচ্ছি কদিন। যেতে বলছেন—হয়ত কিছু কাজ হতে পারে।'

নিজের অনেক অসুবিধা। পুরুষলোক পুরুষলোককে জড়ায় না। তবু নীতিশকে তার ভাল লাগে। মাঝে মাঝে খারাপও লাগে। এই ছেলেটার হাসি বড় সুন্দর। নীতিশকে জড়িয়ে ধরলে একটা বিশ্রী ব্যাপার হবে। কিন্তু এমন একটা ভাল লোক, ভাল ছেলে, চাকরী পায় না কেন? না, কলকাতার পুরনো বাসিন্দা—বাড়ি আছে, ভাড়াটে আছে, দূরে কলোনীতে দু-চার কাঠা জমি আছে বলে—খাটতে চায় না—কিংবা, চলে যাচ্ছে বলে চলতে দিচ্ছে। গা করে না বোধহয়।

আজকাল নীতিশ বড় গম্ভীর থাকে। প্রমথর মনে একটা সন্দেহ হল। নীতিশ বলল, 'কিচ্ছু হয়নি।' কিন্তু নীতিশের বৌকে যে ভারি মাসের অবস্থায় দেখে এসেছে। ওষুধ বিষুধের সাহায্য নেয়নি ত? নিয়ে থাকলে খুব অন্যায় করেছে। প্রথমবার—তার ওপর এই তিরিশ বছর বয়েসেও যদি বাবা হতে গেলে ভেবে হতে হয় তাহলে বিয়ে করে কি লাভ? সারি সারি খোয়াড় থাকলেই ত চলে। কথাটা ভেবে নিজেকেই কেমন ঘামে ভেজা একটা সিং মাছ মনে হল প্রমথর। অক্ষম, লেজের ঝাপট দিতে পারে, কাছে এলে খুব বেশী হলে কাঁটা ফুটিয়ে ব্যথা করে দিতে পারে।

নীতিশ বলল, 'চল শিবপুর যাই।'

'কেন? তোমার বৌ এখনও ওখানে?'

'শরীর ত সারেনি। সেই যে তুমি খবর দিয়ে গেলে—শরীরটা খারাপ—তারপরই সব পর পর হয়ে গেল।' নীতিশ চুপ করে ব্যক্তিত্ব অর্জনের কায়দায় গাল ফুলিয়ে ধোঁয়া গিলল, বের করল।

প্রমথ আর জিজ্ঞাসা করল না—কি কি হয়ে গেল। কিংবা প্রমথর ভাবনাটা একেবারেই ভুল হতে পারে।

'বীথি বলেছে তোমাকে ছাড়া আর কাউকে বিয়ে করবে না।' বলে নীতিশ হাসির মত করল।

'বীথি কে?'

'আমার শালী।'

ও হ্যাঁ মনে পড়েছে—আমি একটা মেয়েকে দেখবার জন্যে তোমার শ্বশুর বাড়ি গিয়েছিলাম। সেখানেই ত তোমার বৌ বলল, 'আপনার বন্ধুকে খবর দেবেন ত—আমার শরীরটা খারাপ।' প্রমথর মনে এক ঝটকায় এই কথাগুলো এল। কিন্তু বলল না। হেসে বোঝাতে চাইল, ও বুঝেছি। এসব জায়গায় না হাসলে মনে করতে পারে—দেখো কি গাড়ল, শালী নিয়ে রসিকতা করছি অথচ হাসছে না। শালী একটা রসিকতার প্রসঙ্গ। কিন্তু সত্যিই কি আমাদের হাসবার মত কোনো প্রসঙ্গ আছে।

প্রমথর মনে হল, আচ্ছা আমি যে মেয়েতে মেয়েতে ঘুরে বেড়াই—নিজের আত্মার, শরীরের কোন সম্মান রাখি না—এইসব কি নীতিশ কোনোদিন করেছে। আমি কী একাই এসব করি? না সবাই করে? যদি নীতিশ এসব না করে থাকে তাহলে আমি মানুষ হিসেবে নীতিশের চেয়ে নীচু। নীচু লোক বেছে নিয়ে আমার মেশা উচিত।

বাস স্ট্র্যান্ড রোড পার হয়ে গেল। হাওড়ায় নেমে শিবপুরের বাস ধরতে হবে। নীতিশ আগে জায়গা পেয়েছে। কফিহাউস থেকে শিবপুর ভাল।

সুধা তার খোকনদার সঙ্গে পথে আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। একই বাস থেকে খোকনদা কিটব্যাগ সুদ্ধ লাফিয়ে নামল। বলল, 'তাড়া আছে হিরো। আর একদিন কথা হবে।' যেতে যেতে বলল, 'বহুদিন যাচ্ছ না যে—।' বাস একটা মোটা লোকের জন্য ছাড়তে পারছিল না। স্টার্ট নিয়েই ব্রীজে। প্রমথ তাকিয়ে দেখল, না, নীতিশ খোকনদাকে দেখেনি। দেখলে হয়ত জিজ্ঞাসা করত, লোকটা কে? লোকটা সুধার একরকমের দাদা। সুধা কে? সুধা আমার সঙ্গে পড়ত। আগে ভালবাসার মত ছিল। এখন ভালবাসি না। বাসতে পারি না। বমি আসে। অথচ সত্যি কথা বললে মরে যাবে। মরে যাবে ভেবে আরও বলতে পারি না। বলতে পারি না যখন তখন নিশ্চয় কিছু দুর্বলতা আছে। হয়ত করুণা। কিংবা একসঙ্গে থাকলে মানুষের যে সাধারণ মমতাবোধ থাকে তাই হয়ত। কিন্তু নীতিশকে একথা বললে কি সে বিশ্বাস করবে? এসব কথা ভাবতে গিয়ে ব্রীজে যখন বাস বাঁক নিল, তখন গঙ্গার দিকে তাকিয়ে যেন সন্দেহ হল, গঙ্গায় শ্যাওলা ধরেছে।

শিবপুরের বাসে উঠবার সময়, নীতিশকে শ্যাওলার কথা বলতে হেসে ফেলল, 'খুব প্রতীক ধর্মী সাহিত্য হচ্ছে। নিউফর্ম। গঙ্গায় নেমেছ কোনদিন? চান করেছ?'

প্রমথ জানে নীতিশও গঙ্গায় নামেনি। বরং প্রমথ নিজে মফস্বলে নদীতে সাঁতার কেটেছে। কিন্তু কিছু বলল না। সে তখনও ভেবে দেখল, হ্যাঁ, গঙ্গায় শ্যাওলা ধরেছে—সে পষ্ট দেখেছে। নীতিশ খুব ডেয়ারিং ভঙ্গীতে বাস থেকে নামল—এটা শ্বশুর বাড়ির পাড়া।

'আজ তোমাকে আমার এক ভায়রার বাড়ি নিয়ে যাচ্ছি। শ্বশুর বাড়ি থাক্। রোজ রোজ কি দেখবে হে?'

নীতিশ ঠাট্টা করে বললেও, প্রমথ নীতিশের শালীকেই দেখতে এসেছে।

শ্বশুর বাড়ির কাছেই ভায়রার বাড়ি। ভায়রা ভদ্রলোক সিগারেটের গৃহস্থ। তাক ভর্তি প্যাকেট। আদর করে ঘরে বসাল। বসতে বসতে প্রমথ দেখল, নীতিশের সেই বীথি শালী দুটো বাচ্চাকে পড়াচ্ছে। এই সন্ধ্যেবেলায়? মেয়েদের ব্যাপারে পঞ্চ ইন্দ্রিয়ের পরেও প্রমথর একটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় আছে। ঘড়ির কাঁটার নিয়মে সেই ইন্দ্রিয়টা প্রমথকে দিয়ে পর পর নির্ভুলভাবে সব কাজ করায়।

দেখল একজোড়া লেডিজ স্লিপার পড়ে আছে। একপাটি চটি চেয়ারের পায়া দিয়ে চেপে বসল। মেয়েটার যা পালাই পালাই ভাব। লজ্জা খুব। প্রমথ দেখল, বাড়ির বেরোনোর পথেই সে বসে আছে।

চা-ফা হল।

নীতিশ সরু সিঁড়ি দেখিয়ে বলল, 'ছাদে যাওনা, ঘুরে এস। গরম!'

প্রমথ বুঝল, নীতিশ হয়ত বীথিকে ছাদে পাঠাবে। কিংবা বলে কয়ে ছাদে যেতে রাজি করাবে।

উঃ! কোথায় দিন দিন পৌঁছচ্ছে প্রমথ। পর পর জানে কি হবে—ব্যাপারটা কতখানি সিরিয়াস—তবুও প্রমথ টল টল করে কাঁচের গ্লাস ভর্তি জলের মত কাঁপতে কাঁপতে এগোবেই। কোনো দায়িত্ব নেই।

বীথি সত্যি এল। পরিবেশটা পাড়ার এ্যামেচার ক্লাবের নাটকের মত। আকাশে, ছাদে, পথের বাস, লরি, ঠ্যালাগাড়িতে বেশ চারদিক মিলিয়ে একটা ছবির মত।

বীথি সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে উঁচু দেওয়ালে হাতখানা রেখেছে। প্রমথ তার ওপর হাত রাখল।

বীথির হাতখানা মোটা। আঙুলগুলো পরিশ্রম করা। মুখখানা প্রবীণ

অথচ সুন্দর। কালো ঠোঁট প্রমথর চিরকালের পছন্দ। কনসিডারেট মেয়েরও ঠোঁট কালো ছিল। মুখখানায় একটা পড়ে যাওয়া রাজসিকতা আছে।

প্রমথ হাতখানা ধরে বলল, 'দাঁড়িয়ে থাকবেন নাকি? আসুন বসি।'

বীথি যেমন দাঁড়িয়ে ছিল তেমনই থাকল। দৃষ্টি আকাশ লক্ষ্য করে কি দূরের ট্রাম ডিপোর দিকে তা বোঝা যায় না। প্রমথ এই আলাপে ত আর হাত ধরে টেনে এনে বসাতে পারে না। তাই নিজে গিয়ে ছাদের এক জায়গায় বসল। ভাবখানা—দেখাদেখি কিংবা প্রমথর আলাপের বাধ্যবাধকতায় পাশে এসে যদি বসে। বীথি কিন্তু বসল না। প্রমথ বুঝে নিল—আদব কায়দার ধার ধারে না। অবিশ্যি আদবকায়দা না অসভ্যতা তা বলা মুস্কিল! নীতিশ বলেছিল, 'স্কুল ফাইনাল পাশ করেছে।'

এইভাবে বসে থাকলে খারাপ দেখায়। নিজেই উঠে গিয়ে আবার পাশে দাঁড়াল। হাতের পর হাত রাখবে কি? মুঠ করে ঘুষি পাকানোর মত হাতখানা রেখেছে। প্রমথ দেখল তার চেষ্টা নিয়ে সে নিজেই ব্যতিব্যস্ত। বীথি যেমন ছিল তেমনই আছে। তখন ভীষণ অবসাদগ্রস্ত মনে হল নিজেকে। যেন কোথায় হেরে যাচ্ছে। কিংবা মেয়েটাই অশিক্ষিত—নয়ত বোকা।

এইসব চিন্তা ঝেড়ে ফেলার জন্যে প্রমথ আবার হাত ধরল, বলল, 'জানি আপনার অবাক লাগছে। সেদিন আপনাকে দেখেই ভাল লেগেছে। হেরিকেন নিয়ে সামনে দিয়ে ওরকম চলে গেলেন।'

বীথির মুখে কোনো ভাবান্তর হল না। সব বৃথা যাচ্ছে। প্রমথ বলল, 'এই বিকেলবেলা পড়াচ্ছেন?'

'ট্যুইশানির কোনো সময় আছে নাকি?'

'দীদির বাড়ি ট্যুইশানি?'

'নিজের বোনপো বোনঝিকে পড়াব না।' না তাকিয়েই বীথি কথা বলছিল। প্রমথ দেখল কথাবার্তা আস্তে আস্তে পারিবারিক ঢল নিচ্ছে। অতএব মোড় ঘোরাও। ঝপ করে বীথির হাত ধরল 'আমি আপনাকে তুমি বলব। যা ইচ্ছে মনে করুন। আমি তোমাকে দেখতেই এসেছি। নীচে তোমার স্লিপার চেয়ার দিয়ে আমিই চাপা দিয়ে রেখেছি। যাতে সেদিনের মত না পালিয়ে যাও। তোমার মুখখানা সুন্দর।'

বীথি কোনো উত্তর দিল না। যেমনি দূরে তাকিয়ে ছিল তেমনি থাকল। এমন কি হাতখানাও সরাল না। একটু পরে হাতখানা আস্তে টেনে নিয়ে বলল, 'হয়েছে আপনার? আমি নীচে যাচ্ছি।'

প্রমথ একা ছাদে দাঁড়িয়ে থাকল। নীতিশের বীথি শালী নীচে চলে গেল।

প্রমথ দেখল এসব করে কি হয়। কিছুই হয় না। বীথিকে পাওয়া গেল। পাওয়া মানে হাত রাখা। বীথি ওলকপি, খাটের পায়া কিংবা আলকাতরার মন্ড না। কিংবা বৈঠকখানা বাজারে দাড়িপাল্লায় মেপে বীথি বিক্রি হয় না। এসব পাওয়া না। তার নিজের দেহেরও ত দাম আছে। হাত পা-র জড়াজড়ি ধ্বস্তাধ্বস্তি আসক্তি মাখানো এক ধরনের যুদ্ধ—চট্‌চটে। জান্তব ধ্বস্তাধ্বস্তিতে সাময়িক জড়াজড়িতে আমি স্থির হই। শারীরিক ঘষাঘষিতে পুরুষার্থ অর্থবহ হয়—কিন্তু তবুও আমি নপুংসক। বীথি জানল কি করে—আমি নপুংসক। যদি না জানত, তাহলে নিশ্চয় আমার কথামত পাশে এসে বসত। হাত রাখায় আহত হয়েছে।

আমার চোখে একরকমের মহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আসটে গন্ধ সেই কাজলে—আমার চোখ লাল হয়—আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি। সবার বুকের কাপড় একরকমের মেঘ মনে হয়।

নীতিশের ভায়রা ডাক দিল, 'চা খাবেন না মশাই?'

নীচে চা খেতে নেমে সামনের ঘরেই বসল। নীতিশ নিশ্চয় বলেছে—বীথির সঙ্গে এই ছেলেটির বিয়ে দেওয়া যেতে পারে। ছেলেটি মানে প্রমথ। তাই চায়ের সঙ্গে লুচি, আলুর দম, মিষ্টি—শেষে পানও এল। খাওয়ার সময় দেখল স্লিপার জোড়া ভেতরে চলে গেছে। বীথি ভেতরের ঘরে দাঁড়িয়ে চা খাচ্ছে—ফু দিয়ে জুড়িয়ে জুড়িয়ে। প্রমথ দেখছে দেখে সরে গেল।

সামনের ঘরে আরও একটি মেয়ে। বিবাহিতা। নীতিশ আলাপ করিয়ে দিল। বীথির দিদি। নীতিশের আর এক শালী। ছোড়দি বলে ডাকল নীতিশ।

ছোড়দি কি একটা চাকরীর কথা বলছিল। মুর্শিদাবাদে সালারে। ইস্কুলে পড়াতে হবে। কিন্তু একা একা অতদূর যাওয়া কি ঠিক হবে। তাই নিয়ে কথা হচ্ছিল। এদিকে আবার 'গ্রাম সেবিকার' চাকরীর জন্যে পরীক্ষা দিয়েছে। কি করবে। ছোড়দিকে দেখে প্রমথর মনে হল, এ যে তারই নারী সংস্করণ।

ফেরার পথে কেমন ক্লান্ত লাগছিল। বীথি ছাদে পাশে বসল না কেন? এমন সময় বাসে ছোড়দির কথা বলল নীতিশ। খবরের কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে মাতৃপিতৃহীন অজ্ঞাতকুলশীল এক লোকের সঙ্গে ছোড়দির বিয়ে হয়। লোকটা কাঠের ব্যবসায়ী বলে পরিচয় দেয়। আসলে মেয়ে বিক্রির ব্যবসা ছিল তার। মাস তিনেক পরে পালিয়েছে। ছোড়দি খুব বেঁচে গিয়েছে। বড়দা ভালরকম খোঁজ না নিয়েই বিয়ে দিল!

'আর বিয়ে করল না কেন?'

'সেই স্বামীর কথা ভুলতেই পারে নি।'

'সেই পদবীই রেখেছে?'

'উহ্ু। আগের পদবীতেই ফিরে এসেছে।'

প্রমথ বলল, 'ফিরে বিয়ে দেওয়াই উচিত ছিল।'

নীতিশ কী যেন ভাবছিল, যেন রাগে রাগে বলল, 'কুমারী বোনেরই বিয়ে হচ্ছে না—তার ওপর আবার বিয়ে হওয়া মেয়ের ফিরে বিয়ে!' কিছু থেমে বলল, 'যাওবা হত—ছোড়দিই গোড়া থেকে বেঁকে বসে আছে। দেখনা, আজকাল আবার তোমাদের পাড়ায় এক গুরুর কাছে যাচ্ছে। দীক্ষা নিয়েছে!'

এসপ্লানেডে নামবার আগে নীতিশ বলল, 'আমার সুন্দরী শালীকে ছাদে ত অনেকক্ষণ আটকে রাখলে—কি বললে?'

'কথা বললাম।'

'কি এত কথা—' হাসতে হাসতেই তাকাল।

যা বলেছে তাই নীতিশকে বলল প্রমথ।

'যাঃ! প্রেষ্টিজ গেল। এসব বলতে গেলে কেন? কি ভাববে বলত? প্রথম দিনেই গলগল করে এতগুলো কথা।—'

'হ্যাঁ, হাত ধরে বললাম।'

'হাতও ধরেছ।' দুমড়ে হাসতে হাসতে বলল, 'বেশ করেছ। তাহলে পাগল মনে করবে।'

প্রমথ মনে মনে জানে তাকে পাগল ভাবলে ভাল ভাবা হবে। নীতিশের ভায়রা মাখনবাবু, মাখনবাবুর বৌ—এরা সবাই কত আশা করে যত্ন করল। অথচ প্রমথ আসলে ছোড়দির বরের মত একটা খারাপ লোক। যাদের সম্বন্ধে মেয়েরা দাঁত চেপে বলে, শয়তান। ফেরার সময় এসপ্লানেডে বাস পালটাবার সময় মনে হল, ফেরার পথেও যেন গঙ্গাকে শ্যাওলায় ভর্তি দেখেছে। বাস আর এগোয় না। শীতের গোড়াতেই এত কুয়াশা। কত আর রাত হবে।

॥ পনেরো ॥

প্রমথ অনেকক্ষণ ধরে একটা কথা বলার চেষ্টা করছিল। কিন্তু উপায় নেই। পরমেশ, শঙ্কর, অনুতোষ, বীরুয়া একই সঙ্গে চেঁচাচ্ছিল। দেবুদার চায়ের দোকান। ভাতও চলে। বাইরে জোর শীত। কাল হয়ত কাগজে বেরোবে, 'স্মরণকালে এইরূপ শীত পড়ে নাই।' ভাতের খদ্দেররা আসছে এখন। ওরা এককোণে বসল।

পরমেশ কিছু বলার সময়, মহাকাল, ইটারনিটি, ক্রাই অব দি সোল—এইসব কথা টেনে নামায়। ভরাট গলায় বলতে থাকে। তখন এসব সত্যি বলে মনে হয়। আজও বলছিল।

এমন সময় সুধা এসে ঢুকল। 'এখানে না, বাড়িতে না, লাইব্রেরীতে না —কোথাও পাওয়া যায় না— আট ন মাস একদম অদৃশ্য।'

প্রমথ হাসল। এ কথার কোন উত্তর নেই। আট ন মাস কি বছরখানেক হল দেখা নেই। পরমেশ বলল, 'হ্যাঁ, উনি তোর খোঁজ করছিলেন। বলতে ভুলে গেছি।'

শঙ্কর গম্ভীর হয়ে বলল, 'নাউ উই শুড্ নট ডিসটার্ব দেম।' বলে সবাইকে নিয়ে উঠল। মুখে এমন গাম্ভীর্য, যেন একটা জাতীয় কর্তব্য—সর্বভারতীয় কর্তব্য এইমাত্র সম্পূর্ণ করল। প্রমথ আপত্তি করলেও ওরা উঠে গেল।

সুধা গম্ভীর থেকে বলল, 'তোমাকে পাওয়াই যায় না।'

প্রমথর আজকে ঠিক এই মুহূর্তে নিজেকে যাত্রাদলের সং মনে হল: সে নিশ্চয় একটা সং। কী এমন একটা মানুষ—তাকে আবার পাওয়া। যতক্ষণ বাড়ির বাইরে থাকে ততক্ষণ বাড়ির সবকটা যুক্তিপূর্ণ প্রশ্ন এড়ানো যায় (চাকরী করিস না কেন? বাড়িতে সাহায্য করিস না কেন? ইত্যাদি। তোর বাবা যে এত খাটে—পাশে দাঁড়াবি কবে? প্রশ্নগুলো যেন মা-ই করছে এইভাবে প্রমথ ভেবে নেয়)। কিছুদিন আগে বীথির সঙ্গে ছাদে কথা বলেছে—এখন সুধার কথায় ঠেকা দিয়ে যেতে হবে।

'রেলে ট্রানস্লেটর নেবে। বুঝলে, এ্যাপলিকেশন সব রেডি করেছি। তুমি

শুধু তোমার মার্কসিটগুলো কপি করে দাও। আমি নিজে কাল পাঠিয়ে দেব।'

'এখন যাও ত। দেখা হলেই কেবল চাকরীর কথা। কেন, তোমাকে বিয়ে করতে হবে বলে?'

প্রমথ যেন মুহূর্তের মধ্যে ক্ষেপে উঠেছে। অসম্ভব। চারদিক থেকে রবার টেনে লম্বা করার খেলা আরম্ভ হয়ে গেছে।

মুখে বলল, 'রাত হয়েছে, বাড়ি যাও।'

সুধা রেষ্টুরেণ্ট থেকে বেরিয়ে খানিক সঙ্গে সঙ্গে গেল। তারপর একা একাই বাড়ির দিকে চলল। রাত প্রায় দশটা। এখন বাড়ি ঢুকলে কেউ কিছু বলবে না ঠিক—কিন্তু মুখের দিকে তাকিয়ে থাকবে সবাই।

নৃপেন জামিনে খালাস পেয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেছিল। অজয় দুচারদিন সাক্ষী দিয়ে ক্লান্ত। মামলা টেকেনি। নৃপেন শেষ অব্দি খালাস পেয়েছে। ক-মাস শুধু টানা পোড়েন গেল। সুধার সবচেয়ে অসুবিধা হয়েছে নৃপেনকে নিয়ে। অঞ্জু ছোট মেয়ে। কি আর বোঝে। এখন নৃপেন যেন তাদের বাড়িটা কিনে ফেলেছে। পরিতোষের চেয়ার সারান দরকার—নৃপেন বেতের মিস্ত্রি নিয়ে এল। মাসিক মুদির জিনিসপত্র নৃপেনের দোকান থেকেই আসে। সুধা নৃপেনকে ঠেকাতে পারেনি। চারদিক থেকে নৃপেন ঢুকে পড়েছে। আজকাল তার দিকেও তাকিয়ে হাসে—'কি খবর মেজদি!' সুধা উত্তর দেয়নি। তার যেন কেন নৃপেনকে ভাল লাগে না। কিন্তু নৃপেন এলে অঞ্জু যেভাবে গলে গলে পড়ে—তা দেখলে কেউই আর নৃপেনকে সামনাসামনি কিছু বলতে পারে না। মাঝখান থেকে অজয়টা আরও মরিয়া হয়ে উঠেছে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা বৈঠকখানায় বসে বাবলুকে জ্যামিতি দেখায়—চোখ দরজার দিকে—যদি অঞ্জু আসে। অঞ্জু কিন্তু পারতপক্ষে অজয়ের সামনে পড়তেই চায় না।

বাড়িতে হুলুস্থুলু কাণ্ড। রেবার মেয়েটা বাড়ি মাথায় করেছে। রাত এগারোটা। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছিল প্রায়। এমন সময় ক্রিমির যন্ত্রণায় মেয়েটা চীৎকার করে উঠেছে। বছর দেড়েক বয়েস। মুখে কিছু বলতে পারে না। রেবার বরও থামাবার চেষ্টা করছে। কিন্তু দেড় বছরের দস্যু ভুলবার নয়। প্রমথ বেরোল, যদি ডাক্তারখানা খোলা পাওয়া যায়।

ডাক্তারখানা বন্ধ। ফিরেই আসছিল। কলেজের এক ক্লাসফ্রেন্ড কিছুদিন হল ডাক্তার হয়েছে। সে-ই বাস থেকে নামল। বলতে বলল, 'চল দেখি।' দেখে ওষুধ দিল। মোড়ের মাথার ডাক্তারখানা খুলিয়ে ওষুধ দিতেই মেয়েটা থামল।

মা সাবান জলের মগ দিয়ে গেল। ডাক্তার হাত ধুচ্ছিল।

মা'র গলষ্টোন অনেকদিনের। কদিনই ফিরে ফিরে ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছে। বাড়ির খাটুনি, বয়েস, শোয়ার জায়গার অভাব—সব নিয়ে মা পা থেকে মাথা অব্দি ক্লান্ত। তার ওপর ব্যথা। দেখেই বোঝা যায় মুখ বুজে চুপ করে আছে।

ডাক্তারকে বলতে, বলল, 'হাসপাতালে অপারেশন করাও—একদম সেরে যাবে।'

'কি রকম পড়বে মনে হয় তোর—।'

'দুশো সওয়া দুশো। তার বেশী না।' হাত মুছতে মুছতে বলল, 'আর তোর একবারেও দিতে হচ্ছে না সব। যেমন যেমন দরকার হবে তেমন তেমন দিবি।'

প্রমথ জানে দুশো সওয়া দুশো টাকা সংসারের কোনোদিক থেকেই আলাদা করে বাঁচানো যাবে না। সত্যি, যদি অপারেশনটা হয়ে যেত তাহলে হয়ত মা আরও দশ বছর বেশী বাঁচত।

শেষ বাস চলে গেছে। রিক্সায় তুলে দিয়ে আসতে হল।

সওয়া দুশো টাকা কোথায় পাওয়া যায়। একসঙ্গে পুরো টাকাটা কেউ ধার দেবে? একটা চাকরী থাকলে নিশ্চয় ধার দিত। কিছুদিন আগে আবগারি দারোগার চাকরীটা প্রমথর প্রায় হয়ে এসেছিল। বড়দা বলেছিল, 'এদিক ওদিক করলে মাসে হাজার টাকাও রোজগার করতে পারবি।' কিন্তু চাকরীটা নাকের ওপর দিয়ে চলে গেল।

বাড়িতে সারি সারি মশারি। মাথা উঁচু করে ঢুকতে গেলে মশারির দড়ি মাথায় লাগবেই। বাড়িটা এখন মাটির নীচের সুড়ঙ্গপথের মত। দুই মশারির মাঝের গলি, মশার পিন পিন আওয়াজ, বাথরুমের গন্ধ সব নিয়ে বাড়িটা নরক।

প্রমথ ভেবে দেখল, এখন তার যা বয়েস সেই বয়েসে আর ঘোরাঘুরি ভাল না।

সুধা বা বীথি এদের দুজনের কাছেই প্রমথ একটা কিছু। কিন্তু প্রমথ নিজের কাছে কি? মিথ্যেবাদী, অহংকারী, অলস, পেটুক, ভিত্তিহীন পরগাছা।

আমাকে টাকা যোগাড় করতেই হবে। মা'র অপারেশন আর ফেলে রাখা

যায় না। এইসব ভাবতে প্রমথ দেখল, মা'র অপারেশনের আগে তারই সৎ হওয়া দরকার। পাপীর থেকে সাধু—মৃত্যুর সময় পুরোপুরি সাধু।

রেলের ট্রানস্লেটরের চাকরীটার জন্যে চেষ্টা করতেই হবে।

পরদিন মার্কসীট নিয়ে সুধার অফিসে গেল। সুধা ভাবতেই পারেনি প্রমথ আসবে। প্রমথ বাড়ি থেকে বেরোনোর সময় ঠিক করে রেখেছিল, অবিনাশদার অফিসে গিয়ে গল্পের টাকাটা নিয়ে আসবে। এভাবে খবরের কাগজ শিশি বিক্রি করে গাড়ি ভাড়া চালানো আর যায় না। বেরোনোর সময় ক্লান্ত লাগে। টাকাটা গাড়িভাড়ার জন্যে রাখা যাবে—সিগারেটের দোকানটাও জ্বালাচ্ছে।

সুধার হাতে গম্ভীরভাবে মার্কসীট দিয়ে প্রমথ উঠল।

'চা খেয়ে যাও।'

'না, থাকগে। ঘণ্টা দুই পরে আসছি। টাইপ করিয়ে রেখো।'

প্রমথ চলে যেতে সুধার মনে হল, প্রমথ তাকে ভালবাসে। কাল বলেছি, আজ ঠিক এসেছে। আচ্ছা প্রমথর কোন কথাটা সত্যি। সেই যে কিসব বাজে কথা বলেছিল রেসকোর্সে। সেই বিকেলটা যেন সুধার কাছে সারা গায়ে জ্বরের ব্যথার মত লেগে আছে। ভুলে থাকলে ভোলা যায়—মনে পড়লে দগদগ করে ওঠে। 'আমি তোমায় ভালবাসি না সুধা।' 'আমি বাঁচব না প্রমথ, বাঁচব না প্রমথ, প্রমথ—' 'আমি এইযে যেসব করি—এ আমার অভ্যেস।' তা হয় নাকি কখনও। মানুষ রেলের টাইমটেবেল না। 'এই দেখ আমি পরীক্ষা করছিলাম। চল আজ তোমার বাবাকে পষ্টাপষ্টি সব বলব।' 'কোনটা সত্যি প্রমথ। তুমি কি আমাকে চাও প্রমথ—' আর ভাবতে ইচ্ছে করে না সুধার। তবে এটা ঠিক, সুধা ঠিক বুঝতে পেরেছে, অঞ্জু নৃপেনকে চায়। নৃপেনের চোয়াড়ে চোয়াড়ে মুখটাও আজকাল কিছু নরম হয়েছে। তবু নৃপেনকে তার ভাল লাগে না। খালি মনে হয়—ও বুঝি অঞ্জুকে একদিন মুখে কাপড় গুঁজে দিয়ে তুলে নিয়ে যাবে।

প্রথমে একটু চমকে গেল সুধা। এ কার মার্কসীট? না প্রমথ দত্তর নামই লেখা আছে। সব ক'খানা মার্কসীটই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখল। খাণিকক্ষণ গুম হয়ে বসে থাকল। তারপর কী ভেবে কাগজপত্র সব টাইপিষ্টকে দিয়ে এসে ঘাড় গুঁজে কাজ আরম্ভ করে দিল।

ক্যাশিয়ার টাকা দিল না। 'আপনিই যে প্রমথ দত্ত তার প্রমাণ কি?'

প্রমাণের জন্যে বারিদবাবুর ঘরে গেল। স্টোর্সের বারিদবাবু মুখ চেনেন। আইডেণ্টিফাই করে সই দিলেন। লিখতে লিখতে বললেন, 'কি করা হয় আজকাল?'

'কিছুই না।' বলে খানিক দাঁড়িয়ে থাকল। যদি আর কিছু প্রশ্ন করেন। বারিদবাবু মাথা নীচু করে লিখে যাচ্ছেন। প্রমথ বেরিয়ে আসবার সময় মনে হল বারিদবাবু যেন একবার মুখ তুলে তাকালেন। টাকাটা পেয়ে ধন্যবাদ জানাতে গেল প্রমথ। বারিদবাবু বললেন, 'বোসো।' তারপর ফোন তুলে কি যেন বললেন কাকে। ফোন নামিয়ে বললেন, 'চাকরী করবে?'

এসব ঘটনা গল্পে ঘটে। জীবনে মা বাবা ছাড়া কে আর এগিয়ে এসে সাহায্য করে। প্রমথ বোকার মত চুপ করে থাকল। বারিদবাবু বললেন, 'চল আমার সঙ্গে।'

আর একটা বড় ঘরে নিয়ে গেলেন। এক ভদ্রলোক একখানা বড় চেয়ারে বসে। প্রমথর সম্পর্কে কি সব বলে গেলেন বারিদবাবু। প্রমথর বুক কাঁপছে। কি হয়, কি হয়। কিছুই ত হয় না। হতে হতে ফসকে যায়।

চেয়ারের ভদ্রলোকটি প্রমথর দিকে তাকিয়ে বললেন, 'এ্যাপ্লিকেশন নিয়ে আসবেন।' প্রমথর বুকের মধ্যে তখনও ধপ্ ধপ্ করছে। বারিদবাবুর সঙ্গে বেরিয়ে এল ঘর থেকে। বললেন. 'তাহলে নিয়ে এস এ্যাপ্লিকেশন।'

প্রমথ ভাবছিল, কি ভাবে ধন্যবাদ জানাবে। এমনি যদি মুখে বলে 'ধন্যবাদ', কিংবা 'আপনি যা করলেন—' (কথাটা একেবারে সত্যি হলেও বলতে গেলেই লোকে সন্দেহ করে, ভাবে মিথ্যে কথা বলছে)।

চলেই আসছিল প্রমথ। বারিদবাবু থামালেন। 'এ্যাপ্লিকেশনটা নিয়ে অবিনাশবাবুর সঙ্গে দেখা করবে কিন্তু। তারই ত ব্যাপার।'

হবে—কি হবে না চিন্তা হচ্ছিল। অবিনাশদার কথা ওঠায় চিন্তা গেল। অবিনাশদার হাতে দুএকবার এ্যাপ্লিকেশন দিয়েছে। বলেছেন, 'এখানে কি কাজ করবে।' মনে হয়েছে, হয়ত আমার অসুবিধে বোঝেন না। আমার যে একটা চাকরী কী দরকার—তা বলে বোঝান যায় না। অবিনাশদার হাতে এ্যাপ্লিকেশনটা দিয়ে দেবে। চাকরী তাহলে নিশ্চয় হবে।

খোঁজ নিয়ে দেখল, অবিনাশদা কলকাতায় নেই। সোমবার আসবে।

প্রমথ বেরিয়ে এল। ইস্ অবিনাশদা যদি অফিসে থাকত আজ। হয়ত আজই সব ঠিক হয়ে যেত।

বাইরে বেরিয়ে মনে হল. নিশ্চয় এখানে তার একটা কাজ হয়ে যাবে। হাঁটতে

গিয়ে মনে হল, পায়ের নীচে যদি চাকা লাগান থাকত—তাহলে এক এক ধাক্কায় সে অনেকটা যেতে পারত। নিজেকে একটা হাল্কা নতুন স্কুটারের মত লাগছে। সবচেয়ে ভাল হত পল্টু থাকলে। ভগবান, চাকরীটা যদি হয়ে যায়।

সুধা শুনে বিশেষ আগ্রহ দেখাল না। বলল, 'প্রাইভেট চাকরীর চেয়ে সরকারী চাকরী ভাল।' প্রমথ চুপ করে থাকল। আজ আর রেলের এ্যাপ্লিকেশন ডাকে দেবার সময় নেই। পথে বেশ শীত। দোকানগুলোতে ভীড়। কার্জন পার্কে বসল। বাগানটার অনেকটা ট্রামে খেয়ে ফেলেছে। একথা সেকথার পর সুধা গম্ভীর হয়ে বলল, 'সব টাইপ হয়ে গেছে। মার্কসীট দুকপি করে করেছি।'

মার্কসীটের কথায় প্রমথর খেয়াল হল। তাইত, এইজন্যে সুধা এতক্ষণ গম্ভীর। চাকরীর কথাতেও বিশেষ কিছু বলেনি। প্রমথ বলল, 'আমার নম্বরগুলো দেখেছ সুধা?' গলা এত ভারি হয়ে যায় কেন। সুধা শুধু মাথা নাড়ল।

'আমি মিথ্যে কথা বলেছি।'

'কেন বলেছ?'

এই কেন-র উত্তর দেওয়া এত গ্লানিকর। এত করুণ, এত গভীর। 'সুধা, আমি কোনদিন ভাল রেজাল্ট করতে পারিনি। খুব ইচ্ছে ছিল ভাল রেজাল্ট হয়।' একটু থেমে বলল, 'হয়নি।' ট্রামগুলো এত আস্তে আস্তে যাচ্ছে।

'আমাকে মিথ্যে কথা বললে কেন?' সুধা প্রায় কেঁদে ফেলেছে। প্রমথ এর কি উত্তর দেবে। ইস্কুলে ক্লাশ থ্রীতে থাকতে একদিন প্রমথ সত্যি কথা বলেছিল। সনৎ একদিন 'কু' দিল ক্লাসে। স্যার বললেন, 'কে দিয়েছে?' সনৎ বলল, 'স্যার আমি।' স্যার খুব প্রশংসা করলেন, সত্যি কথা বলার জন্যে। পরদিন প্রমথও ঐ একই ক্লাসে একটা 'কু' দিল। স্যার জিজ্ঞাসা করায় প্রমথ উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি দিয়েছি স্যার।' স্যার চক দিয়ে গোঁফ আঁকলেন প্রমথর মুখে। তারপর দাঁড় করিয়ে রাখলেন পুরো পিরিয়ড। দোষ করে সত্যি কথা বলে প্রশংসা পাবার সখ হয়েছিল। কিন্তু স্যার এত অপমান করল! ব্যাপারটা প্রমথ ভোলেনি। মুখে এসব সুধাকে বলল না। অন্য একটা ঘটনা বলল। 'জান সুধা ম্যাট্রিকে আমি থার্ড ডিভিশন পাই। সে কি বিশ্রী ব্যবহার বাড়িতে। কলেজে ভর্তি হওয়ার সময় প্রিন্সিপ্যাল ক্ষমাঘেন্না করে ভর্তি করে নিলেন। ভাবখানা—আমি একটা দাগী আসামী।' সুধার দিকে তাকাল প্রমথ। মন দিয়ে শুনছে। বলল, 'আর বলব?'

'বলনা।'

'প্রথমদিন ফার্স্ট ইয়ারে ইংরাজির স্যার বললেন, যারা যারা ফার্স্ট ডিভিশন

তারা দাঁড়াও ত। মিথ্যে মিথ্যে দাঁড়ালাম। তখন বইপত্র মলাট দিয়ে টেবিল গুছিয়ে ভাল ছেলে হব বলে ঠিক করেছি। কেউ ধরতে পারল না। কদিন পরে লাষ্ট বেঞ্চের কটা ছেলে আমাকে দেখে চেঁচিয়ে উঠল, ওরে তুই ওখানে কেন? তুই ত আমাদের দলের! চলে আয় এদিকে, চলে আয়—! তোর রেজাল্ট আমরা জানি!' প্রমথ থেমে সিগারেট ধরাল। এখনও মনে আছে—কি ভাবে, ভর্তি ক্লাসের মধ্যে বইখাতা শুদ্ধ ফার্ষ্ট বেঞ্চ থেকে লাষ্ট বেঞ্চে গিয়ে বসতে হয়েছিল। চারদিকে ঢি ঢি! কিছুতেই ভাল রেজাল্ট হয় না প্রমথর। গোড়ায় এত ফাঁকি দিয়েছে। এখন খেটেও কুলোনো যায় না। প্রমথ ঠিক করেছে—সে পুরো একটা সৎ মানুষ হবে। নখ দিয়ে আপেলে দাগ দিলেও যেমন একটা নিষ্পাপ চেহারা থাকে আপেলের—সেও তেমনি হবে। কোণে সুরেন ব্যানার্জীর পাথরের স্ট্যাচু। অন্ধকারে বড় বড় মানুষের আরও অনেক মূর্তি। প্রমথ এরকম বড় হতে পারে না? সুধাকে বলল, 'জান সুধা, একদিন আমার ছবিও লাইব্রেরীতে লাইব্রেরীতে থাকবে। আমিও মাঠের মধ্যে পাথর হয়ে থাকব। নীচে লেখা থাকবে জন্ম সন, মৃত্যুর তারিখ—আর জীবনে কি কি করেছি তার ফিরিস্তি।'

প্রমথকে সুধার প্রথম খুব নীচ মনে হচ্ছিল। এখন কেন যেন আনন্দ হচ্ছে। এতদিন প্রমথকে ভাল ছেলে জেনে একটা ভক্তি ছিল। সে ভক্তি সরে গিয়ে দুঃখ হচ্ছিল ঠিকই—কিন্তু প্রমথ যে এখন তার দলেরই হয়ে গেছে—সুধাও থার্ড ডিভিশনে পাশ করেছে। কিন্তু থার্ড ডিভিশনে পাশ করলেও প্রমথ আলাদা মানুষ। এ অন্ধকারে হয়ত চল্লিশ বছর পরে প্রমথ পাথর হয়ে থাকবে। কিংবা পঞ্চাশ। না. মৃত্যুর কথা ভাবা যায় না। এমন জ্যান্ত লোকটা। আজ খুব কষ্ট হল সুধার। কেন বাজনা শেখা ছেড়ে দিলাম। জানলে কি ভালই হত।

সুধা বলল, 'আজ কিন্তু আমরা ট্যাক্সি চড়ব। না বলতে পারবে না।'

প্রমথ ভাবছিল, সুধা আমাকে খরগোস বলে। আমি সত্যি কথা বলে দেব। যা হয় হবে। যা ইচ্ছে ভাবুক। কিন্তু সুধার কথায় বলল, 'বেশত চল।'

ট্যাক্সিতে উঠে রেড রোডে চক্কর দিল। একটা লরির পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় ধাক্কা লাগত আর একটু হলে। প্রমথ ড্রাইভারকে সাবধান হয়ে চালাতে বলল।

সুধা বলল, 'চালাক না যে ভাবে ইচ্ছে। ভয় কি?'

প্রমথ একটু অবাক হল।

সুধার কিছুতেই ভয় নেই। আজ প্রমথও তার দলে চলে এসেছে। প্রমথকে মুখের দিকে তাকাতে দেখে বলল, 'আগষ্টে এ্যাকসিডেন্ট ইনসিওরেন্স

করিয়েছি। হাত পা গেলে—একেবারে বিছানা নিলে নেট পনের হাজার। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'তখন এ চাকরী লাথি মেরে চলে যাব। ঘরে বসে পনের হাজার—' আরও কিছু বলত সুধা। বলতে পারল না। বাকি কথাটা প্রমথ বুঝেছে—তখন সুধার কাছে প্রমথ থাকবে।

সুধা প্রমথর উরুর ওপর কনুই রেখে কথা বলছিল। গাড়ির ঝাঁকুনিতে সুধার পিঠ ঝুঁকে ঝুঁকে প্রমথর চোখের সামনে দুলছে। পেছনের গদিতে পাশাপাশি বসায় কোমরে কোমরে, দুই উরুতে মাঝে মাঝে লেগে যাচ্ছিল। গাড়ি পি. জি. হাসপাতালে বাঁক নিয়ে নিল। ড্রাইভার তাকাতে প্রমথ যেন কেন বলে দিল, 'শেয়ালদা।' সুধা প্রমথর মুখের দিকে তাকাল। প্রমথ বলল, 'পরমেশদের ওখানে যাই না অনেকদিন—'

'বৌদি এখানে?'

'থাকতে পারে।'

বৌদিই ছিল। পরমেশ নেই।

উবু হয়ে বসে মুখে সাবান দিচ্ছিল। চোখে জলের ঝাপটা দিতে দিতে সুধাকে বলল, 'ভেতরে গিয়ে বস। কেউ নেই।'

সত্যিই কেউ নেই। দুখানা ঘর। বাক্স পত্তরও কম। তাহলে পরমেশের ভাইরা, বাবা সবাই দেশে গেছে নিশ্চয়।

জোরে বলল, 'পরমেশ কোথায়?'

তোয়ালে দিয়ে মুখ মুছতে মুছতে বৌদি এল। 'দেবুদার দোকানে গেছে বোধহয়।' তারপর বলল, 'চা করি? কি বল?'

প্রমথ বলল, 'বৌদি আমরা কিন্তু একটু বসব।' কেন বলল একথা—তা প্রমথ নিজেও জানে না।

বৌদি কি বুঝল কে জানে। বলল, 'ঐ বিছানায় বস না।' তারপর থেমে বলল, 'চা নেই যে। বস পাঁচ মিনিট—শেয়ালদার ওখান থেকে নিয়ে আসছি। আসল ফ্লেভার দেওয়া।' চুল আঁচড়ে চটি পায়ে গলাতে গলাতে বলল, 'কেউ আসবে না। সামনের ঘর ভেজিয়ে দিয়ে যাচ্ছি।' তারপর হেসে বলল, 'চলে যেয়ো না কিন্তু। বসছ ত সুধা?'

সুধা মাথা নাড়ল।

সিঁড়ি দিয়ে বৌদি চলে যেতে প্রমথ সুধাকে বালিশে চেপে ধরল। সুধা বাধা দিল, বলল, 'হচ্ছে কি?' আরও কি বলত সুধা। প্রমথ মুখে চুমু খেয়ে কথা বন্ধ করে দিল। তারপর বুকে, গলায়, কাঁধে। পা টান টান হয়ে গেছে সুধার। প্রমথ গায়ের সার্টটা টেনে খুলে ফেলল। আমি প্রমথ দত্ত। প্রমথ তা জানে। নামের শেষে দত্ত থাকবেই তার। এও সত্যি তার চোখে

একরকমের মাহিষের কাজল আছে। খুব অন্ধকার সেই কাজল। আঁসটে গন্ধ সেই কাজলে—আমার চোখ লাল হয়—আমি যা দেখি তা লালচে। দেখেই ফুলে উঠি। সুধার বুকের কাপড়টা সরিয়ে দিয়ে দেখল এই কাপড়খানা মেঘ না।

আলোর সুইচটা জেবলে দিল প্রমথ। বিকেলেই কেমন অন্ধকার করে এসেছে। বৌদি নিশ্চয় দেরি করে আসবে। যাওয়ার সময় এমন হেসে সি'ড়ি দিয়ে নামছিল। রেবাদের ফাঁকা বাড়িতেও পরমেশ থাকলে এমন হেসে ফেলত। আর একটা চুমু খেল প্রমথ। আজ আর গন্ধ লাগছে না। তবু বুকের মধ্যে ধপ ধপ বন্ধ হয়নি। সুধার বুক কি অদ্ভুত ক্ষীণ। মুখ রেখে ভেতরের শব্দও পাওয়া যায়। ডাবের মুখ খোলার মত জোরে বুড়ো আঙুল দিয়ে চাপ দিয়ে সুধার বুকও বোধহয় ফুটো করে দেওয়া যায়।

সুধাও হাঁপাচ্ছিল। কিন্তু আগের ভীতু ভাবটা আর নেই।

প্রমথ উঠে পড়ার আগে খুব আস্তে বলল,—'কোন ভয় নেই ত?'

সুধা হাসল, 'হোলই বা! তাতে কি?'

প্রমথর সব উত্তেজনা মুহূর্তে থেমে গেল। প্লাবনে ফুলে ওঠা যা কিছু বেশী সব এক কথায় নিস্তেজ হয়ে গেল।

রাগে প্রায় গলা টিপে বলল, 'ঠিক করে বল?' প্রমথর গলা চিরে গেছে।

তখনও সুধা বলল, হাসতে হাসতে, 'হ্যাঁ। হয়েছে কি তাতে।'

প্রমথ উঠে বসল। কোন মানে হয় না—কোন মানে হয় না। চারদিক তাকে ঠেসে ধরছে—ধরবেই। এই পৃথিবী জায়গাটা ভাল না। এখানে হঠাৎ কারও আসাও ঠিক হবে না।

এবারে একদম গলা চিরে গেল প্রমথর। চে'চিয়ে উঠল, 'তুমি বুঝছ না সুধা?'

'জানি!' তখনও সুধার মুখে হাসি! এই মেয়েটাই নরকের দ্বার!

'মানে?'

'বাবা ডাকবে, মা ডাকবে।' এবারে সুধা বেশ গম্ভীর হয়ে বলল।

চায়ের মোড়ক হাতে বৌদি ঢুকল, 'অত চে'চাচ্ছ কেন? এ্যাঁ!'

দুজনকেই থামতে হল। সুধার শেষ কথায় প্রমথ ভেতরে ভেতরে প্রায় ছিন্নভিন্ন হয়ে যাবার যোগাড় হল। অথচ সুধা যেন বৌদির জা। এমনি ভাবে—পাশে বসে চা বানাতে বসল, এখন রান্না ঘরের দরজায় কাঠের ওপরে বসেছে। ভাবখানা—কিছুই হয়নি। স্বামী স্ত্রী ত এরকম করেই। পরমেশ প্রমথ যেন ভাই। এবাড়িতে অনেকদিন থাকে। সুধার মুখে নিস্তেজ হাসি দেখে প্রমথর দুশ্চিন্তা আরও বেড়ে গেল। সৎ হওয়ার কোন উপায়ই নেই।

॥ ষোলো ॥

শোয়ার ঘরেই অবিনাশের টেলিফোন থাকে। কাচের বাক্সে। দরকারী নোটবুক। ওপাশে লিলির চুলের ফিতে। সামনেই ড্রেসিং টেবিল। সবাই ঘুমিয়ে পড়েছে। অবিনাশ আয়নার সামনে দাঁড়াল। ছোট মেয়ে এক সঙ্গে শোবে বলে খাটে গিয়ে শুয়ে আছে। লিলি পরিপাটি করে বিছানা পেতে নিজের মশারি গুঁজে শুয়ে পড়েছে। আয়নায় অবিনাশ মুখ দেখল, বুক কতটা উঁচু তাও দেখল। ঘাড়ে মাংস হয়েছে—পাঞ্জাবীর বাইরে ঢিবির মত বেরিয়ে থাকে। কোণে তার বিভিন্ন বয়েসের ছবি বইর তাকে দাঁড় করান। সবচেয়ে ভাল লাগে ত্রিশ বছর বয়েসের ছবিখানা। চোখ বিষন্ন। মুখ চিবুকে এসে দৃঢ় হয়ে গেছে। তখনই অবিনাশ 'মধ্যনিশি' উপন্যাসখানা লেখে।

প্রমথর খুব পছন্দ ছবিটা। আসলে প্রমথটা গোঁয়ার, বোকা, সৎ, এমনকি আমাকেও হয়ত ভালবাসে। কেমন বুনো পশুর মত একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। ছেলেটা আমার মত। অনেক কষ্ট পাবে জীবনে।

পাঞ্জাবীটা গা থেকে খুলতে গিয়ে মনে হল চানের ঘরে যেমন একদম উলঙ্গ হয়ে চান করা হয় তেমনি উলঙ্গ হয়ে আয়নায় দাঁড়ান যাক না। কেমন দেখায় দেখা যাবে। অন্তত আমার এই দেহটা, চর্বির পরত, লাবণ্যের বিস্তার সব কিছু একা একা দেখি না কেন। আমি ত লিলিকে চাই। এক কথায় বিয়ে করেছি। তখন আমার কিছু ছিল না। কিছু কোনদিন হবে কিনা তাও জানতাম না। ইচ্ছেও ছিল না জানার। তাই বোধহয় অনেক কিছু হয়ে গেছে।

নীলিমা আমাকে চায় বুঝি। চাওয়া মানেটা কি। আমার সঙ্গে কথা বলা? একসঙ্গে টান টান হয়ে শুয়ে জড়িয়ে পড়ে থাকা। তারপর? তারপর কি। আজ নীলিমা আমার সঙ্গে একই ট্যাক্সিতে এসেছে। এ্যারোড্রোমে দেখা। আমি গেছি দিল্লীর মন্ত্রী আসবে বলে। আসেনি। নীলিমা যাবে বোম্বাই। ঝড়, আকাশ খারাপ, কলকাতার পথেও বৃষ্টি। প্লেন আকাশে উঠবে না। ফিরলাম একই ট্যাক্সিতে। হাওড়া অব্দি পৌঁছে দিলে পারতাম।

কিন্তু যাব কেন? আমি সত্যি জানি নীলিমাকে ভালবাসি না। পঁচিশের পরে ভালবাসা হয় না। জানাশুনো হয়। জড়াজড়ি হয়। তাছাড়া নীলিমাকেই বা কষ্ট দেওয়া কেন? নীলিমাও কি ভালবাসে আমাকে? তা হতে পারে না। পঁয়ত্রিশ বছর বয়েসের মহিলা, ভাল গান গায়—নিজের রুচিবোধ আছে—এতদিন পৃথিবীতে আছে—রেলের একটা পুরনো ব্রীজের বয়সী প্রায়—তার পক্ষে স্বভাব পালটে নতুন করে ভালবাসা সম্ভব না।

মেয়েরা চরিত্র ভালবাসে। পুরুষালি স্বভাব। আমার চরিত্র কী? আমি স্বামী, বাবা, ছেলে, বন্ধু, দাদা, অফিসের স্যার, বইয়ের লেখক—লিলির বর, বাজারের অবিনাশ চৌধুরী।

আগে ভাবতাম জীবনে দাঁড়াতে পারব কি। হয়ত এখন পেরেছি। যশ, কিছু অর্থ, আকর্ষণীয় চেহারা, ভদ্রস্থ কথাবার্তা সবই আয়ত্বে এসেছে। কিন্তু তারপর? এই জীবনের আকর্ষণ কোথায়? এখন সত্যি আমাকে গয়না বাধা দিতে যেতে হয় না। বি. এ. পড়তে পড়তে ট্যুইশানি করেছি। আয়রণ মার্চেণ্টের নামে ভারতের বীর চরিত্রদের জীবনী লিখেছি। বইখানার এখন সতের সংস্করণ চলছে। আমি আশি টাকা পেয়েছিলাম।

লিলি জানে না—আগে আমার শেষ রাতে ঘুম ভেঙে যেত। বিছানায় বসে থাকতাম। এখনও সকালে উঠে ভোরের ট্রাম দেখি। রাস্তা ঘাটে লোকজন, দেয়াল দেওয়া ফ্ল্যাট বাড়ির জঙ্গল শহর জুড়ে। ভেতরে শোয়ার ঘর আছে, ঠাকুর ঘর আছে—পায়খানাও আছে—পায়খানায় প্যান আছে। যারা প্যান বানায় সেই কোম্পানীর লোক নিশ্চয় সন্ধ্যেবেলা পাঞ্জাবী পরে বেড়াতে বেরোয়। রবীন্দ্রনাথ পড়ে। বিউটিফুল! প্রাতিভাষিক সত্যে আমরা কেউই মাথা ঘামাই না। সার—আসল সারাৎসারেই আমাদের বিশ্বাস!

তাক থেকে সোনেরিলের ফাইলটা নিল অবিনাশ। ঘুম না হলে খায়। একটা খেল। ফাইল বন্ধ করতে গিয়ে মনে হল সবকটা খাই না কেন। মরে যাব। বেঁচে কি হবে। লিলি? বাচ্চারা।

মনে মনে ইনসিওরেন্স, প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড এইসবের একটা হিসেব করল। ওদের পড়াশুনো, বিয়ে, এমনকি লিলির মৃত্যু অব্দি বেশ চলে যাবে। লিলি আর কতদিন বাঁচবে। বেশী হলে আর চল্লিশ বছর। কিন্তু এখন ত খাওয়া যাবে না এগুলো। অফিসের হিসেব বুঝিয়ে দিয়ে, তারপর। জল খেয়ে শোয়ার আগে আর একটা ট্যাবলেট খেল অবিনাশ।

পরদিন অফিসে যাওয়ার সময় সোনেরিলের ফাইলটা পকেটে নিল। ড্রাইভার সোজা পথে যাচ্ছিল। অবিনাশ গঙ্গার ধার দিয়ে যেতে বলল।

রাস্তাটা এত সুন্দর। রাজ্যপালের বাড়ি। আমার কাছে রাজ্যপাল আর গুরুত্ব-পূর্ণ কিছু না। মৃত্যুর পরে 'পবিত্র সংবিধান' অর্থহীন। ময়দানে এন-সি-সি-র ছেলেরা প্যারেড করে ফিরছে। যুদ্ধ কি হবে? যুদ্ধ বাধলে অবিনাশ চলে যেত। একটা অন্ধ মারামারিতেও বিশ্বাস রাখা যায়। আবেগ আছে তাতে। এই যে ক্রিমিকীট হয়ে বেঁচে আছি—পাকস্থলী, জারক রস, অম্বল হলে পিল খেয়ে ঢেকুর বের করে দেওয়া—ভাবা যায় না, ভাবা যায় না।

আসল কথা অবিনাশ ঠিক জানে না কোথায় যাবে। ফিরবে! এ এক আশ্চর্য অস্থিরতা। কতদিন ভেবেছে—আবার কুড়িতে ফিরে যাওয়া যায় না। বেশ, না হয় পঁচিশে। ফিরে জীবন সুরু করবে। ভাল লাগে না কিছু—কিচ্ছু ভাল লাগে না। এটা কার কবিতা. 'স্থবিরতা কবে তুমি আসিবে গো বল না তা।' কার লেখা? অবিনাশের? না সে ত কবিতা লেখে না। আধুনিক কবির? রবীন্দ্রনাথের? প্রমথ লিখেছে? না সে নিজেই বারে বারে ভেবেছে—এই লাইনটা সে লিখবে। 'স্থবিরতা কবে তুমি আসিবে গো বল না তা।' অবিনাশের মনে হল এ তার নিজেরই লাইন।

সত্যি সোনেরিল ট্যাবলেট এক আশ্চর্য আবিষ্কার। সংবাদে বেরোয় তিনি মস্তিষ্কের রক্তক্ষরণের ফলে মৃত্যুমুখে পতিত হন। কিংবা হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া আকস্মিকভাবে বন্ধ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার মৃত্যু ঘটিয়াছে। ছোট বেলায় শোনা যেত, সন্ন্যাস রোগে তিনি দেহ রেখেছেন। আজকাল আর সন্ন্যাস বলে না কেউ। কিংবা গ্রামের দিকে বলে হয়ত।

লিফট্‌ম্যান সেলাম করল। আজ সকাল সকাল অফিসে এসেছে। একতলা গেল, দোতলা গেল, চারতলাও শেষ হয়ে গেছে। এর পরেই প্রমথ নেমে যাবে। ঘর সাজানো। বেয়ারা জল দেবে। কাগজ দেবে। আজ অফিসের সব বুঝিয়ে দিতে হবে।

ঘটাং করে লিফট্‌ ধাক্কা খেল। সঙ্গে সঙ্গে ভেতরের ফ্যান বন্ধ, আলোও নিভে গেল। একদম অন্ধকার। শীতল বলল, 'কারেন্ট বন্ধ হয়ে গেছে স্যার।'

কিন্তু এ কোথায় এল। দুই তালার মাঝখানে। বিশাল অফিস বাড়ির মেঝে কংক্রিটের গাঁথুনি। চেঁচিয়ে গলা ফাটালেও কেউ শুনতে পাবে না। 'আমি অবিনাশ চৌধুরী এখানে মরে যাচ্ছি— আমায় তুলে বের কর তোমরা। আমি তোমাদের কনফিডেনসিয়াল লিখি।' একথা বললেও কেউ আসবে না। জানবেই না। সবাই ভাববে—লিফট্‌টা বন্ধ হয়ে গেছে মাঝপথে। ইঞ্জি-নীয়ারকে খবর দেওয়া হবে শুধু—তাও কারেন্ট ফিরে না এলে কিছু করার নেই।

খুব রাগ হল শীতলের ওপর। 'দেখে শুনে চালাও না কেন?'

'আমি কি করব স্যার? যেখানে কারেণ্ট বন্ধ—'

একটু যেন তোড়িয়া গলা। না, এখন কিছু বলা ঠিক হবে না। এই অন্ধকারে কে অবিনাশ চৌধুরী, কে শীতল মৃত্যু ঠিক চিনে বের করতে পারবে না। আচ্ছা লিফট হঠাৎ একদমে একতলার চাতাল গিয়ে সেঁধিয়ে যাবে না ত। শীতলকে কথাটা বলতে শীতল অন্ধকারে ভুতের মত হেসে পড়ল, 'ঘাবড়াবেন না স্যার। আমি ত আছি।'

শীতলের খুব ভাল লাগল। লোকটা কী ভীতু।

অবিনাশের মন খারাপ হয়ে গেল। এতদূর সাহস, আমার কথায় ওরকম ঠা ঠা করে হেসে পড়ে উত্তর দেয়। মনের মধ্যে বিঁধে গেল ব্যাপারটা।

রেডিয়াম ঘড়িতে দেখল প্রায় চার মিনিট কংক্রিটের গাঁথুনির গা ঘেঁষে সে আর শীতল শূন্যে ঝুলছে। এবারে সত্যি ভয় হল। গরমে উরু বেয়ে ঘামের ফোঁটা আণ্ডারঅয়ারের কাপড়ে লেগে যাচ্ছে। দুই উরু একসঙ্গে করে দাঁড়াল। এখন আত্মীয় বলতে চেনা দুখানা পা। তাদের একত্র করে দিল অবিনাশ। উঃ! বাঁচি কি করে। লিলিকে মনে না পড়ে তার মনে হল যদি সে এর মধ্যে মরে যায়—মানে লিফট্ যদি একতলার চাতালে গিয়ে সেঁধিয়ে যায় (শীতল জানে কি?)—উঃ! ভীষণ ব্যথা লাগবে।

হঠাৎ আলো জ্বলে উঠল, সঙ্গে সঙ্গে ফ্যানও চলতে সুরু করল। লিফট্ জায়গায় এসে দাঁড়াল।

অবিনাশ ছুটে বেরিয়ে এল। জল খেল। বেয়ারার অপেক্ষা না করে নিজেই ফ্যান ছেড়ে দিল।

খানিক জিরিয়ে এত ফ্রেস লাগছে। প্রথমেই মেইনটেনান্স ডিপার্টমেণ্টকে একটা কড়া চিঠি দিতে হবে। এভাবে ত দুর্ঘটনা হতে পারে। অফিস ইলেকট্রিক সাপ্লাইকে লিখুক। শহরের সব আলো বন্ধ হয় হোক্ কিন্তু অফিসপাড়ার জন্যে যেন আলাদা লোডের ব্যবস্থা হয়। আমরা ত কম বিল দিই না মাসে মাসে। কলম ড্রয়ারেই থাকে। পকেটে রাখা বদারেশন। পকেট থেকে চাবি বের করে কলমটা বের করে চিঠি লিখতে হবে। পকেটে হাত দিতে গিয়ে সোনেরিলের ফাইলটাও পাওয়া গেল চাবির সঙ্গে। ফাইলটা হাতে নিয়ে দেখল অবিনাশ। সাদা সাদা ট্যাবলেট। চাবিটা টেবিলে রাখল—তারপর চেয়ার ছেড়ে জানলার কাছে গিয়ে নীচে তাকাল। অফিসের বিরাট ড্রেন। আস্তে আঙুল দুটো আলগা করে দিল। ফাইলটা মুহূর্তে ড্রেনে।

জানলায় দাঁড়িয়ে অফিস পাড়া এত সুন্দর! অবিনাশের যেন কিছু আনন্দ হল। টেবিলে এসে ডিকসনারি খুলল। কত কড়া করে চিঠিটা লেখা যায়।

একটা যুৎসই শব্দ এইমাত্র মনে এসে হারিয়ে গেছে। এভাবে মরা যায় নাকি? অসম্ভব! বেয়ারাকে ডাকল। পয়সা দিয়ে বলল, 'যা ইচ্ছে তোমার, যে কোন ভাল খাবার নিয়ে এস। পান এনো সংগে।' তাড়াতাড়িতে আজ ভাল করে ভাতও খেয়ে আসা হয়নি।

॥ সতেরো ॥

নীতিশ যখন বলল, 'সরস্বতী পুজোর দিন তুমি খাবে, শালী নেমন্তন্ন করেছে—' তখন প্রমথ জানত নীতিশ মিথ্যে কথা বলছে। কথাটার মানে হল, তুমি আসতে পার। এলে আমার শালীকে দিনের বেলায় দেখতে পাবে।

সার্ট প্যাণ্ট ভাল নেই। জুতোর চেহারা ভীষণ খারাপ। একখানা ভাল ধুতি আছে। কিন্তু পাঞ্জাবী। মেজদার বাড়িতে গিয়ে মেজবৌদিকে বলতে একটা পাওয়া গেল। গায়ে দিয়ে দেখল ঢল ঢল করছে। পাঞ্জাবী ত ঢিলেই পরে। সকালের দিকে বাসের জানলায় পাঞ্জাবীতে কষ্ট হল। যদি ভাল রুদ্দুর ওঠে তবে বেশ আরাম হবে। শিবপুরে বীথিদের বাড়ি যখন পৌঁছল তখন সত্যি কিছু রোদ উঠেছে। সরু গলি, একপাশে গেঞ্জির কল—অন্যদিকে ঢোল বানানোর দোকান। গলিতে থুপ থুপ ময়লা।

কচুরিপানায় ঠাসা পুকুরটার উল্টো দিকে বীথিদের বাড়ি। সরস্বতী পুজোর সকালে এতখানি বাজে পথ পার হতে কার ভাল লাগে। চেয়ে আনা পঞ্জাবী, বাড়ি ফেরার মাপা পয়সা. তারপর যেখানে যাচ্ছে সেখানে যাওয়ার আসল কারণ, দিনের আলোয় বীথিকে দেখা—সবটাই এমন হ্যাংলামি! অবিশ্যি এই দেখার ইচ্ছেটা সব সময় থাকে না। তালকানার মত একদিকে যাচ্ছিল, টেনে ধরে মনে করিয়ে দেওয়ার মত—'তোর ঐদিকে যেতে হবে।'

দরজা ঠেলে ঢুকতে দেখল, বারান্দায় আসন করে নীতিশ বসে আছে। মুখে সেই সুন্দর হাসিটা। কিন্তু প্রথম কথাই বলল, 'হুজ পাঞ্জাবী ইস দিস?' ঢলঢল করছে?'

নীতিশের বৌ কেয়া দরজায় এসে দাঁড়িয়েছিল। মুখে হাসি। প্রমথ নীতিশের কথায় এতটুকু হয়ে গেল। সন্দেহ হল নীতিশ বোধহয় তাকে পুরোপুরি জানে। ধরা পড়ে যাওয়ার একটা লজ্জা হল। রাগও হল।

বারান্দায় কেয়া বাদে আর অন্য কেউ নেই। প্রমথ বলল, 'যাও শালা। তোমার শালীকে বিয়ে করব না।'

আরও কিছু বলত। কেয়া বলল, 'কেন ভদ্রলোককে রাগাচ্ছ? আসুন বসুন। পান খাবেন?' প্রমথ ছেলেমানুষ না। তাকে ভোলানো হচ্ছে নাকি। গুম হয়ে বারান্দায় বসল। ঘরে পুজো হচ্ছে। ধুপের ধোঁয়া। কেয়া, বীথির মেজদি, ছোড়দি ঘরে ঘরে ঘুরছে। ঘর মানে বোধহয় বেশী দূর না—খান দুইতিন ভেতরের দিকে আছে।

ছোড়দি চা দিল। নীতিশের পাঞ্জাবীটা নিয়ে গিয়ে পকেটের দিকটা সেলাই করে নিয়ে এল।

ছোড়দি চলে যেতে কেয়াকে বলল, 'আমি তোমার ছোড়দিকেও বিয়ে করব।' স্বামীর কথায় কেয়ার মন ছিল না। তখন প্রমথকে নীতিশ বলল, 'জান এই মহিলা যা কাজের। সারাটা বাড়ি ইনি সামলান।'

ছোড়দির কপালে সিঁদুর। নীতিশ বলল, 'বিয়ের তিন মাসের মধ্যে লোকটা পালিয়ে যায়।'

কেয়া বলল, 'বড়দার কাণ্ড। কাগজের বিজ্ঞাপন দেখে বিয়ে।'

'পালালো কিরকম?'

'একসঙ্গে মাস তিনেক ছিল। বাড়ি ভাড়া করল। আমার আর ফুলদির হাতে পয়সা দিত। একদিন এরোপ্লেনের টিকিট কাটতে যাচ্ছি বলে আর আসেনি।'

'কোন খোঁজ পাওয়া যায়নি আর?'

নীতিশ বলল, 'সেদিন মেজদির বাড়ি থেকে ফেরার পথে তোমাকে বলিনি সব?'

প্রমথর মনে নেই বলেছে কি না। হয়ত বলেছে। 'কি জানি।'

কেয়া বলল, 'দু একবার ছোড়দা শেয়ালদায় দেখেছে লোকটাকে।' উঠোনে তিল ফুলের মত কি একটা শীতকালের ফুল ফুটেছে। দরজায় গোলাপ রেউড়ি এসে দাঁড়াল। ঘরে যত বাচ্চা ছিল হুড় মুড় করে দরজায় ছুটে গেল। গোলাপরেউড়িওয়ালা আগে পয়সা বুঝে নিচ্ছে। পুজো পুজো চেহারা চারদিকে। প্রমথ এখানে বেমানান। ভালো লোকের ছদ্মবেশে তার এখানে আসা উচিত হয়নি। কেয়া উঠে গেল।

'ছোড়দির আর বিয়ে দেওয়া হল না কেন? চেষ্টা হয়েছিল?'

নীতিশ বলল, 'ছোড়দিই রাজী না। নির্মল চক্রবর্তী নাকি ফিরে আসতে পারে!' তারপর থেমে বলল, 'কুমারী মেয়েরই বিয়ে হয় না—'

'নির্মল চক্রবর্তী লোক কেমন ছিল?'

'কেমন আবার?' হাতের সিগারেট ফেলে দিয়ে বলল, 'আস্ত শয়তান। বিয়ে করে মেয়ে বিক্রি করত।'

প্রমথ মেয়ে বিক্রি করে না। হয়ত কোনদিন করবে। যেভাবে এগোচ্ছে। অথচ আমি সৎ হতে চাই। আমার নাম প্রমথ দত্ত। সৎ হব বলে সুধাকে সত্যি কথা বলেছি। সৎ হতে হতে খারাপ হয়ে গেলাম। সুধা, পরমেশের বৌদি, আমার মধ্যের অন্ধকার মহিষটা সবাই একসঙ্গে সেদিন সব সৎ হওয়ার ইচ্ছে নষ্ট করে দিল।

'আমার শ্বশুরমশায় বেঁচে থাকলে নিশ্চয় মামলা করতেন। নিজেই উকিল ছিলেন।' কী বোকার মত যুক্তি নীতিশের। ছোড়দির বিয়ে নষ্ট হয়ে গেল। নির্মল চক্রবর্তীকে ধরে লাভ! পরিতোষও উকিল। কিন্তু আমি কিছুতেই সুধাকে বিয়ে করতে পারব না। পরমেশের বাড়িতে সেদিন যা হয়ে গেল তারপরেও না।

প্রসাদ খাওয়ার পর খিচুড়ি, বাঁধাকপির তরকারি আরও কি সব দিল। অনেকটা জামাইর মত বাটি সাজালো ছোড়দি। কিন্তু বীথি ত একবারও এল না। গতবছর শীতকালে সুধাদের বাড়ি এমনি জামাইর মত বাটি সাজিয়ে খেতে দিয়েছিল। ইন্টারভ্যু দিতে গিয়েছিল সেদিন। গায়ে সাগরের কোট প্যান্ট ছিল। আজ মেজদার পাঞ্জাবী।

খাওয়া দাওয়ার পর কেয়া পান দিল। বলল, 'আপনার চাকরীর কি হল।' প্রমথ কিছু বলল না গোড়ায়। তারপর বলল, 'হতে পারে একটা।'

'কোথায়?'

'নীতিশকে না বল্‌লে বলি। আমার ত কোথাও কিছু হয় না!'

'বলুন।'

প্রমথ জায়গাটার নাম বলল। শুনে কেয়া বলল, 'ওর মুখে অবিনাশবাবুর নাম শুনি। তাকে বলে আপনার বন্ধুর কিছু একটা হয় না।' প্রমথ এখনও অবিনাশদার দেখা পায়নি। কেয়ার কথায় চুপ করে থাকল। চাকরী না হওয়ার কথা মেয়েদের সঙ্গে বলতে ভাল লাগে না।

পথ দিয়ে ছবিওয়ালা যাচ্ছিল। কেয়া বড়দাকে বলে তাকে বাড়ির ভেতর আনালো। মেলায় যারা ছবি তোলে তাদেরই একদল। ছবি তুলেই বালতির জলে ভিজিয়ে টাটকা টাটকা হাতে দেয়। বাক্স ক্যামেরা। ছবিওয়ালা হাতুড়ি দিয়ে ঠুকে নিল। প্রথমে নীতিশ আর প্রমথ একসঙ্গে ছবি তুলল। দুজনেই পোজ দিয়ে বসল। তারপর চারবোন। ছোড়দি, বীথি. কেয়া আর মেজদি।

ছবি তোলার সময় বীথি একবার তাকাল। প্রমথ ভেবেছিল দিনের আলোয় ভাল করে দেখবে। কিন্তু এ যে দিনের আলোতে দেখতে বেশী লজ্জা করে। এর চেয়ে সেদিনের হেরিকেনের আলোই বেশ ছিল। তবু লুকিয়ে দেখল। মুখখানা সত্যি বেশ সুন্দর। মাথার চুল পাতা কেটে আঁচড়ায় না কেন। কনসিডারেট মেয়ে আঁচড়াত।

নীতিশ পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল। বীথির মা প্রমথর জন্যে উঠোনে একখানা চেয়ার পাঠিয়ে দিল। নীতিশ প্রমথকে বসতে দিয়ে বলল, 'তোমার এখন কদর হবে। আমারও ছিল।' তারপর বলল, 'ভাল কথা, সেদিন ছাদে কি বললে। বেশত আমার শালীর সঙ্গে অনেকক্ষণ ছিলে!'

'বললাম যে সেদিন।'

'ফিরে বলনা শুনি।'

'আমরা সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে ছিলাম। বিশেষ কথা হয় নি।'

'তবু শুনি।'

কি আর শোনার আছে। কথা যা বলার তা ত প্রমথই বলেছে। কেন বলেছে তা জানে না। বলে গেছে এইমাত্র জানে। তবু প্রমথ সব বলল নীতিশকে। নীতিশ শুনে বলল, 'এই-ই! আমার নাম ডুবিয়েছ! এত কথা প্রথমবারে বলতে হয়?'

প্রথমবার আর দ্বিতীয়বার। প্রেম হলে ত এইসব বারে বারে বলে যেতে হয়। পরিশ্রম না করে একবারে প্রমথ সব বলে দিয়েছে। নীতিশের হাসিটা গায়ে লাগল।

প্রথমে পাঞ্জাবী নিয়ে বলেছে—এখন সেদিনকার কথা নিয়ে বলছে। বীথি দিদিদের সঙ্গে চেয়ারে বসে ক্যামেরায় তাকিয়ে আছে। নিজেকে খুব নীচু লাগল। বীথির মুখখানায় হাসি ছাপিয়ে উঠেছে। ভেবেছে, এই লোকটার সঙ্গে তার বিয়ে হতে পারে। এমন পরিষ্কার মুখ। মাঝখানে ভালো মানুষের ছদ্মবেশে নিজেকে প্রমথর দাগী আসামী লাগল। নির্মল চক্রবর্তী আরও চালাক ছিল হয়ত।

বিকেলের দিকে ছায়া করে শীত এল। নীতিশ কেয়াকে নিয়ে মেজদির পাশের বাড়ির ডাক্তারখানায় গেল। সেবার কি নীতিশ ওষুধ বিষুধের সাহায্য নিয়েছিল। মেজদি বাচ্চা দুটোকে নিয়ে যাবার সময় বলল, 'আমাদের বাড়িতে এস তুমি। যখন ইচ্ছে। ঐ ত নীতিশ আসে।'

সবাই চলে গেল। নীতিশ যাওয়ার সময় বলল, 'বস, আমি ফিরবার পথে ডেকে নিয়ে যাব।'

বীথির বড়দার মেয়ে হেরিকেন দিয়ে গেল। ছোড়দি চা দিতে এসে বলল, 'চিনি দেব। দেখত।'

প্রমথ অন্য কথা ভাবছিল। বলে দিল, 'হেরিকেনটা নিয়ে যান।' ছোড়দি নিয়ে গেল। যেখানে দুপুরে ছবি তোলা হল সে জায়গাটা এখন অন্ধকার। কোণে নীতিশের বিধবা শাশুড়ি নাতি কোলে বসে। মাথায় ঘোমটার মত থানের কোণ। এই অন্ধকার ভূতের বাড়িটার ভেতরে বীথি আছে। বীথির ছোড়দির বর নির্মল চক্রবর্তী। আস্ত শয়তান। বীথির মুখে এই এখানে থেকেও কোন রকম কিছুর ছাপ পড়েনি। দুপুরে হাসছিল—পেয়ারা খেয়ে ধরা পড়া মেয়ের মত।

ছোড়দি নিজের চা নিয়ে এসে বসল।

'আপনি পড়ছেন এখন।'

ছোড়দি হাসল। বীথির মা বলল, 'এবারে ইণ্টারমিডিয়েট দিচ্ছে।' একটু বৃষ্টি নামল। সতরঞ্চি সরিয়ে ভেতরের বারান্দায় বসল।

ছোড়দি বলল, 'কোথায় আর দিচ্ছি!' চায়ের কাপ দুটো সরিয়ে রেখে গলা উঁচু করে ডাক দিল, 'এগুলো নিয়ে যা বীথি।'

বীথি এসে নিয়ে গেল। এমন নিঃশব্দে এল, নিঃশব্দে গেল। পায়ে নুপুর থাকলে আসা যাওয়া বোঝা যেত। পায়েব পাতা চোখের মতই দীর্ঘ।

ছোড়দি বলল, 'পুরুলিয়ায় একটা চাকরী পেয়েছিলাম। চলে যাব?' প্রমথ যেন অনেকদিনের চেনা। তার ওপর যেন নির্ভর করা যায়। সে যেন এবাড়িরই কেউ। অন্ধকারে গলা তুলে এমন করে বলল যেন প্রমথ কথার উত্তর দিয়ে টেনে না তুললে অন্ধকারেই ডুবে যাবে ছোড়দি। অনেকদিন পরে কষ্ট হল প্রমথর। বলল, 'কোথায় যাবেন? পরীক্ষা দিন, কলকাতায় একটা কিছু হয়ে যাবেই।'

'কখনো কখনো ভাবি চলে যাব।' তারপর ফিরে বলল, 'যাওয়ার সময় আমার ট্যুইশানিগুলো বীথিকে দিয়ে যাব।'

বীথি নামটা মুখে আনল না প্রমথ। বলল, 'ট্যুইশানি করে নাকি?'

'করে ত। আমার আগের গুলো ত ওই-ই করে। আজ পুজো বলে বেরোয় নি। রোজ চারটের সময় বেরিয়ে যায়—সন্ধ্যে নাগাদ ফেরে।' তারপর থেমে বলল, 'স্কুল ফাইন্যাল দিল গতবার। তখন আমিই দেখেছি ট্যুইশানি-গুলো।'

প্রমথর মুখ দেখল ছোড়দি। অন্ধকারে ছেলেটার মুখ বোঝা গেল না। বীথির সঙ্গে মানাবে। দুপুরে মাথা নীচু করে প্রসাদ খাচ্ছিল।

'কোন ক্লাশ পড়ায়।'

প্রশ্নটায় ছোড়দির লজ্জা হল না। বীথি ঘরের জানলায় বসেছিল। সে কিন্তু ছোট হয়ে গেল শুনে। ছোড়দি ঠিক বলে দেবে। আর ভাল—কদিন এসেই আমার এত খবরে দরকার— ?

'ক্লাস থ্রি দুটো—আর ইনফ্যাণ্ট সব।'

'ভালই দেয় নিশ্চয়।'

এবারে ছোড়দিও মুষড়ে পড়ল। প্রমথ একটা খোঁচা দেওয়ার আনন্দে পর পর প্রশ্ন করে যাচ্ছে। প্রমথর কিছু সামনে নেই। বৃষ্টিতে কেমন একটা গন্ধ বেরোচ্ছে চারদিকে। ওষুধের মত। চেনা চেনা। কোথায় কি ভিজছে। শীতের বৃষ্টি এত বিচ্ছিরি।

ছোড়দি বলল, 'আমরা ত বেশী পাই না। ইণ্টারমিডিয়েট গ্রাজুয়েটদের বেশী দেয়।—এই চলে যায় আর কি।'

'তবু।'

কী নাছোড়বান্দা লোকটা। বীথি জানলা থেকে সরে বসল। সরতে গিয়ে গ্লাসটা পড়ে গেল। সকালের শিউলি পাতার রস ছিল। এখন মেঝে মুছতে হবে আবার।

'বীথি প্রায় চল্লিশ পায় সব মিলিয়ে—দুটো আট টাকার—আর আমি পঞ্চাশের ওপর।'

প্রমথ আর এগোল না। কি হবে এই অন্ধকারের মধ্যে কথা বলে। এ আনন্দে বেশী লাভ নেই। দুপুরটা কি সুন্দর গেল। ছবিওয়ালা যেন মেলার মাঠ থেকে উঠে এসেছিল! প্রমথ ছোট বেলায় একবার মেলায় হারিয়ে গিয়েছিল। শেষে তনুদাই খুঁজে বের করে।

নীতিশের শাশুড়ি উঠে গেছে। ছোড়দি একা বসে। প্রমথ হঠাৎ বলে ফেলল, 'আপনি আর বিয়ে করলেন না ছোড়দি।'

'কী ?'

গলা চিরে গেল ছোড়দির। প্রমথ এই প্রথম ছোড়দি বলে ডাকল।

প্রমথ বলল, 'যার সঙ্গে অল্পদিন ছিলেন তার কথা ভুলে যান।'

এমন অপ্রাসঙ্গিক কথা একমাত্র প্রমথই বলতে পারে—আর এইরকম অন্ধকারে, শীতে, সামান্য বৃষ্টিতে, ওষুধের গন্ধের মধ্যে বারান্দায় এমন কথা বলাও যায়।

'আমার সঙ্গে ত তিনি কোন খারাপ ব্যবহার করেননি।'

এই দেখ। এ যে ভক্তি করে! ছোড়দি বলল, 'সবার মুখে শুনি তিনি খারাপ লোক।'

অনেকক্ষণ থেমে থাকল, 'শুনে আমার কষ্ট হয় প্রমথ—অনেকদিন হয়ে

গেল—একা একা কতদিন আছি।' ছোড়দি আর বলতে পারল না। বলার ইচ্ছে ছিল, 'কোথায় আছি আমি। কতদিন থাকব। কিছু জানি না।'

প্রমথ কথাগুলোয় কেঁপে গেল। নিজের মধ্যের অন্ধকারের ঢাকনাটা যেন হঠাৎ খুলে গেছে। ধোঁয়ার মত গলগল করে অন্ধকার বেরিয়ে এসে সব ঢেকে দিচ্ছে। এই চেনা অন্ধকারটার সামনে দিয়ে বছরের পর বছর প্রমথ দৌড়চ্ছে। যদি পার হয়ে যেতে পারে। যদি অন্ধকার কি মনে করে তাকে ছেড়ে দিয়ে অন্যদিকে রওনা হয়।

বৃষ্টি একটু চেপে এসেছে। খট্ করে নীতিশ দরজা খুলল। একরকম ধাক্কা দিয়েই। 'প্রমথ, চল চল। বৃষ্টি আসছে।'

ছোড়দি বলল, 'বসবে না? কেয়া কোথায়?'

'না চললাম ছোড়দি। মেজদির ওখানে কেয়া থাকবে আজ। কাল সকালে ছোড়দা যেন বাসে তুলে দেয়। এসো প্রমথ।'

একরকম দৌড়েই দুজনে বেরিয়ে গেল। দরজাটা ভেজিয়ে টেনে দিতে দেখল দুপুরের সেই বীথি দরজায় দাঁড়িয়ে। প্রমথকে তাকাতে দেখে নীচু হয়ে গ্লাস প্লেট তুলতে গেল।

সরু ইটের পথ। ওষুধের গন্ধ আরও কড়া হয়ে বেরোচ্ছে। সামনে দিয়ে খাকি সার্ট গায় একদল পুলিশ দৌড়ে গেল।

বাস ধরতে ধরতে নীতিশ বলল, 'আজ পালে বাঘ পড়ল।'

বাসে বসে নীতিশ দেখল প্রমথ বোঝেনি কথাটা। বলল, 'পথে পুলিশ দেখলে না—আবগারি পুলিশ। আজ সব কুটীর শিল্পী ধরা পড়বে।'

'মদ গাজার ব্যাপার?'

'তবে কি। পাড়া শুদ্ধ প্রায় সব বাড়িতেই চোলাই হয়। গন্ধ পাচ্ছিলে না?'

'হ্যাঁ। মদের?'

'তবে কি? সামনের পুকুরটায় বোতল ভর্তি করে ডুবোনো থাকে।'

'বৃষ্টি হলেই গন্ধ বেরোয়!'

প্রমথর মাথায় আর কিছু গেল না। নির্মল চক্রবর্তী আসামের প্লেনের টিকিট কাটতে গেছে। আট বছর হল আসেনি। শিবপুরের বারান্দায় এখনও বৃষ্টি পড়ছে। সৎ হব। হেরিকেনটা এতক্ষণে ভেতরে নিয়ে গেছে বীথি। বীথির পায়ের পাতা দীর্ঘ। পায়ে নুপুর থাকলে বোঝা যেত—আসছে কি যাচ্ছে। সৎ হওয়ার উপায় নেই। একটুর জন্য আবার খারাপ হয়ে গেলাম।

হাওড়া ব্রীজের ওপর স্টেট বাস গুলীর মত ছুটে গেল। সেই ফাঁকে যেটুকু গঙ্গা দেখা যায়—তাও যেন মনে হল শ্যাওলার পুরু সরে ঢাকা পড়ে গেছে।

ব্রীজের বিরাট বিরাট লোহার খিলানের গায়ে ধুলোর মত ঝির ঝিরে বৃষ্টি কি অসহায়ের মত মিশে যাচ্ছে।

কাল সকালে গিয়ে মেজদার পাঞ্জাবীটা দিয়ে আসতে হবে। সত্যি বেশী ঢল্‌ঢলে হয়ে গেছে। বীথি বুঝতে পেরেছে হয়ত—এটা তার নিজের পাঞ্জাবী নয়। বুঝুক্ গিয়ে। আচ্ছা সেদিন ছাদে একবারে সব বলা ঠিক হয়নি। থেমে থেমে কয়েকদিনের বাদে বাদে কথাগুলো ছড়িয়ে দিয়ে বলা উচিত ছিল। এ যেন থিয়েটারের আলোকসম্পাত। ভেঙে ভেঙে আলো ছড়িয়ে দেওয়া। অশিক্ষিত মিস্ত্রিকে শিখিয়ে পড়িয়ে নিয়ে তাকে দিয়ে করানো যায় ইচ্ছে করলে। নীতিশ তাকে শিক্ষিত করে নিতে চায়। পুরুষ জাতির পক্ষ থেকে। প্রমথ অশিক্ষিত হলে বেঁচে যেত। কিন্তু সে যে এমন অশিক্ষিতভাবে শিক্ষিত যে নিজের মনের চেহারা দেখে তার নিজেরই ভয় হয়। বিশ্বাস করার কিছু নেই জীবনে। বীথির পায়ের পাতা চোখের মতই দীর্ঘ। নূপুর থাকলে বোঝা যেত আসছে না যাচ্ছে। এমন নিঃশব্দে সব করে। হাসিতেও শব্দ নেই বোধহয়।

নীতিশ এসপ্লানেডে নেমে গেল।

মা পষ্ট বলে দিল, 'এসব হবে না। বারণ করে দিবি।' বারণ করে কি হবে। আজও সুধা এসেছিল। বাড়িতে ঢুকতেই মা ধরেছে। একটু পরে বাবা বলল, 'ওসব কি?'

বড়বৌদি সব বলল। বিকেলে এসেছিল। সন্দেশ আর চানাচুর নিয়ে। শেষে বলল, 'তোর কাছে কী জরুরী দরকার। অতি অবশ্য দেখা করতে বলেছে।' বড়বৌদি শোয়ার আগে খাবার জল দিতে এসে বলল, 'এত আসে কেন রে?'

প্রমথ বিশেষ কিছু বলতে পারল না।

বাবা বলল, 'তোর যে কোথায় চাকরী হওয়ার কথা ছিল?'

'হবে।'

'কবে?'

ঠিক কি করে বলে কবে হবে। তবে হবে ঠিকই। একটা হওয়া দরকার। অবিনাশদার সঙ্গে দেখাই হচ্ছে না। বারান্দায় দাঁড়িয়ে মনে হল এই ট্রাম বাস ভর্তি কলকাতার একজায়গায় একটা জায়গা আছে—বৃষ্টিতে ওষুধের গন্ধ ওঠে সেখানে। আবগারি পুলিশ দৌড়ে চলে গেল। পায়ের পাতা

দীর্ঘ—নূপুর পায়ে থাকলে বোঝা যেত আসছে না যাচ্ছে। মেলার ক্যামেরা-ওয়ালা, উঠোনে চেয়ার—আমার একটা চাকরী হওয়া একান্ত দরকার।

এই শীতে মা ফ্যান চালিয়ে শুয়ে আছে। পেটের কাপড় খানিকটা অল্লগা করা। বড়বৌদি বার্লি দিল। আবার গলষ্টোনের ব্যথা উঠেছে। প্রমথ খানিকক্ষণ পাশে দাঁড়িয়ে থাকল। কি করবে। হাত দিয়ে ডললে ব্যথা যাবে না। হাওয়া করলেও কমবে না। কিছুদিন ইঞ্জেকসন দেওয়া হয়েছে। তাতেও কমেনি। আসল কথা অপারেশন দরকার।

কি যে করবে। একা ভাবা যায় না। চাকরীও নেই। পল্টু থাকলে একসঙ্গে বুদ্ধি করে কিছু একটা করা যেত।

শুতেই ঘুম এল। গোটা দুই নাগাদ ঘুম ভেঙ্গে গেল। কারখানার ঘণ্টা পিটোচ্ছে কাছেই। প্রথমেই মনে হল মার কাপড় সরানো পেট। ব্যথায় কষ্ট পাচ্ছিল মা। সেদিন বলছিল, 'পেটের মধ্যে লোহার কাঁটা যেন ফুটে আছে—অনেকগুলো।'

আচ্ছা সুধা এল কেন আজ? হঠাৎ প্রমথর মাথা ঝাঁকি দিয়ে উঠল। অসম্ভব। কখনও তা হতে পারে না। কিছুক্ষণ পরে মনে হল—যদি তাই হয়। সর্বনাশ। আর কিছু ভাবতে পারবে না প্রমথ। সে নীচু, বাজে, খারাপ, অসৎ—সব সে—সব।

কেন যে সেদিন পরমেশদের বাড়িতে গেল।

॥ আঠারো ॥

অবিনাশ অফিসে ছিল। প্রমথ এ্যাকাউণ্টসের ঘরে খুঁজে পেল। গায়ে চাদর, দাড়ি কামাতে গিয়ে গাল কেটেছে, চোখে ঘুম—তারপর লাবণ্যমাখানো মুখ। দেখলেই বোঝা যায় ক্লান্তি, আরাম, সুখ, দুশ্চিন্তা সবই আছে অবিনাশদার। প্রমথকে দেখে তার মুখ কিছু উদাসীন হল। প্রমথ একটু অবাক হল। বারিদবাবুর সেদিনকার ঘটনা বলল। 'আপনাকে এ্যাপ্লি-কেশনটা দেব বলে খুঁজে বেড়াচ্ছি।'

'তুমি ত সবই করে ফেলেছ। আমাকে আর দরকার কি?'

এখানে আসবার সময় অনেকখানি আনন্দ ছিল। ভেবেছিল, অবিনাশদার সঙ্গে দেখা হলে সব ঠিক হয়ে যাবে। কিন্তু গোড়া থেকেই যে অবিনাশদা অন্যরকম ভাব দেখাচ্ছে। এরকম ভাবে ত আমার সঙ্গে কথা বলে না। তবু চাকরীর খোঁজে যখন এসেছে তখন জানে, এই জাতীয় বা এর চেয়েও খারাপ কিছু হলে তাকে দাঁড়িয়ে থেকে গায়ে মেখে নিতে হবে।

'বারিদবাবু যখন এতদূর করেছেন—তখন তার কাছেই যাও—তিনিই বাকিটুকু করবেন!' একি অভিমান থেকে বলা হচ্ছে। মানে আমি থাকতে বারিদবাবুর কাছে গিয়েছ কেন। কিংবা আমার চেয়ে বারিদ আপন হল। বারিদবাবু আপন না। কিন্তু তিনি নিজে থেকে ডেকে নিয়ে গিয়ে চাকরীর জন্য চেষ্টা করেছেন—আজকাল এই কাজটুকু কজন করে? আর আপনাকে ত এ্যাপলিকেশন দিয়েছি দু'বার। বলেছেন—পরে দিও, এখন কোন চান্স নেই। এত কথা মুখে বলা যায় না। কিন্তু আত্মীয়ের মত নিজের লোকের কাছে আশা নিয়ে এসে ধাক্কা খেলে কষ্ট হয়। প্রমথর অনেক কিছু বলার থাকলেও একটা কথাও বলতে পারল না। অবিনাশদা বলল, 'চল আমার ঘরে।' প্রমথর এভাবে দাঁড়িয়ে থাকা দেখে অবিনাশ ব্যাপারটা নিজের ঘরে নিতে চায়।

ঘরে ঘরে লোকজন বসে—টেবিলে কাচের গ্লাসে জল। পথ দিয়ে ঘরে যাওয়ার সময় প্রমথর একটা জিনিস মনে হল। বারিদবাবুকে অবিনাশদা আগে বারিদদা বলে ডাকত। প্রমথ নিজের কানে শুনেছে। এখন মানে শেষবারও যেদিন এখানে এসেছিল, কথায় কথায় অবিনাশদা বারিদবাবুর কথা উঠতে বারিদবাবুই বলেছিল—বারিদদা নয়। দাদা থেকে বাবু—তবে কি কোনরকম ঝগড়া বা মন কষাকষি চলছে। থাকলে থাকবে। তার কাছে দুজনই ভাল। আর সবচেয়ে আগে তার একটা চাকরী দরকার। মুখে বলল, 'বুঝছেন না অবিনাশদা, আগে আমার একটা চাকরী দরকার।'

কিন্তু অবিনাশদার কয়েকটা কথা শুনে মনে হল—প্রমথকে সে বারিদবাবুর লোক ভেবেছে। এত অসুবিধার মধ্যেও প্রমথর হাসি পেল। দুঃখও হল। অন্য কেউ না—শেষ পর্যন্ত অবিনাশদার কাছে এসে বোঝাতে হবে—আমার একটা চাকরী দরকার। সেকথা ত বুঝছেই না—তার ওপর আবার মনে করছে —আমি অমুকের দলের। তাহলে এখানে দল আছে।

এ অবস্থায় কিছু অপমানও মনে হল। আমি এসেছি চাকরীর জন্যে। তুমি আমার দরকারটা ভাল করেই জান। তারপরেও যদি ক্ষমতা থাকে আর আমাকে উপযুক্ত মনে কর তবে আমার জন্যে কর। কিন্তু আমাকে নিয়ে টানাটানি ভাল লাগে না।

নিজের ঘরে চেয়ারে বসে অবিনাশদা বলল, 'দুশো টাকার একটা চাকরীর কি দরকার হল তোমার। আমি ত বুঝি না।'

'আপনি বুঝবেন কি করে। আমি যে আপনার কাছে আসি—গাড়ি ভাড়া যোগাড় করতেই শেষ হয়ে যাই।'

'কেন?'

'কোথায় পাব বলুন? কে দেবে?' তার পর থেমে বলল, 'সরকারী চাকরীর আর বয়েস নেই আমার। কোন্ দিকে যে কি হবে তাও জানি না।'

প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল অবিনাশ। তারপর হেসে বলল, 'নাও সিগারেট খাও।'

'না, চলি।'

'বসবে না।'

'আমার একটু যেতে হবে অবিনাশদা।' এখানে থেকে কি হবে।

'বেশ যাও।' তারপর বলল, 'আচ্ছা আমি দেখব।'

প্রমথ চলে যাচ্ছিল। থেমে বলল, 'আমি কোন দলাদলির কথা জানি না অবিনাশদা। আমি জানি আমার একটা চাকরী একান্ত দরকার। আপনি বুঝতে পারছেন না অবিনাশদা?'

অবিনাশ প্রমথর দিকে তাকিয়ে হাসল, মাথা নাড়ল। সেই ছেলেমানুষি ভঙ্গিটা এখন অবিনাশদার মুখে। এই সময় তাকে পবিত্র লাগে।

কিন্তু পবিত্র দিয়ে হবে কি। আমার দরকারটা অবিনাশদা বুঝতে চায় না। হয়ত অসুবিধা আছে। আমারই বিরক্ত করা ঠিক হয়নি। প্রমথ এইসব ভেবে মুষড়ে পড়ল। সিঁড়ি দিয়ে নেমেই যাচ্ছিল। এমন সময় বেয়ারা দৌড়ে এল—'ডাকছেন আপনাকে।'

ফিরে আসতে বলল, 'আচ্ছা নীতিশকে দেখছি না ত অনেকদিন।'

'কলকাতার বাইরে কাছেই কোথাও গেছে। কোন্ স্কুলে নাকি একজন নেবে—'

অবিনাশ হাসল। 'কোথায়, নীতিশ ত চাকরী চাকরী করে না?'

'নীতিশেরও কিন্তু খুব দরকার অবিনাশদা।'

'কি করে বুঝলে?'

'ওর বৌ বলছিল—শুনি অবিনাশবাবুর সঙ্গে আলাপ আছে। এত লোকের হয়—আপনার বন্ধুর একটা হয় না!'

কথাটা শুনে অবিনাশ গম্ভীর হল। প্রমথর খুব লজ্জা হল। একজন ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা করতে এসে তাকে নিজের কথা বলে বিব্রত করার

পরেও বন্ধুর প্রয়োজনটা শুনিয়ে দিয়ে একেবারে ক্লান্ত করে ছেড়েছে। দাঁড়াতে খারাপ লাগল। 'চলি' বলেই চলে এল।

এখন বাড়িতে গেলে পষ্টাপষ্টি বলা যাবে না—'অবস্থাটা কি দাঁড়িয়েছে।' এক পরমেশের অফিসে যাওয়া যেতে পারে। কিন্তু পাওয়া যাবে কিনা সন্দেহ। শেষে দেবুদার দোকানে গিয়ে হাজির হল প্রমথ। অসময়ে কেউ আসেনি। এক কাপ চা খেয়ে বেরিয়ে আসতে বীরুয়ার সঙ্গে দেখা।

'এত সেজেগুজে চললি কোথায়?'

'মাইরি আজ দেখা হবে।' তারপর নিজের ধুতি পাঞ্জাবির দিকটা দেখিয়ে বলল, 'কেমন দেখাচ্ছে রে?'

সোয়েডের কাবলি, ভাল ধুতি পাঞ্জাবী, ঘাড়ে কিছু পাউডার—তার ওপর হাতে ঘড়ি, চোখে গগল্স্ বুকপকেটে ফাউনটেনপেন। বাঁ পকেট থেকে রুমাল উঁকি দিচ্ছে। প্রমথ জিজ্ঞাসা করল, 'বাড়িতে দাড়ি কামিয়েছিস?'

'হুঁ। কেন?'

'একটু কেটে গেলেও ভালই হয়েছে।'

বীরুয়া খুশী হল। বলল, 'মেয়েটা বড় সুন্দর রে। বাপের পয়সা আছে। আমার মত একটা ক্লার্ককে ভালবাসল?' কথাটা বলে বীরুয়ার গর্ব হয় অন্যের কাছে—আবার নিজের কাছেও নিজেকে করুণ লাগে। বীরুয়ার মনের এই ভাবটা প্রমথ জানে। তাই আর কথা বাড়াল না।

অন্য কথা বলল, 'বীরুয়া, তোকে লোক লোক দেখাচ্ছে রে!'

'মানে?'

লোক বলতে প্রমথর একটা ধারণা আছে। অবিবাহিত, পঁয়ত্রিশের নীচে বয়েস—ভাল জামা কাপড় পরণে—সুন্দর করে দাড়ি কামানো—ট্রামের পেছন দিকে যারা বসে—পায়ে পা লাগলে যারা 'সরি' বলে তারাই হল লোক। ভীড় দেখে দাঁড়ায় না—বাসে ট্রামে বই পড়ে—বাড়িতে যে ঘরে থাকে সেঘরে আলাদা কুজো, টেবিলে দামি বই—দেয়ালে প্রিয় নেতা কিংবা কবি—আর তাকে দাড়ি কামানোর সেট আর জলে ভেজানো ছোলা ভর্তি কাঁচের গ্লাস—এইসব নিয়ে লোক। আর হ্যাঁ, পায়ে পাম্প-সু থাকবে। প্রমথ জানে, নিজেরাও আজকাল আস্তে আস্তে লোক হয়ে যাচ্ছে।

এইসব কথা বীরুয়াকে বলতে বীরুয়া হেসে বলল, 'পাগলা! তোর মাথায় খেলেও অনেক!' তারপর বলল, 'দেখ্‌তে ঘাড়ে পাউডার লেগে আছে নাকি।'

'না নেইত।' হেসে বলল, 'তোর ঘাড় খুব সুন্দর।'

'আর কার কি সুন্দর বলে যা—শুনি আর একবার।'

প্রমথর কাছে কার কি সুন্দর তার একটা হিসেব আছে। প্রমথ মাঝে

মাঝে বলে। বীরুয়ার ঘাড়, অনুতোষের বোন (হাড়), অনুতোষের ডাক্তার দাদা প্রিয়তোষের গলা আর পরমেশের গোড়ালির হলদে ঘাম—আর পায়ের পাতাও বটে। কী দীর্ঘ।

বীরুয়া ট্রামে উঠে গেল।

বীথির পায়ের পাতাও দীর্ঘ। অবিশ্যি অন্ধকারেই দেখা। ভুলও হতে পারে। কিন্তু নূপুর পরলে ঠিক বোঝা যেত—আসছে কি যাচ্ছে।

কিন্তু সুধা এল কেন সেদিন। প্রমথর হাত পা অসাড় হয়ে এল আবার। কেন আমি ওসবে গেলাম। কী দরকার ছিল। সাবান দিয়ে চান করেও যেন পরিষ্কার হওয়া যাচ্ছে না। খারাপ কথা বলে জিভে সাবান দিলেও একরকম ময়লা নিশ্চয় সারা মুখে লেগে থাকে। তার ওপর সাবানের বিচ্ছিরি স্বাদও মুখে থাকবেই।

বিকেলে ট্রামগুলো যেন চাকায় শব্দ পিষতে পিষতে এগোয়। চারদিক চিরে গিয়ে শব্দ ধুলো একাকার হয়ে যাচ্ছে। প্রমথর বুকের মধ্যে ঢিপ ঢিপ করতে লাগল। কি হবে। যদি সুধা মা হয়ে যায়। সেদিন বলছিল, 'বাবা ডাকবে, মা ডাকবে।' উঃ! ভাবা যায় না। কোথায় যাবে প্রমথ। ডাক্তারের কাছে গেলে টাকা চাইবে। ধরা পড়লে জেল—কেলেঙ্কারি—চেনাশুনো লোকের মধ্যে পতিত হয়ে যেতে হবে। ডাক্তারি করতে গেলে যদি মারা যায়। ভগবান বাঁচাও। সুধা যেন মারা না যায়। মহানন্দে আছে। এবারে প্রমথ তাকে বিয়ে করবে। আমি কি করে বিয়ে করব। আমার বমি আসে। আমি সুধাকে ভালবাসি না। সত্যি কথা বললে বাঁচবে না। অথচ? আচ্ছা হাসপাতালে যদি যাই। খাতায় লেখানো থাকবে স্বামী স্ত্রী। কপালে সিঁদুর। ট্যাক্সি থেকে নামার সময় যদি কেউ দেখে? আর বাড়ির লোক, অফিস—কেউ কি বুঝবে না। আমি আর পারছি না। পাকা ঘায়ের ভেতরের পুঁজের মত আমার সারা গা মাথায় কে যেন ভেতর দিয়ে একটু একটু করে কুরে কুরে এগোচ্ছে। হাত পা সব স্থির হয়ে গেছে। শীতকালের সন্ধ্যেবেলা। অথচ প্রমথ হাঁপাতে লাগল।

আসলে দেবুদার দোকান থেকে বেরিয়ে সে বেশীদূর এগোয়নি। থানার সামনে বটতলায় দাঁড়িয়ে পড়েছে। পথ দিয়ে লোক যাচ্ছে—মেয়ে, ফুলওয়ালা। থানায় চোখ পড়তে দেখল—ভেতরে অনেকগুলো লোক হাতকড়ি বাঁধা অবস্থায় মেঝেতে বসে আছে। ভেতরে পুলিশ অফিসার দাঁড়ানো—হাতে রুল—ভাল করে সন্ধ্যে না হতেই মাথার ওপর ডুম জ্বলছে। দুম করে রুল দিয়ে একটা লোকের কনুইতে বাড়ি দিল পুলিশ অফিসার। বাইরে থেকে শুধু ব্যাপারটা দেখা গেল। লোকটার ব্যথা পাওয়া মুখ—অফিসারের ভাবলেশহীন চোখ

সব দেখা যাচ্ছে—ব্যথার চীৎকারটা কেবল শোনা গেল না। এত শব্দ চারদিকে—।

প্রমথর মনে হল—আর এখানে বেশীক্ষণ দাঁড়ালে তাকেও ভেতরে নিয়ে যাবে। কেবল সুধার ঐ ব্যাপারেই না—জন্ম থেকে এতদিন প্রমথ যা সব করেছে তার জন্যে তাকে কয়েকবছর ধরেই খোঁজা হচ্ছে। পেলেই হাত পা বেঁধে হাত পার আঙুল হাতুড়ি দিয়ে থেতলানো হবে। চোখের মণি দুটো খুলে তেল দিয়ে মুছে ঝকঝকে তকতকে করে আবার জায়গামত বসিয়ে দেবে। তারপর সারা গা তেল দিয়ে মুছে যখন তাকে ছেড়ে দেবে তখন সে পুরোপুরি নতুন মানুষ—সৎ মানুষ—সব নতুন করে আরম্ভ হবে জীবনে। সেখানে এতদিনের জীবনের কথা একটাও মনে থাকবে না। হঠাৎ যদি ওষুধের গন্ধ ছড়ানো শীতের বৃষ্টিওয়ালা বিকেলে বারান্দায় গিয়ে নীতিশের সঙ্গে চা খায়—তবে কিছু হয়ত মনে পড়তে পারে—যেমন নুপুর—আসছে কি যাচ্ছে —বোঝা যায় না। এইসব আর কি!

নতুন দুটো লোক নিয়ে একজন পুলিশ ঢুকলো। থানার বারান্দায় দাঁড়ানো লোকটা তাকে মন দিয়ে দেখছে। প্রমথ সঙ্গে সঙ্গে মাথা ঘুরিয়ে চলতে সুরু করে দিল। সুধার ব্যাপারটা জানে না ত? প্রমথ দত্ত—দাগী সমাজবিরোধী। ওয়ারেণ্ট বেরোবে শীগ্‌গিরি। অপরাধ—মনে মনে একটা সাপ পোষা হয়। সে অনর্গল কামড়াচ্ছে! নীল করে দিচ্ছে।

প্রমথ ঐ ফুটপাথে গিয়ে অনেকদূর যাওয়ার পর সিগারেট ধরাল। না, কেউ নেই পেছনে। এখন বাসে ওঠা মুস্কিল। সব অফিস ফেরৎ। স্টপে দাঁড়িয়ে থাকল প্রমথ। কষ্ট করে একটা ট্রামে উঠে বাড়ি গিয়ে শুয়ে থাকলে গায়ে জোর পেত। কিন্তু ট্রামে গিয়ে ওঠার জোরও গায়ে নেই। হাত পা'র পাতা ফুলে ভারি হয়ে যাচ্ছে। এরকম এক জায়গায় দাঁড়িয়ে ক্লান্ত হয়ে পড়ে যেতে পারলে প্রমথ বেঁচে যেত। পথের লোক গাড়ি করে বাড়ি দিয়ে আসত।

॥ উনিশ ॥

কদিন হল মা'র গলস্টোনে আবার ব্যথা বেড়েছে। পল্টু এখানে নেই। বড়দা থাকলেও খানিকটা সুবিধা হত। গল্পের টাকাটা বাবার হাতে দেওয়ার পরেও আজকে আর হাতে কিছু নেই বাবার। হাতে আসা মাত্র খরচ হয়ে যায়। প্রয়োজন এত বেশী চারদিকে। বারিদবাবুদের ওখানে যদি চাকরীটা হয়ে যায়। বাস থেকে নেমে বাড়ি যাওয়ার পথে ডাক্তারখানা। বাবা বেরিয়ে আসছিল। দেখে বুঝল বাকিতে ওষুধ আনতে গিয়েছিল, দেয়নি। প্রমথ গিয়ে কম্পাউন্ডারকে বলল—কদিন পরে টাকাটা দিয়ে দেবে (কোত্থেকে দেবে প্রমথ তা জানে না), কিন্তু সে রাজী হল না। বাবা আগেই ফিরে গেছে। ট্রাম, ঠেলা, বাস—হাঁটবার পথই নেই। মা সামনের ঘরে শুয়ে আছে—এক একটা বমির ওক্ উঠছে আর মুখ দিয়ে জলের মত পিত্ত বেরোচ্ছে শুধু। পাশের ঘরে খালি খাটে গিয়ে টান টান হয়ে শুয়ে থাকল প্রমথ। কোথাও এখন একটা পয়সাও পাওয়া যাবে না।

সন্ধ্যের দিকে নিত্যর সঙ্গে নার্সদের হোস্টেলে গেল। নিত্য বলল, 'চল্ খাওয়াবে।' তারপর বলল, 'তুই যদি ওর বোন চায়নাকে বিয়ে করিস—সেই যে সেবার দেখাতে নিয়ে এলাম তোকে, দেখা হল না,' থেমে যেন কি ভাবল, 'মেয়েটা কিন্তু খুব ভাল। সাদাসিধে।'

নিত্য একথা আরও দুচারবার বলেছে। কিন্তু প্রমথ বিয়ে করে কোত্থেকে। বিয়ের ভাবনা তার আসেই নি।

নার্সদের হোস্টেলে ওয়েটিং রুমে বসল দুজন। আরও অনেকে বসে আছে। দেখে মনে হল কেউ ভাই, কেউ দাদা, কেউ বাবা—সঙ্গে পুঁটুলি—বোধহয় বাড়ি থেকে কিছু এনেছে। তাছাড়া দুচারজন লাভারও আছে। চুলে শাম্পু—কড়া ইস্ত্রীর ট্রাউজার। নার্সরা লোকেদের সঙ্গে গল্প করছে।

প্রমথর একটা জিনিস আশ্চর্য লাগল। ঘরে একটা পিয়ানো রয়েছে। বোধহয় ব্রিটিশ আমলের—তার ওপরে পেতলের ফুলদানিতে কাগজের ফুল। কেউ পিয়ানো বাজাচ্ছে না—অথচ মনে হচ্ছে চারদিক থেকে পিয়ানোর সুর

উঠে ঘরটা ভরে দিচ্ছে। কাছেই হাসপাতালের অপারেশান থিয়েটার। এখানে ঢোকার আগে সিমেণ্টের অক্ষরে লেখা ডিপার্টমেণ্টের নাম দেখেছে প্রমথ। মৃত্যুর এত পাশে বসে পিয়োনো. কাগজের ফুল, সেবিকাদের বন্ধুদের গালগল্প —প্রায় কাপড় টানিয়ে ম্যাজিক দেখানোর আড়াল করার মত।

বেয়ারা এসে খবর দিল, 'জ্বর হয়েছে। একটু পরে স্ট্রেচারে করে নামাবে। বসুন, দেখা হবে।'

স্ট্রেচারে নেমে এল নিত্যর বান্ধবী। মধ্যমগ্রামের চায়নার দিদি। নিত্য কিছু উতলা, স্ট্রেচারের সঙ্গে সঙ্গে গেল। কড়া ওষুধের গন্ধ ছড়ানো দুটো ওয়ার্ডের মাঝখান দিয়ে ওয়ার্ড বয়রা স্ট্রেচার দোলাতে দোলাতে নিয়ে যাচ্ছে। মাঝখানে একজায়গায় থামল। নিত্য কপালে হাত দিয়ে বলল, 'হাই টেম্পারেচার।' প্রমথ দেখে বুঝল, জ্বরে বেহুঁস। বেয়ারাদের জিজ্ঞাসা করে জানল, সকাল থেকেই জ্বর হয়েছে। দুপুরে একবার পাঁউরুটি আনিয়েছিল, খাবে বলে। কিন্তু খায়নি।

নিত্যর কানের কাছে কি বলল মেয়েটি।

নার্সদের অসুখে হাসপাতালের ব্যবস্থা আছে। ওয়ার্ডে ভর্তি করে নিল। হাসপাতালের বাইরে এসে নিত্য বলল, 'যাঃ! তোকে খাওয়ানো গেল না।' তারপর বলল, 'আচ্ছা মধ্যমগ্রামে একটা খবর দিতে হবে ত।'

প্রমথ সিগারেট ধরাল। পথে কারও কাছে আগুন চাইলে এত বিরক্ত হয়। নিত্য বলল, 'এক কাজ কর্ প্রমথ। চায়নাকে ত চিনিস না। তুই একটা পোষ্ট কার্ড লেখ, আমি ঠিকানা দিচ্ছি। আপনার দিদির হঠাৎ জ্বর হয়েছে—এইসব বলে আর কি।'

প্রমথ কিছু অবাক হল নিত্যর কথা শুনে। আগে হলে প্রমথ লিখে দিতে পারত। কিন্তু কিছুদিন কি যে হয়েছে—এসব আর পারে না। তালে ভুল হয়ে যায়। কিন্তু নিত্য এসব বলছে কেন? 'তুই মেয়েটাকে ভালবাসিস না?'

'কি করি তা ঠিক জানি না।' নিত্য এইভাবেই কথা বলে।

'তবে মিশিস যে?'

'আসে। তাছাড়া না মিশে কি করব।' তারপর থেমে বলল, 'সত্যি পরশুও দেখে গেলাম ভাল, আজ হঠাৎ জ্বরটা এল। বাবার এদিকে প্রেসার বেড়েছে। দিন সাতেক যাওয়াই হয়নি।'

কলকাতার বাইরে নিত্যর বাবা থাকে। নিত্য বলল, 'কটা বাজে রে? ছটা —এখন গেলেও ট্রেন পাওয়া যাবে। যাই রে—বাবার ওখান থেকে ঘুরে আসি।'

নিত্য যেমন হঠাৎ নিয়ে এসেছিল—তেমন হঠাৎ চলে গেল। প্রমথর বাবা কলকাতায় থেকে থেকে হাঁপিয়ে গেল। নিত্যর বাবার তবু জমি আছে—

একতলা বাড়ি আছে—লোকাল ট্রেনে পঁয়ত্রিশ মিনিটের পথ—তবুও প্রেসার হয়।

প্রমথ ঠিক করেছিল ফিরবার পথে নিত্যর কাছে কটা টাকা ধার চাইবে। মা'র ওষুধটা কিনে নিয়ে যেতেই হবে। তারপর পল্টু এলে টাকাটা দিয়ে দেবে। এত তাড়াতাড়ি নিত্য চলে গেল। আজ কেউ দাঁড়াচ্ছে না। সবাই চলে যাচ্ছে।

চায়নার দিদির সঙ্গে নিত্য কেমন খোলাখুলি মেশে। এক সঙ্গেও থাকে। ভয় বলে নিত্যর কিছু নেই। যদি কিছু হয়ে যায়। আসল কথা এই পৃথিবী জায়গাটা সুবিধার না। এখানে আইন অনুযায়ী কাউকে এনেও শান্তি নেই। কষ্ট পাবে বড় হলে। সেখানে বিয়ে হয়নি এমন অবস্থায় কেউ যদি আসে তার চেয়ে ভয়ের কিছু নেই। শুধু ভয়—প্রমথর যেন সারা গা ঘেমে যায়। কদিন ধরেই ভাবছে সুধার সঙ্গে দেখা করবে। কিন্তু ভয়ের চোটে দেখাই করতে পারছে না। যদি শোনে—যা ভয় তাই-ই ঘটেছে।

হাসপাতালের বাইরে খানিকদূর অবধি অনেকগুলো সরকারী গাছ আছে ফুটপাথ বরাবর। একটা থেকে কাক ময়লা ছড়াল। পড়বি ত পড় ডান হাতের আঙুলে। প্রমথ হাত মুঠ করে সিগারেট টানে। হাতের যেখানে মুখ লাগায় তার কাছাকাছি নোংড়া হয়ে গেছে।

সবচেয়ে আগে সাবান দিয়ে হাত ধোয়া দরকার—ভাল করে। কফি হাউসের বেসিনে গিয়ে হাত ধুলো সাবান দিয়ে। সরকারী সাবান—কিন্তু উপায় নেই। পকেটে হাত মুছল, রুমাল নেই। শঙ্কর, নীতিশ আরও দুচারজন কোণের টেবিলে বসে। প্রমথ গিয়ে বসল। কারও মুখে কথা নেই। দাড়িওয়ালা এক কবি একটানা রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইছে। বকর বকর বিজ বিজ শব্দে কিছু শোনা যায় না। সবাই শুধু বসে আছে। বলার মত কথা কারও নেই। প্রমথ বসে হাঁপিয়ে ওঠার যোগাড়। সওয়া ছটা বাজে। উঠি উঠি করছিল।

নীতিশ বলল, 'চল আমিও উঠছি।'

পথে নেমে নীতিশ বলল, 'একটা কথা আছে তোমার সঙ্গে।'

'কেন? বীথি শালী আবার কিছু বলেছে!'

প্রমথ ভেবেছিল ঠাট্টার কোন কথা হবে। কিন্তু নীতিশের মুখ দেখে অন্য রকম মনে হল। খুব পরিচিত, যাকে ভাল লাগে, যার সঙ্গে বন্ধুত্ব হয়ে যাচ্ছে প্রায়—তার মুখ যখন কোন কথার আগে কঠিন হয়—তখন প্রমথর বুক কাঁপে। কি বলবে আবার? আমার পাষ্ট লাইফ জানতে পেরেছে নাকি? কেন খোঁজ করতে গেল! এখন ত আমি ভাল হচ্ছি। ভাল হওয়ার চেষ্টা

করছি। মানুষ একদিন পুরোপুরি সৎ হয়ে যাবেই। আমিও হচ্ছিলাম—এই সেদিন পরমেশদের বাড়িতে একটুর জন্যে আবার পা পিছলে গেল!

'আজ অবিনাশবাবুর ওখানে গেলাম।' নীতিশ থেমে থেমে বলছে।

প্রমথ রেগে গেল, 'কি বলবে তাই বল না।'

'তুমি আমার চাকরীর জন্যে অবিনাশবাবুকে বলেছ?'

প্রমথ অবাক হল। ঠিক সোজাসুজি কিছু বলেনি—কিন্তু নীতিশের যদি একটা কিছু হয় তবে প্রমথ সুখী হয়।

নীতিশ আবার বলল, 'আমি কারও সাহায্য চাই না। কাউকে বলতেও চাই না।'

এবারে প্রমথ আর রাগ না করে পারল না। এই ব্যাপার! একটু হাসিও পেল। মুখে বলল, 'শোন নীতিশ, আমি যা অবিনাশদাকে বলেছি তাতে তোমার কোন অসম্মান করা হয়নি। কিন্তু তুমি যেমন বাড়াবাড়ি করছ তাতে মনে হয় তোমার এই রাগারাগিটাই পুরোপুরি ভান।'

'কেন?'

'তাছাড়া কি? তোমার যদি আত্মসম্মান থাকত তাহলে মিথ্যে আমার সঙ্গে ঝগড়া করতে আসতে না। আমি যেটুকু বলেছি—সেটুকু তোমার ভালর জন্যে।' তারপর বলল, 'অবিশ্যি এ তোমার পার্সোনাল ব্যাপার—আমি আর বলব না।'

প্রমথর যেন সময়টাই খারাপ যাচ্ছে। বাড়িতে মা'র শরীর খারাপ, পল্টু বাইরে—অবিনাশদার অফিসে চাকরীটা হবে কি হবে না—এদিকে নীতিশের আত্মসম্মানের ভান—অদ্ভুত অবস্থা। কলকাতায় নীতিশের বাড়ি আছে। তার হয়ে প্রমথর মত বেকারের কিছু বলা ঠিক হয়নি। কিন্তু কেয়া যে সেদিন ওকথা বলল। তাহলে কি এসব নীতিশের ভান? না এক ধরণের অশিক্ষিত রাগ—ভাবটা অনেকটা—'আমার জন্যে কাউকে কিছু বলতে হবে না।' প্রমথ জানে এসব লোকই সবচেয়ে বেশী ডিগবাজী খায় পরে।

প্রমথর এখন কিছু ভাল লাগছে না। আবার ভয় করছে। সন্ধ্যে হলেই ভয় আসে। একবার ভাবে সুধাকে গিয়ে পষ্টাপষ্টি সব জিজ্ঞাসা করবে। ভয়ের কি আছে। কিন্তু কাছে গিয়ে যদি তাই-ই শোনে।

পাশাপাশি হাঁটছিল দুজনে। নীতিশ কি বুঝল কে জানে। খানিক এগোবার পর একটা সিগারেট এগিয়ে দিল—নিজে একটা ধরাল। ধোঁয়া ছেড়ে বলল, 'রোববার যেতে বলেছে।'

'হয়েছে, নিজের শালীর নামে আর গল্প দিও না।'

'শালী কে বলল? মাখনবাবু নেমন্তন্ন করেছে। ইলিশ আনবেন। আমিও যাচ্ছি।'

প্রমথ মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আমার কাজ আছে সেদিন।'

'না যেতে হবে।' তারপর যেমনি এগোচ্ছিল তেমনি যেতে যেতে নীতিশ বলল, 'কোনোদিকে কিছু হচ্ছে না যে—'

এ কথায় প্রমথর নিজের লজ্জা হল। এতক্ষণ নীতিশকে যা সব ভেবেছিল তা আসলে ভুল। এসব ভাবার জন্যে নিজেকে নীচু লাগল। একদিন যেন নীতিশকে উঁচু মানুষ মনে হয়েছিল প্রমথর। সেদিনই তাহলে ঠিক ভেবেছিল। প্রমথর হাসি পাচ্ছিল না। তবু অনেকখানি হেসে বলল, 'পূর্ব জন্মে তুমি ঘটক ছিলে!' বলে ভাবল, নীতিশকে তুই ডাকা যায় না।

॥ কুড়ি ॥

প্রমথ এখন একাই আসতে পারে। আর নীতিশ লাগে না। হাওড়া বলতে ষ্টেশন আর শিবপুর বলতে হাওড়ার একটা পাড়া—এই ছিল প্রমথর ধারণা। এখন জানে শিবপুরে এলে ভাল লাগে।

মাখনবাবু ঘরে ছিলেন। মেজদি এসে হাতে পাখা দিল। সেদিন নীতিশের শ্বশুরবাড়ি মেজদির কপালে সিঁদুর ছিল না। আজ অনেকখানি সিঁদুর। প্রমথর এসব মন্দ লাগছিল না। কিন্তু যার জন্যে আসা সে কোথায়। মেয়েদের ব্যাপারে প্রমথর পঞ্চেন্দ্রিয়র পরেও আর একটা ইন্দ্রিয় কাজ করে। সেটা ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়। দেখার ইচ্ছে, কাছে থাকার ইচ্ছে, কথা বলার, হাসির শব্দ শোনার—বেণী আছড়ানো দেখার ইচ্ছে—এইসব যেন প্রমথ দেওয়ালের ওপিঠে থাকলেও দেখতে পায় শুনতে পায়। দেওয়াল সরে যায় প্রমথর জন্যে। এখন এখানে প্রমথর মনে হল তার হ্যাংলামি সুড় হয়ে পাশের ঘর শুকতে গেল।

মাখনবাবু ব্যাগ হাতে বাজার করতে গেল। যাওয়ার সময় প্রমথ বলল, 'নীতিশ আসবে না?'

'সবাই আসবে। বসুন ত আপনি।' এরকম ধমকে বসিয়ে রাখা দেখে প্রমথর যেন মনে হল সে ভিটে বাড়ির প্রজা। পুজো মণ্ডপের বাইরে বসে আছে। প্রসাদ বিলি হবে আর একটু পরে। প্রসাদ না, চা হাতে বীথি এল। চোখ নামানো।

প্রমথ চা হাতে নিয়ে বলল, 'নীতিশ কখন আসবে? আমাকে যে বলল নেমন্তন্ন আজ এখানে।'

'আমি ত জানি না।'

প্রমথর সন্দেহ হল। তাহলে কি কোন নেমন্তন্ন হয়নি। মুখের কথা বলতে হয় বলে নীতিশ বলে ফেলেছে। এখন উঠে যাওয়াও যায় না। বীথি দাঁড়িয়ে।

প্রমথ বলল, 'আপনি বসুন না। মানে—তুমি বসতে পার।' বলে দেখল কোন কথাই জমে যাওয়ার মত বলতে পারছে না। তারপর বলল, 'আজ ট্যুইশানি নেই আপনার।'

'আজ রোববার না!' বলে হাসল বীথি।

তা ত ঠিক। প্রমথর রবি সোম সব সমান।

বীথির খুব খারাপ লাগল। আবার সেই ট্যুইশানির কথা। তারপরও জিজ্ঞাসা করবে—কত পান সব মিলিয়ে। এত খবরের দরকার কী। বাইরে অনেকখানি আকাশ অন্ধকার করে মেঘ এল। ঘরে হেরিকেন বসিয়ে দিয়ে গেল মেজদি। 'তোমরা ভাই গল্প কর। আমি বাচ্চা দুটোকে খাইয়ে আসছি।' প্রমথ সেদিন অভ্যেসমত গলগল করে সব বলে গেছে। আজ আর নতুন কিছু বলার নেই। আজ প্রমথ কিছুই বলতে পারল না।

বাড়িটার পেছনে কারখানা আছে বোধহয়। শব্দ হচ্ছে। তার পেছনে এক জায়গায় গিয়ে শহরও শেষ হয়েছে নিশ্চয়। সেখানে বোধহয় শস্যভূমির সুরু। সবুজ, নবীন। প্রমথর যেন কেন মনে হল বীথির বুকের কাপড়খানা একখানা মেঘ। কিন্তু সে মেঘ গায়ে লেগে থাকার। উঠিয়ে দেখার ইচ্ছে প্রমথর হল না। আজ এই প্রথম মনে হল, বীথি নামের এই মেয়েটি যেখানে যেভাবে আছে থাকুক। তার শান্তির মাঝখানে গিয়ে প্রমথ কোনরকম গোলমাল করতে চায় না। মনে মনে বলল, এই বেশ।

'আচ্ছা মেজদিকে তো দেখলাম। বড়দি কোথায় তোমাদের?'

'গত বছর মারা গেছে।'

'শ্বশুরবাড়িতে?'

মাথা নাড়ল বীথি।

'ছেলেপেলে আছে?'

'হুঁ।' কথার সঙ্গে অনেকখানি মাথা নেড়ে দিল। 'তিন মেয়ে এক ছেলে। এক মেয়ে আগের পক্ষের।'

তাহলে দোজবরে বিয়ে হয়েছিল। প্রমথ মনে মনে একটা ছক কেটে নিল। পাঁচ মেয়ে দুই ছেলে নিয়ে নীতিশের শাশুড়ী বিধবা হলেন। প্রথম মেয়ের বিয়ে দোজবরে দিয়ে দিতে হল। তারপর মেজ মেয়ে। শুনেছে মাখনবাবু রীতিমত একরোখা লোক। এমনিতে কিন্তু ঠান্ডা। তিনি নিজেই বিয়ে করেছেন।

হেরিকেনের সামনে পা মেলে বসেছে। সেদিন পায়ের পাতা দীর্ঘ মনে হলেও আজ আর তত সুন্দর লাগল না। নখে ময়লা। তবু মুখখানা যেন হেরিকেনে আরও গম্ভীর আরও সুন্দর। প্রমথ বলল, 'কিসে মারা গেলেন তোমার বড়দি?' আজ আবার সেদিনের মত তুমিতে ফিরে গেল প্রমথ।

'শ্বাসনালীতে ক্রিমি আটকে গেল—খেতে বসে।' তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল, 'অনেকদিন পেটের মধ্যে ছিল কিনা।'

হঠাৎ বলল, 'আমার কিন্তু একটুও কষ্ট হয়নি শুনে।'

প্রমথকে তাকাতে দেখে বলল, 'হবেই বা কেন? কতটুকু আর দেখেছি! সেই কোন্ ছোটবেলায় বিয়ে হয়ে গেছে।'

বীথির মুখ নামানো। চোখও তাই। প্রমথ একা বসে বসে কারখানার শব্দ শুনতে লাগল। তার পেছনে কোথাও শহর শেষ হয়ে গেছে। সেখানে শস্যভূমির সুরু। সবুজ নবীন, সতেজ।

প্রমথ অন্যদিকে কথা ঘোরানোর চেষ্টা করতে গিয়ে কি একটা কথা বলল। বীথি শুনতেই পেল না। বাইরে বোধহয় মারোয়াড়ীদের বিয়ের প্রোসেসন যাচ্ছে। এমন সময়—ছবির বই হঠাৎ ওল্টালে যেমন সাজাহানের ছবির পরেই পিসা নগরীর হেলানো টাওয়ারের ছবি এসে পড়ে—তেমনি, যেন অন্ধকারে দরজা ঠেলে হেরিকেনের সামনে নীতিশ এসে দাঁড়াল। মুখে অনেকখানি হাসি।

'সরি, পারমিশন না নিয়ে ঢুকে পড়েছি!'

নীতিশের একথায় বীথি হেসে উঠে গেল। প্রমথ দেখল, দাঁতগুলো সুন্দর কিন্তু মাঝে মাঝে কালো কালো দাগ।

খানিক পরে মাখনবাবুও এলেন। আরও একপ্রস্থ চা হল। রান্না হয়ে গেছে। মাখনবাবু আস্ত একটা ইলিশ এনেছেন। সেটাকে নিয়ে দুই বোনে কড়াই খুন্তি নিয়ে যতরকমে পারে রান্না আরম্ভ করে দিল। ছ্যাৎ, ছোক্, তেলের পোড়ানি, ফোড়নের গন্ধে ঘর ভর্তি হয়ে গেল।

প্রমথ রীতিমত পারিবারিক হয়ে গিয়ে নিঃশ্বাস ফেলতে পারছে না। নীতিশ বলল, 'যাও না কথা বলে এস।'

প্রমথ হয়ত অন্য জায়গায় নিজেই এগিয়ে গিয়ে কিছু বলত। এখন এখানে এই পারিবারিক আবহাওয়ায় হঠাৎ গিয়ে উটকোর মত কি বলবে। তবু গেল। ঘুটে, কয়লার বালতি, ভাঙা হাতপাখা, কেরোসিনের বোতল—সব সামলে রান্নাঘরে গেল। মেজদি নেই। বীথি হাতা নাড়ছে। তোলা উনুনের তাপে দরজার কাঠ ঘেমে গেছে। প্রমথর জন্যে যেটুকু সাজ সেটুকুও ঘামে ক্যাৎ ক্যাৎ করছে। প্রমথ নীচু হয়ে বীথির মাথার গন্ধ নিল। বীথি এতক্ষণ টের পায়নি। হঠাৎ প্রমথকে এই অবস্থায় দেখে প্রমথর চেয়ে নীতিশের ওপরেই রাগ হল বেশী।

তার কথাতেই এই লোকটা উঠছে বসছে। নিশ্চয় সেই-ই বলেছে—রান্নাঘরে যেতে।

প্রমথ পাশে মোড়ায় বসে থাকল দু মিনিট। এঘরে ঢোকাই বোকামি হয়েছে। এখন হঠাৎ উঠে যায় কি করে। বীথি রীতিমত ঘেমে গেছে। এখন বোধহয় ছাদে বসলে ভাল লাগতে পারে। প্রমথ বলে বসল, 'চল ছাদে গিয়ে বসি।'

এই লোকটাকে বীথির সুবিধার লাগছে না। তবে খারাপও না প্রমথ—এটা বীথি বুঝতে পেরেছে। কেয়ার বরের কথায় যখন উঠছে বসছে তখন লোকটা সত্যিই খারাপ না। তবে এই কদিনেই যেন বীথির যেখানে যা আছে তার ওপর একটু একটু করে হাত রাখছে প্রমথ। ছাদে বসার কথায় রাগ হল—সঙ্গে সঙ্গে মনে হল আমি কি এতটা সস্তা।

'না।' বেশ শক্ত করে বলল বীথি। তারপর প্রমথ একটু জোর করতে বলল, 'ছাড়ুন, সবার সামনে ছাদে গিয়ে সিনেমা করি কী করে।' মুখে কিন্তু কিছু হাসি।

বেশ কাছের থেকেই কেউ নাকের নরম মাথায় ঘুষি মারলে যেমন মাথা ঘুরে ওঠে—সব অন্ধকার হয়ে যায় হঠাৎ, তেমনি প্রমথর সবকিছু গোলমাল হয়ে গেল।

সুধাকে ভালবাসার চেষ্টা করার সময় প্রমথ 'দাড়ি কামানোর' আয়নার মত ভালবাসার আদর্শ মনের সামনে ঝুলিয়ে রাখত। খানিকদূর ভালবাসার চেষ্টা করে মনে হত—'নাঃ! কিচ্ছু হচ্ছে না। সিনেমা হয়ে যাচ্ছে!'

বীথি সিনেমা বলল কেন। বীথি কি সুধার ব্যাপার জানে? সুধা কি বীথিদের আত্মীয়। বীথি সব জানে তাহলে। কিন্তু আমি ত সুধাকে ভালবাসি না। মোটেই না। বমি আসে। সুধার হাত থেকে মুক্তি চাই আমি। উঃ! সুধা। আমি ভাল হতে চাই। সৎ হতে চায় প্রমথ। মৃত্যুর সময় বিনা চেষ্টাতেই প্রমথ একটা পুরো সৎ মানুষ হয়ে যাবে—এই বিশ্বাস আছে। বীথি তুমি আমার পাস্ট রেকর্ড জানতে যেও না। আমি আর সেরকম নেই। এমন দীর্ঘ চোখ—দীর্ঘ পায়ের পাতা—হাঁটলে বোঝা যায় না—আসছে না যাচ্ছে—পায়ে নুপুর থাকলে সুবিধা হত।

প্রমথ সামনের ঘরে উঠে এল। মুখ গম্ভীর দেখে মাখনবাবু বলল, 'কি হল?'

নীতিশ তাকিয়ে থাকল। ঠিক করল, ঘাঁটিয়ে দরকার নেই বোকা গোয়ারটাকে।

প্রমথ বলল, 'আমি আর বসব না। ক্ষিধে পেয়েছে। যা হয়েছে দিয়ে দিক।'

মেজদি দই আনতে পাঠিয়েছিল বুলাকে। বড় রাস্তা। লরি যাচ্ছে অনর্গল। বুলাকে পাঠিয়ে দরজায় দাঁড়িয়েছিল। প্রমথর ভাবগতি দেখে ভয় পেল। মুখে কিছু বলল না।

প্রমথ মাছ খেল শুধু। ভাত একটাও মুখে দিল না। নীতিশ গম্ভীর হয়ে থাকল। মেজদি ভাত দিতে এল। প্রমথ নিল না। মেজদি বলল, 'খেলে না যে একদম।'

প্রমথ যেন কি ভাবছিল। হুট্ করে বলে দিল, 'বিয়ে করব কথা দিয়েছি—বিয়ে করব। ভাত খাইনি বলে আপনাদের ভাবতে হবে না।'

প্রায় না খেয়েই নীতিশকে নিয়ে প্রমথ বেরিয়ে এল। নীতিশের খাওয়াই হয়নি। হেরিকেনের আলোয় দুবার চশমা মুছল নীতিশ। বেরিয়ে আসবার সময় মাখনবাবু, মেজদি হকচকিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল। প্রমথ দেখল, আগুনে ঘেমে ওঠা দরজায় বীথি হেলান দিয়ে বসে আছে। উনুনে কড়াইতে কি একটা পুড়ছে। প্রমথর মনে কী যেন খচ্ করে উঠল। কিন্তু তা অল্প সময়ের জন্যে। হাওড়ায় এসে দেখল—একটা বাস-ট্রামও নেই। শেষ ট্রাম ব্রীজ পার হয়ে চলে যাচ্ছে।

ব্রীজে উঠে দেখল পোর্টের লোকরা ফিতে নিয়ে দাঁড়ানো। লম্বা লম্বা চেন। ফাঁকা ব্রীজে রীতিমত একটা হৈচৈ। নীতিশ বলল, 'কাগজে দেখনি আজ বান আসবে রাত বারোটায়।'

প্রমথ বলল, 'তবে দাঁড়িয়ে দেখে যাই!'

'আমার অত শখ নেই।'

তা ঠিক, তার জন্যে শিবপুরে এসে নীতিশের সন্ধ্যেটা গেল। খাওয়া-দাওয়া ভণ্ডুল করে দেওয়ার পরে এখন বান দেখার মেজাজ নাও থাকতে পারে নীতিশের। জেটি-বাঁধা স্টিমার থেকে কড়া আলো এসে পড়েছে এদিকে। ডিঙিগুলো পালাচ্ছে। ঘাটে বাঁধা একটা বজরা দমাস দমাস করে ঢেউতে আছাড় খাচ্ছে। আজ প্রমথ দেখল গঙ্গার বুকের শ্যাওলার পুরু সর চারদিকে ফেটে গেছে। সেবার বাসে করে যাওয়ার সময় মনে হয়েছিল শ্যাওলায় নদীটা নষ্ট হয়ে গেল। ব্রীজের ওপর কী হাওয়া!

'আজ না খেয়ে এসে খারাপ করলাম, তাই না?'

'সে তুমিই জান।' নীতিশও ঢেউ দেখছে। এত নীচে—চোখের মণি দুটো সুতোয় ঝুলিয়ে পাঠিয়ে দিলে একটা থেকে আরেকটাকে আলাদা করা যেত। এখান থেকে কি-ই বা বোঝা যায়।

'বীথির অনেক আগেই বিয়ে হয়ে যেত। সবাই এত চায়!' একপাল লোম-ছাটা ভেড়া নিয়ে যাচ্ছে কসাইর লোকেরা। এখন ব্রীজ ফাঁকা। প্রমথদের পাড়ার তারক ব্রীজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় একদিন বাচ্চা মত একটা

ভেড়া ভীড় থেকে তুলে নিয়ে ট্রামের সেকেণ্ড ক্লাসের কোণে লুকিয়ে ছিল। পরদিন শুধু মাংস ভাত—যত ইচ্ছে।

'সারাদিন ধরে কাজ সেরে আমাদের জন্যে বসেছিল। সব রান্না ত ওর করা।' নীতিশ এত আস্তে আস্তে কথা বলে।

ঠেলা গাড়ি ভর্তি গুড়ের বস্তা। সামনে দুজন পেছনে দুজন—ঠেলাটাকে টেনে ব্রীজের ওপর তুলছে।

হঠাৎ নীতিশ ঘুরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত অসুবিধে বাড়িতে—আজকাল কেউ দেখতে এলেও বেরোয় না।' থেমে বলল, 'সেদিন নাকি বলেছে—আর এই দেখাদেখি ভাল লাগে না—যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে দিয়ে দাও—আমি আর পারি না—'

নীতিশ হাঁটবার সময় হাত দোলায়। এখনও দুলছে। সব শ্যাওলা ভেসে গেছে—বড় বড় ঢেউ স্টীমারের আলোয় ফুলে উঠছে।

ব্রীজ ফেলে দিল পেছনে। এদিককার সিনেমার বড় বিজ্ঞাপনগুলোর আলোও নিভে গেছে। দেখবে কে। পথে লোকই নেই।

আমি আর পারি না—এই কথাগুলো বীথি কিভাবে বলতে পারে তাই ভাবছিল প্রমথ। নীতিশ আগে যে কথাগুলো বলছিল—সেগুলো প্রমথ ভুলে গেল।

যদি নীতিশের শ্বশুরবাড়িতে এই কথাগুলো বীথি বলে থাকে তাহলে কেমন ভাবে বলেছে। প্রমথর মনে হল বীথি যেদিন বলেছিল সেদিন হয়ত বৃষ্টি হচ্ছিল—সামনের পুকুরটা থেকে কড়া ওষুধের গন্ধ উঠছে চারদিকে—বীথি যেন একটা ঘরের মধ্যে দাঁড়ানো—ওপরের টিনের চাল মাথায় ঠেকে যাচ্ছে প্রায়—ঘরে একটামাত্র দরজা—বীথিকে মাথা নীচু করে সেই দরজা দিয়ে বেরোতে হয়। ঘরের মেঝেতে দাঁড়িয়ে একটা বাঁকানো লতার মত গলা লম্বা করে দরজার বাইরে মাথা পাঠিয়ে দিয়েছে বীথি। চোখ দুটো মুখের ফ্রেমের বাইরে ঝুলে পড়েছে—'আমি আর পারি না, আমি আর পারি না, আমি আর পারি না!' বাঁকানো লতার মত গলা ঘরের বাইরে পাঠানো মাথার ভারে ক্রমেই ঝুলে পড়ছে। গলাটা গুটিয়ে মাথা শুদ্ধ গলা কিছুতেই ঘরের মধ্যে ফিরিয়ে আনতে পারছে না বীথি। যতবাব আনতে যায়—দরজায় কান আটকে যাচ্ছে। অন্য সময় কান কি নরম—এখন একেবারে ইস্পাত।

কিংবা মাখনবাবুর বাড়িতেই যদি বলে এ কথাগুলো। মেঘ আসবে বলে আকাশ গরম হয়ে আছে। বীথি ট্যুইশানি সেরে এইমাত্র ফিরে এসেছে। অনিল অধিকারীর মা ছেলের জন্যে ঘড়ি চায়, দশভরি সোনা আর বারোখানা প্রণামী। মেজদি মুখে হাত দিয়ে বসে আছে। জুতো খুলে মেঝেতে দাঁড়াতেই পা পুড়ে গেল। তেতে আছে। লাফিয়ে ঘরে গেল। ঘর কি

অন্ধকার। চন্ করে মাথা ঘুরে গেল। দেওয়ালে পিঠ দিয়ে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকল অনেকক্ষণ। মাথা ঠিক হয়ে গেছে—কিন্তু, সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে ঘরের বাইরে যেতে ইচ্ছে করছে না। 'আমি আর পারি না, আর পারি না।'

নীতিশ ব্রাবোর্ণ রোড দিয়ে সর্টকাট করল। যাওয়ার সময় কিছু বলল না। প্রমথ স্ট্র্যান্ড রোড দিয়ে এগোতে থাকল। পোর্ট কমিশনারের গুদামবাড়ি পর পর—অনেকগুলো। নীতিশের একটা জিনিসে প্রমথ আশ্চর্য হল। আজকাল কেউ কারও জন্যে করে না। মুখে সহৃদয়তার কথা বললেও কাজে করা খুব কঠিন। নিজের শালীর বিয়ে হচ্ছে না—সে ত অনেকেরই হয় না। কিন্তু আজকে ব্রীজের ওপর যেভাবে কথাগুলো বলল—না খেয়ে চলে আসাতে মাখনবাবুর বাড়িতে যেমন গম্ভীর হয়ে ছিল—তাতে স্পষ্ট বোঝা যায় বীথির জন্যে নীতিশ কিছু কিছু অনুভব করে। খুব গভীর ভাবে বীথির জন্যে ভাবে নীতিশ। না হলে এই বয়েসে ত কেউ ঘটক হয় না। আর ঘটক হয়েই বা কি লাভ। মুখে বড় বড় কথা না বলে একটি মেয়ের জন্যেও গম্ভীরভাবে কিছু করা কম কথা না। নীতিশের মন বড়। একথা ভাবতে গিয়ে প্রমথ দেখল—সে নিজে কি ছোট। হয়ত নীতিশ প্রমথর পাস্ট রেকর্ড জানে। তাই চুপ করে থাকে। প্রমথ কিছু সময় চায়। সে পুরোপুরি সৎ হচ্ছে। এতদিনের খারাপ জঞ্জাল বের করে দিতে সময় লাগবে। ভাল ত হতেই চাই। একটুর জন্যে ফসকে যায় প্রমথর সব।

সুধাদের অফিস পড়ল। এখানে দিনের বেলায় সুধা আসে। হয়ত টিফিনে মীরাদির সঙ্গে প্রমথর কথা বলে। সুধার কথা মনে হতেই প্রমথর শীত করতে লাগল। যদি তাই হয়ে থাকে। ভাবা যায় না। কোথায় যাব তাহলে। উঃ! পারা যায় না! পথে কত পুলিশের গাড়ি টহল দিচ্ছে। একদিন হয়ত ভিড়ের মধ্যে থেকে তাকে খুঁজে ধরে নিয়ে যাবে। যাওয়ার সময় গাড়ির পেছন দিকে বসাবে।

পরদিন খুব সকালে ঘুম ভাঙল। কাল রাতে এসপ্ল্যানেড থেকে একটা বাস পেয়েছিল ভাগ্যিস। সবটা পথ হাঁটলে প্রমথকে খুঁজে পাওয়া যেত না।

ঘুমটা এত সকালে ভাঙল কেন। ভাঙবার সময় ভালই লাগছিল। যেন বাতাসা মুখে দিয়ে ঘুমিয়ে ছিল--এখনও স্বাদ লেগে আছে মুখে।

উঠোনে রোদ্দুরের মধ্যে মা মাছ কুটছে। সবুজ বড় একটা কি—চাল কুমড়োই হবে—আলো পড়ে চিক্ চিক্ করছে। প্রমথর প্রথম মনে হল কাল রাতে গঙ্গায় বান এসেছিল। জলের দেওয়াল।

'এত ভোরে মাছ—'

'উনি সকাল সকাল যাবে। মালিকের কাজ বেড়ে গেছে।' মা বাবার অফিসের ডিরেক্টরকে মালিক বলে। বাবা বলে 'মালেক।'

প্রমথর সব কেমন স্বাদহীন হয়ে গেল।

'তোর চাকরীর কি হল?'

'বলেছি ত হবে' বলে প্রমথ উঠে গেল।

সকালে বিরুয়াকে পাওয়া যাবে না। ঘুরতে ঘুরতে অনুতোষের বাড়ী গেল। অনুতোষ নতুন কবিতা শোনাল। কবিতার বিষয়টা বেশ। স্বর্গের এক মেয়ে এক দৈত্যকে ভালবেসেছে। স্বর্গবাসীরা যার চুলের গন্ধে পাগল সেই স্বর্গ-কন্যা গ্রহাণুপুঞ্জে তার চুল ছড়িয়ে দিয়েছে। মর্তবাসী দৈত্য অবহেলায় সেই বিস্তারিত কেশপাশে চোখ বুঁজে মাথা রেখেছে—মনে দৈত্যের আহ্লাদ। 'দৈত্যের আহ্লাদ' শব্দটা ভারি অদ্ভুত। কবিতাটার প্রশংসা করল।

অনুতোষের মা জলখাবার দিল। দুধ চিড়ে, তাল পাটালি, সবরি কলা। ক্ষিধে ছিল। খেয়ে বলল, 'তোরা আবার বড়লোক হয়েছিস। অবস্থা ফিরছে মনে হয়।'

অনুতোষ হাসল। আগে বিরুয়াদের বাড়ি লুচি তরকারি দিত। ওর বাবা ইনকাম ট্যাক্সের উকিল। অসুখে পড়ার পর জলখাবার কমে গেল। প্রমথ বলত, হাসতে হাসতে, 'তোদের অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে।'

অনুতোষকে বলল, 'তোর জন্ম দিন ত আমার একদিন আগে—তুই ঠিক আমার আগে মরবি।'

অনুতোষ প্রমথর এইসব থিয়োরিতে মজা পায়।

প্রমথ পাঁচটা টাকা চাইল। বলল, 'চাকরী হলেই ফেরৎ দিয়ে দেব।'

অনুতোষ টাকাটা দিয়ে হাসল। বলল, 'কি করবি?'

প্রমথ ঠিক করে এসেছিল কি করবে। কাল বীথির সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করে এসেছে। আজ আর কি করা যায়। ঠিক করেছে খান দুই সাবান আর একটা পাউডারের কৌটো দিয়ে আসবে। অনুতোষকে বলল সব। অনুতোষ বলল, 'আর কতদিন এসব করবি!'

'না বিশ্বাস কর্—আমি ভালবাসি, সত্যি ভালবাসি—তাই মনে হচ্ছে।'

অনুতোষ কিছু বলল না। চলে আসবার সময় বলল, 'সুধার সঙ্গে তোর দেখা হয়েছে। খুব খোঁজ করছিল তোকে।'

প্রমথ সিঁড়িতে নিশ্চল হয়ে গেল। বুক ধপ্ ধপ্ করছে। 'কেন? শরীর খারাপ হয়েছে নাকি?'

কথাটা বলে নিজেই বুঝল—'এ কি জিজ্ঞাসা করলাম আমি?'

'না তেমন আর কোথায়।' তারপর বলল. 'সন্ধ্যে বেলা আসিস। ছেবুদার দোকানে—পরমেশ আসবে।'

প্রমথ মাথা ঝুঁকিয়ে সায় দিল। বাইরে এসে ফুটপাথে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল। তারপর নিজেই অবাক হল। একটু আগে বীথির কথা ওঠায় কেমন জোর দিয়ে বলল—সত্যি ভালবাসি। হয়ত ভালবাসি। ঠিক জানি না। তবে বীথির কথা ভাবলে কেমন একটা মায়া বীথির সারা শরীর ঘিরে পাক খেয়ে খেয়ে সবদিক ঢেকে দেয়। অন্তত এখন তাই দিচ্ছে। অনুতোষের শেষ কথায় প্রমথর মাথার ভেতরটা শুকিয়ে গেছে। আচ্ছা সুধাকে বাইরে থেকে দেখে এখনই কি কিছু বোঝা যায়। তা বেশ কিছুদিন ত হয়ে গেল। অবিশ্যি অনুতোষ বাইরে থেকে দেখে কি বুঝবে।

নীতিশ সৎ—বড়—বীথির জন্যে মানুষের মত ভাবে। প্রমথ ভেবে দেখল—সে সৎ হতে চায়. ভাল হতে চায়। হাতে আঙুল হাড়া হলে—আঙুলটা ভাল করার জন্যে ব্যথা সহ্য করেও আঙুলের হাড় ডাক্তারের কাছে চেঁছে আসতে হয়। তাকেও সৎ হতে হলে সব দোষ স্বীকার করতে হবে। বীথিকে ভাল-বাসতে হলে সুধার ব্যাপারে সব দোষ স্বীকার করতে হবে। বলতে হবে—আমি ভালবাসি না—একদিন দুপুরে—পরমেশদের বাড়িতে—শুধু বৌদি ছিল তখন, সুধারও প্রশ্রয় ছিল—বেশ ভালরকমই ছিল—এই মেয়েটাই নরকের দ্বার। আমি মুক্তি চাই। সুধার বাবদ কেউ যদি পৃথিবীতে আসে—তার দায়িত্ব নেব—বীথিকে সব বলব। বীথি যদি সব বুঝে রাজী হয়—তাহলে আমি নতুন মানুষ হয়ে যাব।

সামনের পেট্রল পাম্পে সার্ভিসিং হচ্ছে। একটা কাদামাখা এ্যাকসিডেণ্টে নাক-বোঁচা মোটরকে টঙে তুলে চার চারটে কালিঝুলি-মাখা ভূত রবারের পিচকিরি দিয়ে তেল না কি দিচ্ছে। গাড়িটা চোখবুজে আরামে তেল খাচ্ছে—সৎ হচ্ছে। প্রমথ আরামে সৎ হতে পারবে না! সেরকম কোন পথ নেই। তবু এসব ভেবে কিছু জোর হল মনে। ঠিক জোর না—খুব মরীয়া ভাব।

বীথিরা এই সকালবেলায় প্রমথকে আশা করেনি। সামনের পুকুরে কোন গন্ধ নেই। ছোড়দি চা দিল। হাবুলকে চান করাতে যাচ্ছিল বীথি। বৌদির হাতে তাকে জমা দিয়ে চুল বেঁধে অন্ধকার বারান্দায় দাঁড়াল। এখানে রোদ আসে না কিছুতেই। পাউডার ঘষে নিয়েছে মুখে। মুসকিল হয়েছে এই বোকা ছেলেটাকে নিয়ে। এখন সারাদিনের কাজের মধ্যে কি করে বীথি গিয়ে কথা বলে। এসব কি কিছুই ভাবে না প্রমথ।

প্রমথ দেখল, সে একটা কঠিন কাজ হাতে নিয়ে এসেছে। কাল বীথির

সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করা হয়েছে—আজ সেটা ঢাকবার জন্যে সাবান পাউডার নিয়ে এসেছে।

যুদ্ধের সময় লাভাররা ব্লাউজ পিস, সাবান, পমেটম উপহার দিত। এখন তাদের বয়েস চল্লিশের ওপর। এখন এসব উপহার দেয় না। কিন্তু গরমে আর কি দেওয়া যায়। চা দিয়ে ছোড়দি খানিক পরে বেরিয়ে গেল। বীথি ঢুকল। রীতিমত ভয় পেয়েছে। প্রমথ না জানি নতুন কি করে বসে।

চেয়ারের ওপরের কাগজে মোড়া সাবান আর পাউডারের কৌটো খাটের ওপর রেখে দিয়ে প্রমথ বলল, 'কাল না খেয়ে যাওয়া দোষ হয়েছে।' একটু থেমে বলল, 'এটা তুমি নিও।' বীথি আড়চোখে প্যাকেটটা দেখল।

যাক্ ভয়ের কিছু করল না তাহলে। বীথি কিছু আস্বস্ত হল। আস্তে কাগজে মোড়া প্যাকেটটা নিয়ে ট্রাঙ্কের ওপর রাখল। চানের আগে তেলখোঁপা বাঁধা। একখানা লাল শাড়ী বারান্দার তারে টানানো। রোদ পড়ে বারান্দাটা লালচে হয়ে গেছে। বীথির মা একটা একটা করে কি ফুল তুলছে সাবধানে। সেদিন ছোড়দি বলেছিল, 'ওগুলো দুপুরে ফোটে। দুপুরমণি।'

প্রমথ হুট্ করে চলে এল।

শিবপুর এই দুপুরে খাঁ খাঁ করছে। জলের ট্যাঙ্ক, শ্রীনিবাস দত্ত লেন, হাওড়া ময়দান, কাটাকাপড়ের দোকানের সারি, হাওড়া স্টেশন, ব্রীজ। আজ সোমবার। বীথি বিকেল তিনটেয় ট্যুইশানিতে বেরোবে।

কিন্তু বীথির কথা প্রমথর ভাবা কি ঠিক হচ্ছে। প্রমথ যেন অন্ত্যজ শ্রেণীর কেউ। সেই শ্রেণীতে আরও লোক আছে। যেমন নির্মল চক্রবর্তী। পেশা—মেয়ে বিক্রি। আরও আছে এমন লোক। কাগজের আইন আদালতে তাদের নাম বেরোয়। আমার বীথির সঙ্গে মেশা কি ভাল হচ্ছে। আমি সেদিন পরমেশদের বাড়িতে দুপুরে—আমার ইচ্ছে ছিল না। হঠাৎ হয়ে গেছে। আমি বিথীকে চাই। বীথি—দীর্ঘ পায়ের পাতা—কখনও কি আসিবে না—যুদ্ধের সময়ের রেকর্ড—বকুল বিছানো পথে—আসছে কি যাচ্ছে বোঝা যায় না—যদি নুপুর থাকত পায়ে—যদি চাকরী থাকত—বিয়ে হয়ে গেলে—লাল করে সিঁদুর পরে—গরদ না, বড় লাল পেড়ে শাড়ী।

সুধা অফিসে ছিল। প্রমথ একদমে তেতলায় উঠে এসে ঘরের সামনে দাঁড়াল। প্রমথকে দেখে সুধা বেরিয়ে এল। 'চল, চল এখান থেকে বেরোই। ও.এস. আসেনি আজ।' পাশে রেলের অফিস। সেখানকার বড় ক্যান্টিনে গিয়ে বসল। প্রমথর বুক কাঁপছে। বলল, 'তোমার শরীর কেমন আছে?'

প্রমথর কথা, মুখের থমথমে ভাবটাব দেখে সুধার খেয়াল হল। সে ত কবে

হয়ে গেছে। সুধার খুব হাসি পেল। সেসব কিছু মুখে না এনে বলল, 'হ্যাঁ, শরীর ত কিছু খারাপ হবেই!'

প্রমথ চমকে উঠল। বলতে যাচ্ছিল, 'একটা কিছু কর না। যে করে হোক্ থামাও।' কিন্তু কিছুই বলতে পারল না। হাতমোছা টেবিলের ঢাকনা ছাড়ানো চামড়ার মত নিস্তেজ লাগল। ডিমের গন্ধ। প্রমথ বলল, 'উঠছি।'

সুধা বুঝতে পারেনি এত তাড়াতাড়ি ঘটে যাবে—মানে প্রমথ চলে যাবে। কদিন ধরেই প্রমথকে ধরবার চেষ্টা করছে। কিছুতেই পাওয়া যায় না। ভাল করে পাওয়াই যায় না বছরখানেক। সেদিনের ব্যাপারটা সুধা কবে ভুলে গেছে! প্রমথ কী! এত ভীতু। কিন্তু প্রমথকে যে জন্যে দরকার ছিল বলা হল না ত। সুধাদের অফিসে লোক নিচ্ছে। দাসকে বলেছে সুধা। সব গোলমাল করে দিয়ে যায় কিছুক্ষণের জন্যে এসে। ওমলেট অর্ডার দেওয়া হয়েছে। এখন বসে থাকতে হবে। প্রাণে ধরে দুটো ওমলেট নষ্ট করতে পারবে না সুধা।

বীথি বলে, 'আর পারি না, যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে দিয়ে দাও।' প্রমথ দেখল, সে আর পারছে না। পাশের পেট্রলের দোকান থেকে কটা টাকা ধার করেছে সেদিন। দেওয়া হয়নি। অনুতোষের কাছ থেকে পাঁচটা টাকা নিল আজ। সাবান পাউডার কিনে এক টাকা পাঁচ আনা বেঁচেছে। রেলের ক্যাণ্টিনটা স্বর্গের মত লাগছিল প্রমথর। সুধা কেমন অবহেলায় ওমলেট দিতে বলে বেয়ারাকে। পরমেশদের বাড়িতে এসব করেও সুধা ঘাবড়ায় না। 'শরীর ত কিছু খারাপ হবেই'—কেমন অবহেলা করে বলে। তুমি বুঝতে পারছ না সুধা—কী হতে পারে ভবিষ্যতে।

প্রমথর নিজেকে আবার অন্ত্যজ লাগছে। সে, নির্মল চক্রবর্তী ওরা সব একদলের। বীথি, নীতিশ, পল্টু ওরা সব ভাল লোক। প্রমথও আরামে তেল খেতে খেতে মোটরগাড়ির মত সৎ হতে চায়। উপায় নেই। বীথিকে এসব কি করে বলা যায়। তাছাড়া প্রমথদের বাড়ি। শুনলে চমকে যাবে। সুধার ব্যাপার কিছু বলতে পারবে না। কিন্তু বীথির কথা যদি শোনে। আমার একটা কাজ দরকার—যে কোন কাজ, মাস গেলেই পয়সা দেয় যেখানে।

কাল রাত বারোটায় গঙ্গায় বান এসেছিল। জল এত উঁচু হয়ে উঠে আসে—জলের দেওয়াল। প্রমথ এখন এই পীচের রাস্তায় নিজেকে ধরে যদি আছড়াতে পারত তাহলে ভাল হত। সুধার ব্যাপার তাকে ভেতর দিয়ে কুরে কুরে এগোচ্ছে।

একটা পার্কে গিয়ে রাত দশটা অব্দি বসে থাকল। বাদাম, আইসক্রিম, সিদ্ধি মেশানো মালাই তারপর পথে এসে কোকাকোলা খেল। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে গরমে বাড়িটাকে সিন্দুক মনে হয়। আয়ুর অর্ধেক এখানেই শেষ। দরজা খুলতে বড়বৌদি বলল, 'তোর চাকরী হয়েছে। দুপুরে সাইকেল পিয়োন এসে এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার দিয়ে গেছে।'

প্রমথ সব ভুলে গেল। বলল, 'কোন অফিসের? হাওড়ার—'

'না, না, তোর অবিনাশদার অফিসের।' মা বলল হাসতে হাসতে। 'পুজো দেব শনিবার।'

প্রমথর খুব ভাল লাগল কথাটা। চান করতে করতে মনে মনে হিসেব করল—তা শ দুয়েক ত হবেই। বাথরুমে এক জায়গায় গর্ত আছে। ময়লা জল জমে। কাল সকালে মিস্ত্রি ডাকিয়ে ভরাট করে দিতে হবে। কত আর লাগবে, তিন টাকা। প্রথমে চারখানা পাটি কিনবে। পাশে শাড়ির পাড় দিয়ে সেলাই করে নিতে হবে।এই গরমে শোয়া যায় না চাদরে।

সাবান মেখে একঘটি জল ঢালল মাথায়। আঃ! এতদিনে চাকরী হল। হাউ নাইস। অবিনাশদা কথা রেখেছে। পল্টু যদি এখন কলকাতায় থাকত। আবার অণ্ডাল গেছে।

খাওয়া দাওয়ার পর উত্তেজনায় ঘুম এল না। সামনের বারান্দায় দাঁড়িয়ে থাকল। উল্টোদিকে মায়া বেকারির রুটিওয়ালারা রুটি নিতে এসেছে। সারি সারি সাইকেল গাড়ি। বড়বৌদি ঘুমের মধ্যে জল খেতে উঠে প্রমথকে দেখল। 'কী, ঘুমোস্ নি?'

'একটা কথা আছে বড়বৌদি।'

বড়বৌদি ভয় পেল। ওদের বড়দা এখানে নেই। তনু ঠাকুরপো যখন বিষ খেল তখন পানু আর কতটুকু। ওব দাদা চাকরীর খবর পেলে সুখী হবে।

বড়বৌদি পাশে এসে দাঁড়াল। বাড়ির সবাই ঘুমোচ্ছে। প্রমথ কিন্তু কিন্তু করে সব বলল। তারপর বড়বৌদির মুখের দিকে তাকিয়ে থাকল।

সুধার এবারকার হাবভাব দেখেই কেমন সন্দেহ হয়েছিল উমার। কেমন বেপরোয়া। মুখে বলল 'তোর খোঁজে এসে যেন শ্বশুরবাড়িতে এসেছে এমনি এ'টে বসত।'

প্রমথ অপরাধী হয়ে চুপ করে থাকল। তারপর বলল, 'কি যে হবে।' বলে দেখল, বড়বৌদি সুধার ব্যাপারে কেমন দয়ামায়াহীনভাবে কথা বলছে।

বোধহয় দেওরকে আগে বাঁচানো দরকার বলেই। এ বাড়িতে বিয়ে হয়ে এসেছে—তা কুড়ি বছর ত হয়ে গেল।

'পুরুষমানুষ এসব করেই ফেলে'—কেমন আপন মনে বলে ফেলল বড়-বৌদি—তারপর কি যেন হিসেব করার জন্যে বলল, 'কতদিন আগে রে?'

প্রমথ হিসেব করে বলল।

'কিছু ভাবিস না। পাগল নাকি।' তারপর বলল, 'তোর চিন্তা কি? মেয়েদেরই ভাবনা বেশী। বোকার মত কিছু করিস্ না। আমাকে বলিস্।' শুতে যাওয়ার আগে বলল, 'তোকে আটকে রাখার জন্যে এসব বলছে।'

প্রমথর এ চিন্তা আগে হয়নি। সুধার সম্বন্ধে এভাবে ভাবতে হচ্ছে বলে তার দুঃখ হচ্ছে। কিন্তু সুধাও তাহলে তাকে আটকাবার জন্যে মিথ্যে মিথ্যে ভয় দেখাতে পারে। কলেজের সেই আলাপ এখন ভয় দেখানোর লুকোচুরিতে এসে ঠেকেছে!

পরদিন প্রমথ এ্যাকাউণ্টসে জয়েন করল। পে বিলের হিসেব দেখেন রায়বাবু—তার পাশে একটা চেয়ার দিল বসতে। কদিন একদম মাথা তুলতে পারল না। নতুন কাজ, নতুন জায়গা। মাইনে প্রায় দু'শ। সাপ্লিমেণ্টারী বিল করতে কিছু বেগ দিল। অফডে-গুলো হিসেব করে মোট কদিন কাজ হয়েছে তার ওপর লগ বই দেখে যোগ করে নিতে হয়। মোটের ওপর কাজটা মন্দ না।

পর পর কদিন ভোরবেলা ঘুম থেকে উঠে অঞ্জু নৃপেনের সঙ্গে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে বেড়াতে গেল। শনিবার নৃপেন একটা ফাউণ্টেনপেন দিল। সুধা দেখেই বুঝেছে। কিছু বলল না। মাসের দ্বিতীয় শনিবার বলে অফিস ছুটি। একসঙ্গে খেতে বসে ঝগড়া বাঁধল। বড়দি আর সে খেটেখুটে সংসার দাঁড় করাচ্ছে—অঞ্জু বি-এ পাশ করল—তারও কিছু দেওয়া উচিত বাড়িতে। এই নিয়ে কথা কাটাকাটি হতে খাওয়া প্রায় বন্ধ হওয়ার যোগাড়।

দুপুরে ঘুম থেকে উঠতে মা তিনখানা সিনেমার টিকিট দিল। বলল, 'সন্ধ্যের শোতে যাবি। খোকন দিয়ে গেছে।'

খোকনদা এসেছিল। বলল 'জাগাওনি কেন?'

রেখার আগে ঘুম ভেঙেছে। চা খাচ্ছিল। বলল, 'বোধহয় আমরা

ঘ্মোচ্ছিলাম বলেই।' রেখার মুখে হাসি দেখে সুধা থামল। না হলে মাকে কিছু বলে দিত। বড়দি হাসি দিয়ে অনেক সময় অনেক কিছু বুঝিয়ে দেয়। আজকাল সুধা বড় খিটখিটে হয়ে যাচ্ছে। রেখার কেমন সন্দেহ হয় প্রমথকে। সুধা যাই বলুক, প্রমথর ভাবগতিক কিন্তু সুবিধার না। মুখে বলল, 'চল্ না আজ আমরা সিনেমা দেখি।'

কথাটা মন্দ বলেনি বড়দি।

অঞ্জু, সুধা, রেখা তিনজনে সেজেগুজে বেরোতে বেরোতে প্রায় ছটা। পথে আবার পান কিনতে গিয়ে পয়সা ভাঙানো নিয়ে আরও মিনিট পাঁচেক গেল।

সিনেমা হলের কাছাকাছি একটা ট্রাম থেকে প্রমথ লাফিয়ে নামল।

অফিস থেকে ফিরছিল। ঠিকই করেছিল আজ সুধাদের বাড়ি যাবে। সুধাকে একা পেলে পষ্টাপষ্টি সব বলবে—বলে জেনে নেবে। ট্রাম থেকে দেখতে পেয়েই কিছু না ভেবে নেমে পড়েছে।

প্রমথকে দেখে রেখা দুটো টিকিট নিয়ে অঞ্জুকে টানতে টানতে হলে চলে গেল। একটু একা থাকুক দুজনে।

'সেদিন অমন ভূতের মত চলে গেলে? কোত্থেকে আসছ?'

'অফিস থেকে। তোমাকে ফোন করেছিলাম কাল—অফিসে ছিলে না।'

সুধা অফিসের কথায় চমকে গেল। বলল, 'সেই অবিনাশবাবুদের ওখানে? কই বললে না ত খবরটা এ'কদিনে?—চাকরি হয়েছে—' তারপর থেমে গেল। সত্যি এতবড় খবরটা প্রমথ এসে একবার জানাবার সময়ই পেল না।

প্রমথর হাসবার কোন ইচ্ছে ছিল না। তবু হাসল। একটু আগে মিথ্যে বলেছে—সুধার অফিসে কস্মিন্‌কালেও ফোন করেনি সে।

'ওজন নেবে?' সামনেই সিনেমা হলের ওয়েটবক্স। প্রমথ জানে এসব বললে সুধা স্বাভাবিক হয়ে আসে। সত্যি কলেজের সেই আলাপ এখন ভয় দেখানোর লুকোচুরিতে এসে পৌঁছেছে। সেদিন রাত্তিরে বড়বৌদি কিসব বলেছিল। 'আটকে রাখার জন্যে ভয় দেখাচ্ছে।' সুধার জন্যে কষ্টও হচ্ছে। সুধা প্রমথকে ভালবাসে। এর মধ্যে কোন ভুল নেই। ওজন নেওয়ার কথায় সুধা সত্যি স্বাভাবিক হল। বড়দি ওরা সিনেমা হলে। হয়ত ছবি এখুনি আরম্ভ হবে। তা হোক্ গে। প্রমথর ত চাকরী হয়েছে। ও! কতদিন পরে একটা ভাল কিছু ঘটল তাহলে।

ওজন উঠল পাউন্ড স্টোনে। প্রমথ মণ সেরে হিসেব করে দিল।

'আগের চেয়ে মোটা হইনি?' সুধা এমন কিছু একটা বলবে প্রমথ তা জানত।

কিন্তু প্রমথর মাথায় এসব যাচ্ছিল না। তার মনে হল সুধা অনেক মোটা হয়ে গেছে। যা হওয়া উচিত তার চেয়ে অনেক বেশী। প্রমথ মাথা নেড়ে দিয়ে বুঝল, সে জন্যেই ত ভয় আরও বেশী। লাল নীল বিভিন্ন রঙের জামা কাপড় পরা লোকজন, বাস ট্রাম সব নিয়ে রাস্তাটা রঙীন। অথচ তার কাছে এসবের কোন মানে নেই। এখুনি এক কথায় সব অন্ধকার হয়ে যাবে হয়ত।

প্রমথ বলল, 'তাহলে সুধা ডাক্তার দেখাতে হয় একবার।' প্রমথ ঠিকই করে ফেলেছে—ডাক্তার দেখিয়ে যা হওয়ার হবে।

সুধা ভাবছিল—এমন সুন্দর সন্ধ্যায় সিনেমায় না গেলেই ভাল হত। চাকরীর খবর দিতে পারেনি হয়ত কাজের চাপে। অনেকদিন আগে—কতদিন আগে—বছর দুই—না কিছু কম বোধহয়, প্রমথর সঙ্গে একদিন সিনেমায় যাওয়ার কথা ছিল। সেদিনও অঞ্জুর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছিল। কি জন্যে যেন—ঠিক মনে পড়ছে না, সেদিন আর সিনেমায় যাওয়া হয় নি। বৃষ্টি হচ্ছিল। আগের ব্যাপারের সঙ্গে পরের ব্যাপার কেমন মিলে যায়। আরও অনেক হয়েছে এমন। প্রমথর মুখে ডাক্তারের কথায় অবাক হল প্রথমে। থমথম করছে প্রমথর মুখ। একরকমের রাগ মেশানো দুঃখে সুধা তেতে উঠল। সামনে পীচের রাস্তা—লোকজন—ফাঁকা থাকলে, কেউ না থাকলে, সুধা এখানে উপুড় হয়ে পড়ে কাঁদত। তারপর ভেবে দেখল, এর জন্যে সে নিজেই দায়ী। কেন রসিকতা করে সেদিন বলেছিল, 'বাবা ডাকবে, মা ডাকবে।' তারই দোষ। তবু এখন এই পথের মধ্যে এতবড় একটা হিসেব নিতে প্রমথ ট্রাম থেকে লাফিয়ে নামল!

হেসে বলল, 'কি ভাব আমাকে তুমি? ঠিক করে বলত?' বলেই সুধা বুঝতে পারল তার মুখের হাসি এখন ঝলসে উঠেছে।

সুধার মুখ দেখে প্রমথ ঘাঁটাতে সাহস করল না। এই মেয়েটার মুখের কথায় তার ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। এক মুহূর্তে ট্রাম-বাস, আলো, চাকরী, বীথি সবকিছু অর্থহীন হয়ে যেতে পারে। প্রমথ আর পারছে না। আজকাল একা হলেই সে আর পারে না। ভাবতে ভাবতে মনে হয় কালি মাখানো দলা দলা ব্লটিংয়ের মণ্ডে সে ডুবে যাচ্ছে। মণ্ডের ভেতরে গোবরের গন্ধ, পচা গোবরের গন্ধ।

সুধার এ কথার কি উত্তর দেবে। যদি খুব জোরে সুধার কানের কাছে বলতে পারত—তুমি ইচ্ছে করলেই আমার সামনের দিনগুলো ভাল হয়ে যায়। আমি নতুন হয়ে যাই।

তা না বলে বলল, 'কিছুই না। মানে সময় থাকতে, ডাক্তারের কাছে গিয়ে—'

সুধা শান্ত হল। 'না, ডাক্তারের কাছে যাওয়ার দরকার নেই। সেসব কোন ভয় নেই।'

প্রমথ নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারল না। 'ঠিক বলছ?' বলতে গিয়ে বুঝল এই সময় তার মুখে হাসি ফুটে ওঠা ঠিক হচ্ছে না। কথা এত জোরে বলে ফেলেছে।

'চেঁচিও না। আমার থেকে তোমার কোন বিপদের ভয় নেই।' কথাটা অভিমানের মত শোনালেও সুধার মনে হল—এ কার সঙ্গে আমি এতকাল আছি, যতই ভাবি না কেন প্রমথ ভাল, প্রমথ বড়, একদিন সে বিরাট হবে—আসলে ত জানি সে কি। মিথ্যেবাদী, অহঙ্কারী. হ্যাংলা, ষোল আনা ইচ্ছে আছে—অথচ ভীতু, রোগা, বদমাইস। একের নম্বরের বদমাইস। আমি ত কবে ওসব ভুলে গেছি। একদিন ওভাবে দুজন হঠাৎ একসঙ্গে হয়ে যাওয়ার কথা ভেবে সুধার নিজের সারা গা নোংড়া মনে হল। আস্ত একটা জ্বরো রুগী। তাকাচ্ছে কেমন করে—আমার সঙ্গে এতদিনের ভাব সব যেন এ প্রমথর সঙ্গে না—অন্য কোন লোকের সঙ্গে—তার নামও একদিন প্রমথ ছিল।

'রাগ করলে?'

প্রমথর এই হাসি উল্টে পড়া হাসিতে. কথার কায়দায়, আরও রাগ হল। রাগ ঠিক না—কেমন মনে হচ্ছে সামনে কোন কিছু নেই। তুমি না নম্বব বাড়িয়ে বলতে আমাকে? তুমি না অন্ধকারে পাথর হয়ে থাকতে চাও কার্জন পার্কে? লোকে এক ডাকে চিনবে! কচু হবে। ঠিক এই সময় সুধার মনে হল. বড়দি অঞ্জু মা বাবলু এরা আমার নিজের। এদের মধ্যে আমি আবার চলে যাব। প্রমথর পক্ষ নিয়ে আর তর্ক করব না। নাক ঠোঁট চোখ সব কেমন মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। নেশা করে নাকি প্রমথ। ভাঙ্, না হোক্ মোদক। বুড়ো ভাম্ কোথাকার! অথচ সেবারে—গত বছর রিক্সায়. রেসকোর্স থেকে ফেরার পথে, কত পষ্টাপষ্টি বলার জেদ—'তোমার বাবাকে আজই সব বলব।' সুধা আর দাঁড়াতে পারল না। এক নম্বর লায়ার...।

'চল্‌লে?'

গেট দিয়ে ঢুকতে প্রমথর কথা কানে গেল। ফিরে উত্তর দেওয়ার ইচ্ছে হল না সুধার। এখন অনেকক্ষণ অন্ধকারে গিয়ে বসে থাকবে। সামনে ছবি চলবে।

ট্রামে ভিড়। লেডিজ-ট্রাম গেল। প্রমথ সেকেন্ড ক্লাসে উঠবার চেষ্টা করল। সেখানেও ভর্তি। খানিক হাঁটলো। মোড়ে পেট্রল পাম্পে লাল সালুর কাপড় ঝুলছে। পাড়ার পুজোয় সালু যেমন টানিয়ে দেওয়া হয়। জায়গাটা পুজো পুজো লাগছে। অথচ পুজোর কত দেরী। সালুতে নতুন কি একটা

তেলের গুণের কথা লেখা। মোটর গাড়িওয়ালাদের নেমন্তন্ন। কম খরচে ভাল ফল। নিওনের আলো। আজও দেখল কোণে একটা মোটর টঙে চড়ে যেন তারই দিকে তাকিয়ে হাসছে। দুটো ভূত নীচে পিচকিরিতে তেল দিচ্ছে। কেমন চোখ বুজে আরামে তেল খাচ্ছে মোটরটা। কদিন পরে পথে বেরোবে। এখন সং হচ্ছে। সুধার কথা মনে হল। খুব বেঁচে গেছে প্রমথ। কিন্তু এই এমন পালিয়ে চোরের মত সং হয়ে কেমন পুরো আনন্দ হচ্ছে না। এতদিনের দুশ্চিন্তা সরে গিয়ে কেমন সব ফাঁকা হয়ে গেছে ক'মিনিটে।

॥ একুশ ॥

পল্টু বলল, 'সিনেমা দেখাও, ট্যাক্সি চড়াও।' হাসতে হাসতেই বলল, 'কতকাল বেকার ছিলে!' মাইনে পেয়ে প্রমথরও ভাল লাগছে। অনেক কিছু কেনা বাকি। তাছাড়া বাড়িতে মাদিকে দিতে হবে। মালি, ওষুধের দোকান— এসবও কিছু কিছু হয়েছে। সব দিয়ে হাতে বিশেষ কিছু থাকার কথা না। তবু পল্টুর সঙ্গে রাস্তায় দাঁড়িয়ে হঠাৎ ট্যাক্সি থামিয়ে চড়ে বসতে প্রমথর কেমন যেন ভাল লাগল। কোন দরকার ছিল না—এটুকু হেঁটেও যাওয়া যেত, ঐ ত সিনেমা হল। তবু গাড়ি থেকে নামতে নামতে অবহেলায় নোট এগিয়ে দিতে কেমন একরকম লাগে। সবাই বোধহয় তাকাচ্ছে। কিংবা কেউই হয়ত তাকাচ্ছে না।

ছবি দেখে বিকেলে গড়ের মাঠে বসল। তারপর উঠে গিয়ে চীনে হোটেলে খাবারের অর্ডার দিল।

কদিন আগে মাখনবাবুর ওখানে বলেছিল, পল্টু আসবে শীগ্‌গিরি। মেজদি, মাখনবাবু, বীথি, কেয়া ওরা পল্টুর কথা অনেক শুনেছে প্রমথর মুখে। কেয়াই বলেছে, 'একবার দেখান না আপনার ভাইকে। এত শুনি আপনার মুখে।'

মাখনবাবু নেমন্তন্ন করেছিল। 'রোববার দেখে আনবেন। হাতে সময় নিয়ে বসা যাবে।'

চিকেন চাউ চাউ দিয়ে গেল। ভিনিগারে লঙ্কা ভেজানো। এক প্লেট ফ্রায়েড রাইসও দিল। খাওয়ার কায়দা দেখে বুঝল, পল্টু এসব জায়গায় অনেক এসেছে। কেমন অভ্যস্ত। অথচ ছোটবেলায় পল্টু কি ভীতু ছিল।

'সুধার খবর কি? আজকাল আর আসে না?'

পল্টুর কথায় প্রমথ চমকে গেল। সত্যি অনেকদিন কোন খবর নেওয়া হয়নি। তারপর সেদিনের দেখা হওয়ার পর—সিনেমা হলে যেভাবে দুজনে আলাদা হয়ে গেছে, তারপর কি আর দেখা হলে কথা বলা যাবে। সেদিন কেমন পালিয়ে চলে আসার মত লাগছিল প্রমথর। তবু ভাল, তবু অনেকদিন হল, সেই ভারি ওজনের মত দুশ্চিন্তা তার মাথা থেকে নেমে গেছে। আর, আশ্চর্য, সুধার কথা মনেই আসে না।

প্রমথ শুধু হাসল। কেননা, উত্তর দেবার মত কিছু নেই।

পল্টু প্রমথর এই হাসির নাম খুঁজবার চেষ্টা করেছে। কোন ভাল শব্দ হাতে পায়নি। তার একটা তীব্র সন্দেহ আছে—ন'দা নিশ্চয় এমন বুদ্ধদেবের মত হেসে নিজের মত করে ফেলে মেয়েদের! হঠাৎ বলল, 'আর কতকাল এসব করবে!'

প্রমথ জানে' 'এসব' মানে কি। এই আর কি হঠাৎ মিশে যাওয়া—খানিক ঘনিষ্ঠতা, তারপর বইয়ের পাতা ওল্টানোর মত এক পাতা থেকে অন্য পাতায় পৌঁছে যাওয়া—অনায়াসে, বিবেকের জায়গাটা যেন কামানের গোলায় উড়ে গেছে, সেখানে একটা হা করা গর্ত, অন্ধকার—শুধু গলগল করে অন্ধকার বেরোচ্ছে।

প্রমথ বলতে গেল, না আমি ওসব আর করি না। জোর করে নিজেকে পাল্টাচ্ছি, তা নয়—আজকাল চেষ্টা করেও আর আগের মত পারি না। করতে গেলে তালে মেলে না। বরং—

প্রমথ এসবের কিছুই বলতে পারল না। ভাবতে গিয়ে 'বরং' কথাটা মনে হতেই হঠাৎ মুখ খুলে গেল, 'না! এবারে বিয়েই করব।' বলে দেখল, বিয়ের কথা ত কোনদিন ভাবেনি? তবে বলল কেন?

পল্টু কিছু অবাক হল। ন'দা কি সিরিয়াস। সত্যিই যদি বিয়ে করে তবে কনে কে, কবে বিয়ে করছে, কেন এমন হঠাৎ বিয়ে করছে। এসব কথা আমার জানা উচিত। কিন্তু আমি জানি না। অভিমান হওয়া উচিত। এখানে—কিন্তু তা হল না। বরং পল্টুর মনে হল—'আর কতকাল এইসব করবে'—একথার উত্তরে হুট্ করে বলে ফেলেছে, 'না। এবারে বিয়েই করব।'

পল্টুকে প্রমথ বীথির কথা বলল। পর পর সব বলল। বলতে গিয়ে দেখল, যা যা মনে আসে তার সব ছোট ভাইকে বলা যায় না। খানিকদূর বলে সব জড়িয়ে যেতে লাগল। বেশীর ভাগ কথাই অসম্পূর্ণ বাক্যে গিয়ে শেষ হতে থাকল। তখন না পেরে প্রমথ বলল, 'আমি ট্যা করলেই ত তুই সব বুঝে নিস। বাকিটাও তেমনি বুঝে নে।'

পল্টুর বুঝতে বাকি নেই কিছু। একবার শুধু বলল, 'তুমি কি সিওর।'

প্রমথ একথার উত্তর দিতে পারল না। আগে অন্য মেয়ের বেলায় যে কোন শপথ ঠাট্টার মত বলতে পেরেছে। বীথির বেলায় বলতে গিয়ে মনে হল—অনেক দূরে, যেখানে আলোর গুঁড়ো কমতে কমতে অন্ধকারের কলো কালো ফুলে উঠেছে, সেখানে এক কোণে একখানা ঘোমটা দিয়ে বীথি দাঁড়ান। সবে বিয়ে হয়েছে। বর প্রমথ। এখুনি সিগারেট ধরিয়ে আসবে। মুখখানা এমন এই মেয়ের অসাক্ষাতেও খারাপ কিছু বলা যায় না। যদি ব্যথা পায়। পল্টুকে বলল, 'চল্ না তুই দেখে আসবি। কালই চল।'

পরদিন যাওয়ার সময় বাসে পল্টুর হাসি পেল। কারও বিয়ের সময় তার বড় কেউ গার্জিয়ান হয়ে কনে দেখতে যায়। কিন্তু এখানে আমিই গার্জিয়ান। ন'দার সব ব্যাপারেই তাই। মনে পড়ল, অনেকদিন আগে এক জায়গায় প্রমাণ করবার দরকার হয়েছিল—'ন'দা ভাল লোক।' সেখানে আমাকে গিয়েই বলতে হল, 'ন'দা ভাল লোক।' এর জন্যে নাকি আমার গায়ে যে বেশী মাংস আছে তাই-ই দায়ী। ন'দা ত তাই বলে।

প্রমথর কিছু চিন্তা হচ্ছিল। কাল যে হঠাৎ কেন বিয়ের কথা বলে দিল। এর আগে এমন স্পষ্ট করে একথা বলেনি কোনদিন—এমনকি আজকের মত এত খোলাখুলি ভাবে এসব আগে চিন্তাও করেনি। তবে হ্যাঁ, মাখনবাবুর বাড়িতে, ছোড়দিদের ওখানে ইদানীং তাকে যেসব যত্ন করা হয়—তাছাড়া বীথিকে একা পাওয়ার অধিকারবোধ এমন নিরঙ্কুশ চালে নির্বাধায় এগোবার পথ পায় তারপর আর পিছিয়ে আসাটাই কেমন ফাঁক বুঝে সুযোগ নেওয়ার মত অভদ্র। এসব ভাবতে গিয়ে দেখল বীথির জন্য তার কষ্ট হয়। এমন গভীর বিশ্বাসে সামনে এসে সরল করে হাসে। দীর্ঘ চোখ—পায়ের পাতা এমন দীর্ঘ, পায়ে নূপুর থাকলে বোঝা যেত—আসছে না যাচ্ছে।

খাওয়া দাওয়ার পর মেজদি হেরিকেন রাখল ফরাসে। অনেক বলাবলিতে বীথি এসে সতরঞ্চিতে বসল। পল্টু এখন একটু ঘাবড়ে গেল। দাদার জন্যে মেয়ে দেখতে এসে ছোটভাই হিসেবে ভবিষ্যৎ বৌদিকে কী প্রশ্ন করবে। বলল, 'রাঁধতে পারেন?'

'প্রয়োজনে পড়লে আমরা সবই পারি।' বীথি ভাবল এই উত্তরটাই বুঝি সবচেয়ে ভাল। কিন্তু প্রমথর খারাপ লাগল। এত ঘুরিয়ে বলবার দরকার কি। 'হ্যাঁ' বললেই ত হয়। পল্টুর দিকে তাকিয়ে বোঝাতে চাইল যে, এই উত্তরটা ভাল না হলেও বীথি রীতিমত বুদ্ধিমতী।

নীতিশ কেয়া খানিক পরে এল। ওরাও খেয়ে নিল। তারপর কথা উঠল গঙ্গার ধারে জালানের মন্দিরে যাওয়া যাক। মাখনবাবু ঠাণ্ডার অজুহাতে

গেলেন না। মেজদিও থেকে গেলেন। বীথি যায় কি করে। শেষে নীতিশ কেয়া পল্টু প্রমথ চারজনে গেল। জায়গাটা মন্দিরও না বেড়াবার জায়গায়ও না। খানিক সিমেণ্ট। তবে আলো পড়ে গঙ্গা এখানে মন্দ দেখতে হয়নি।

পল্টু কেয়া একথা সেকথা বলছে। নীতিশ প্রমথকে আলাদা বলল, 'তোমার মাকে, বাড়ির সবাইকে বলেছ?'

প্রমথ বলেনি। তবু বলল। 'হ্যাঁ।'

'তারা জানেন তোমরা দুজন দেখতে এসেছ?'

'বললাম ত হ্যাঁ।'

নীতিশ চুপ করে গেল। প্রমথকে সব বলতে পারল না। আসলে ছোড়দির বিয়ের ঐ ব্যাপারের পর সব ভাল করে না দেখে—ছেলের বাড়ির মতামত না জেনে হুট্ করে এ বাড়ির আর কোন মেয়ের বিয়ে হবে না। প্রমথকে সব বলাও যায় না এখন। যদি ভুল বোঝে।

ফেরার পথে নীতিশ বলল, 'কাল অফিসে দেখা হবে। আচ্ছা অবিনাশ-বাবু কটায় আসেন?'

'বারোটার মধ্যেই—'

'থেকো কিন্তু। অবিনাশবাবুর ওখানে কাজ সেরে তোমার টেবিলে যাব।'

'কি কাজ?'

'এই আর কি—বিজ্ঞাপন ডিপার্টমেণ্টে কি কাজ আছে বলছিলেন...'

আর কথা হল না। প্রমথ পল্টু বাসে উঠে গেল। নীতিশ কেয়া মেজদির বাড়ি। প্রমথ ওরা খানিকটা আগে এসে কি করেছে, কি বলেছে—তা জানতে হবে না!

অফিসে রায়বাবুর সঙ্গে একরকমের বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ফর্সা লম্বা মোটা আর বেশ ভদ্র রায়বাবু। বয়েস প্রমথর মতই কি দু'এক বছর বেশী হতে পারে। রসিকতা কিছু পুরনো দিনের কিন্তু কোথাও মাত্রাহীন না—বরং এখনকার চেয়ে অনেক ভাল লাগে। প্রমথর কেন যেন মনে হয়, রায়বাবু বছর দশ বয়েসে নীট বয় সু পরতেন, আর হাতে কাঞ্চন নগরের আসল ইস্পাতের ছুরি নিয়ে ঘুরে বেড়াতেন—সামনে টেবিল, পালঙ্কের নক্সা যা পড়ত তাতেই দাগ বসাতেন। মুখে চুরি করে খাওয়া হরলিক্সের গুঁড়ো লেগে থাকত। অথচ চাকর দুধের গ্লাস হাতে নিয়ে ফিরছে—কিছুতেই দাদাবাবুকে

ধরা যাচ্ছে না। রায়বাবুকে দেখে এসবই মনে হয় তার। দশ বছরের রায়-বাবুকে আপনি বলার মানে হয় না। কিন্তু এত সৌজন্য মেনে চলেন তাতে দশবছরের দস্যু রায়বাবুর ছবি চিন্তা করা গেলেও তাকে আপনি থেকে তুমি কল্পনা করা যায় না। বোঝা যায় ছোটবেলাটা আর্মিরি চালে চলেছে।

শনিবার কাজ কিছু কম ছিল। ছুটির দিকে দু দুটো বড় বিল এল। চালান সোমবার জমা পড়বে ফার্স্ট আওয়ারে। তাই আজ করে দিয়ে যেতেই হবে। ওভারটাইম আছে। প্রমথ ঠিক করে রেখেছিল, সকাল সকাল বেরিয়ে একবার পল্টুকে নিয়ে দর্জির দোকানে যাবে। বিজুর জন্যে সার্টের কাপড় পছন্দ করিয়ে নেবে তাকে দিয়ে। তারপর সন্ধ্যের দিকে আলাদা হয়ে যাবে দুজনে। পল্টুর পৃথ্বীরাজ, দুলু বিমলবাবু ওরা আছে। পল্টু সেদিকে যাবে—তখন প্রমথ হাওড়া গিয়ে টুক্ করে শিবপুরের বাসে—জলের ট্যাঙ্ক, কাছেই শ্রীনিবাস দত্ত লেন।

কথায় কথায় টিক মেরে যাচ্ছিল প্রমথ। এ্যাডভান্স বিলে চীফ এ্যাকা-উণ্ট্যাণ্টের সই থাকে। সেগুলো মেলাচ্ছিল রায়বাবু। হঠাৎ বলল, 'জানেন দত্ত, আপনি দেখতে অনেকটা সিনেমার নায়কের মত--কিংবা পকেটমারের মত।'

প্রমথ চমকে গিয়েছিল। রায়ের মুখ দেখে বুঝল সময় কাটাবার নির্ভেজাল বুলি। অফিস ছুটি হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। কেউ নেই। ঘড়ি, ক্যাশের কাউণ্টার, লম্বা চাতাল সবকিছু শূন্য। কোথায় চীনে পটিতে পটকা ফাটছে। রায় টেবিল ল্যাম্পটা জেবলে দিল।

আবার একটা কথা বলল রায়, 'আপনার যৌবরাজ্য নিশ্চয় অতি বিস্তৃত!'

প্রমথ গুণ দিতে দিতে মুখ তুলে হাসল। খানিকদূর এগিয়ে প্রমথ কাজ থামাল। মুখ তুলে দেখল রায় একমনে টিক দিচ্ছে। প্রমথ একবার কেঁপে গেল। যৌবরাজ্য মানে কি। রায় সব জানে নাকি। সুধার অফিস নিশ্চয় ছুটি হয়ে গেছে। সুধার ব্যাপারে আমার কোন দোষ নেই।

সাড়ে সাতটার মধ্যে হাতের কাজ শেষ হল। বেরিয়ে দেখল বাইরে বৃষ্টি হচ্ছিল। সবে থেমেছে। রায় উঠল শেয়ালদার বাসে। আসে বারাসাত থেকে। প্রমথ হাওড়ার ট্রামে লাফিয়ে উঠল।

স্ট্র্যান্ড রোডে এসে খানিকক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকল ট্রামটা। এখন ভীড় নেই এদিকে। ছবির গ্রীকদের মত পাকা ফুলকো চুলের একটা প্রায় উলঙ্গ পাগল নারকোলের মালায় করে হাইড্রেণ্টের জল তুলে চুমুক দিচ্ছে। পথের আলোয় চোখ দুটো খুব শান্ত স্থির মনে হল। সিমেণ্ট মোড়া ন্যাড়া অফিস পাড়া বৃষ্টি ভিজে খানিক সরস হয়েছে। প্রমথর মনে হল আর আধ ঘণ্টা বৃষ্টি হলে স্ট্র্যান্ড রোডের দু পাশ ধরে ঘাস গজিয়ে উঠতে পারে। পাগলটারও

বোধ হয় মনে হচ্ছিল সারা পৃথিবী সতেজ হয়ে উঠেছে। কি একটা বইতে যেন পড়েছিল মানুষ মৃত্যুর আগে সব কষ্ট দুঃখ ভুলে যায়—মনে হয় চারদিক সবুজ নবীন। কোন ক্ষত কোন বিষ কোথাও থাকে না। হাসপাতালে তন্দ্রার শরীরের পাঁচড়াগুলো একদিনে কেমন সেরে গেল। মনে হচ্ছিল মশার কামড়। সারা পৃথিবী কাৎ করে সব জল যেন স্ট্র্যান্ড রোডে এনে জমা করা হয়েছে। পাগলটা রাস্তা খোঁড়া একটা লম্বা গর্তের মধ্যে জলে চাপড় দিল, মুখ উঁচু করে হাসল—তারপর তার মধ্যেই শুয়ে পড়ল। হয়ত এখুনি মরবে। প্রমথ দেখার জন্যে মাথা নামাল—সঙ্গে সঙ্গে ট্রামটা চলতে সুরু করল।

হাওড়ায় বাসগুমটিতে দেখল বেলফুলের মালা বিক্রী হচ্ছে। বাসে ওঠার আগে চার ছড়া কিনল। মাখনবাবুর বাড়ি ঢোকার আগে সেগুলো পাঞ্জাবীর পকেটে চালান করে দিল। ছাদে মাখনবাবু—কি টানাটানি করে নামাচ্ছেন, বোধহয় সেই বড় কাঠের বাক্সটা—যেটার মধ্যে মাখনবাবুর ক্লাবের গদা বারবেল এসব থাকে। পল্টুর সঙ্গে বীথিকে দেখে যাওয়ার পর আরও দুদিন প্রমথ এসেছে। একদিন বাক্সটার গায়ে হেলান দিয়ে বীথিকে নিয়ে বসেছিল। বীথি তাদের ইস্কুলের শিল্প দিদিমণির গল্প বলেছিল।

ভেতরে দেখল সবাই আছে। বীথি মেজদি ছোড়দি—সবাই। শুনল কেয়া কাল এসেছিল। তাকে দেখে সবাই বেশ খুশী। এমনকি বীথি হাসি চাপবার জন্যে ভেতরের ঘরে চলে গেল। তাহলে সত্যি সত্যি কিছুদিন পরে তার সঙ্গে বিয়ে হয়ে যেতে পারে। প্রমথ একটা মালা মেজদির হাতে দিল, একটা ছোড়দির খোঁপায় ঝুলিয়ে দিল। ছোড়দি প্রথমে এতটুকু হয়ে গেল—তারপর বলল, 'প্রমথর কান্ড!' দেখে কিন্তু বোঝা যায় বেশ খুশী।

পকেটে হাত দিয়ে বুঝল আরও দুটো মালা রয়েছে। একটা বীথির খোঁপায় অন্যটা গলায় পরিয়ে দেবে। এখুনি কাজটা হয়ে গেলে ভাল হত। কিন্তু ছোড়দি রয়েছে। তার সামনে কাজটা করতে প্রমথর অপরাধী লাগবে নিজেকে। 'কতদিন এরকম আছি'—ছোড়দি কেমন বলে। বরং মেজদি মাখনবাবুর সামনে তেমন কিছু লাগে না। মাখনবাবু বাক্স টানাটানি করে নীচে এসে মাথা আঁচড়ালেন—তারপর প্রমথকে সিগারেট দেশলাই দুই-ই দিলেন।

ছোড়দি আজ অনেক কথা বলল। টিউটোরিয়ালে যারা পড়ে তাদের কি কি সুবিধা তাও বলল। সুধার বড়দি রেখা টিউটোরিয়ালে পড়ে। সত্যি সুধার কথা একেবারেই মনে পড়ে না। এখন কেন যেন প্রমথ নেতিয়ে পড়ল। সেই কোন্ সকালের দিকে অফিসে বেরিয়েছে। রাত্তির নটা বাজতে চলল, বীথিকে মালাটা পরানোই যাচ্ছে না।

একবার ছাদে ওঠার কথা পাড়ল। মাখনবাবু মাথা নাড়লেন। জায়গাটা ভাল না। আশপাশের বাড়িগুলো মেজদির শত্রুতে বোঝাই। কথা হবে শেষে।

সব হয়ে যাক—তারপর যেখানে ইচ্ছে যাওয়া যেতে পারে, কেউ তখন বলতে আসবে না কিছু।

এদিকে ছোড়দি যাই যাই বলেও যাচ্ছে না। সব রাগ গিয়ে ছোড়দির ওপড় পড়ল। আজ কেন যে মালা পরাতে গেল। ছোড়দি ফুলঝুরি হয়ে কথা ছড়াচ্ছে। কোনটা গুরুর কথা, কোনটা গুরুভগ্নীর—শেষে কৃষ্ণনগরের এক রাঙাদার গল্প যখন সুরু হল তখন একরকম জোর করেই বীথিকে নিয়ে সিঁড়িতে গিয়ে বসল প্রমথ।

বীথি ওপরের ধাপে প্রমথ ঠিক নীচে। উঁচু তারে মেজদির শাড়ি ঝুলছে—একটা সাময়িক আড়াল আর কি।

সিঁড়িতে বসে মালা পরাল প্রমথ। 'ছোড়দির নড়বার নাম নেই।' বেশ বিরক্ত হয়েই বলল।

'ছিঃ!'

স্পষ্ট অথচ খুব আস্তে এত তীব্র করে কোন শব্দ যে বলা যায় প্রমথ এর আগে তা জানত না। চুপ করে থাকল। একটু পরে নিজেকে স্বার্থপর লাগল। নীচে তখনও ছোড়দি কথা বলছে।

'এর জন্যে তুমিই ত দায়ী।'

'কেন?' বলে বীথি হেসে ফেলল। এত অস্থির।

'কখন ছাদে চলে আসতে পারতে।—তা না কোথায় রান্নাঘরের দিকে চলে গেলে।'

'বাঃ! আসি কি করে,—নাও ছাড়, উঁহু।'

প্রমথই আগে নেমে গেল। বীথি বোধহয় একটু পরে নেমে রান্নাঘর দিয়ে ঢুকল। প্রমথ তখন পুরোপুরি ধরে যাওয়া কয়লার মত জ্বলছে—এত মজা! বীথির গলার স্বর খুব উঁচু না—কিন্তু ইস্পাতের স্পোকের মত শক্ত ঝকঝকে অথচ বেশ সরু।

নীচে ছোড়দির গলা পেল। যখন ঘরে ঢুকল তখন ছোড়দি বলছে, 'যদি ক'বছর আগে জন্মাতাম!' প্রমথর বুক ধক্ করে উঠল। মুখটা বোধহয় কালো হয়ে গেছে। অন্ধকারে মুখ ঘুরিয়ে নিল। ছোড়দির কথাটা যেন কোথায় শুনেছিল। শুনবে কি—হ্যাঁ, নিজেই বলেছিল, অঞ্জুকে বলেছিল। 'যদি ক'বছর পরে জন্মাতাম!' 'কি হত তাতে? আমাকে পেতেন? কক্ষণো না। দাঁড়ান মেজদি আসুক, বলে দেব।' প্রমথ জানত সুধাকে অঞ্জু এসব কোনদিন বলবে না। কিছুতেই বলত না। আসলে সুধা ব্যাপারটাই পুরোপুরি ভুল করে ভুল জায়গায় পাতা একটা বিছানা। সেখানে মশারি টানাবার কোন দরকারই ছিল না। শুধু শুধু অভ্যেসের টানে এই সেদিন অবধি কি সব পর পর করে যেত প্রমথ। এখন ত তাই মনে হয়। আর কি সেরকম পারে?

মুখ ঘুরিয়ে বলল, 'আগে জন্মালে কি করতেন?'

'সে কি বলা যায়।' এমন করে হাসল ছোড়দি—যেন অনেক রহস্য আছে। তারপর বলল, 'কি করতাম নিজেই জানি না। এমনি বলে দিলাম!' খোঁপায় ফুল দিয়ে কিন্তু বেশ দেখাচ্ছে।

হঠাৎ ছোড়দি বলল, 'এটা সত্যি, আগে জন্মালে অনেকটা এগিয়ে থাকতাম।' ছোড়দির দিকে আলোও কম। হঠাৎ এমন করে কথা বলে! কোন্ দিকে এগিয়ে থাকত—সেকথা আর জানবার সাহস হল না প্রমথর। হয়ত বলে দেবে মরবার দিকে। উঠতে উঠতে বলল. 'বিকেলে আর হাত পা ওঠে না। সন্ধ্যে হলেই পিঠে ব্যথা আরম্ভ হবে।'

মাখনবাবু আর একটা সিগারেট ধরালেন। মেজদি ছোড়দির মুখের দিকে সোজাসুজি তাকিয়ে থাকল। প্রমথর গা ব্যথা করে না, সন্ধ্যেবেলা মন ভাল থাকে আজকাল, বীথি হয়ত সত্যি সত্যি একদিন তার বৌ হয়ে যাবে ভেবে কিছু আনন্দও হয়। ছোড়দির এসব কথার পর মনে হল, তার নিজের কোন-রকম কষ্ট না থাকাটাই যেন অপরাধ।

ছোড়দি যাওয়ার কিছু পরে মেজদি বলল. 'আজ চুড়ের এ্যাডভান্স করে এলাম। বানী নিয়ে তিনশোর ওপর পড়বে।' বীথি আবার কখন সামনের ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। আজকাল আর শুধু ভেতরে ভেতরে থাকে না।

প্রমথ বলল, 'এর মধ্যেই গয়নার অর্ডার দেওয়া আরম্ভ হয়ে গেল?'

'বাঃ আগে থেকে দিতে হবে না। একটা একটা করে বানাবে—তাছাড়া আরও কত লোকের অর্ডারও ত আছে—'

প্রমথর ভয় হল। সে কতদূর চলে এসেছে। মেজদি গয়নার দোকানে যাচ্ছে। টাকাও কিছু খরচ হচ্ছে নিশ্চয়। ওদিকে বাড়িতে পল্টু ছাড়া কেউ কিচ্ছু জানে না। জানবে কি বলে। জানালে যদি রাজী না হয়। রাজী না হলে যদি ঝগড়াঝাটি হয়। অবিশ্যি আজকাল লেটারবক্সে চিঠি ফেলার মত টুক্ করে রেজিস্ট্রি বিয়ে হয়ে যায়। কিন্তু মা যে খুব দুঃখ পাবে তাহলে। হৈচৈ. চারদিকে হুলস্থুল পড়ে যাবে।

'বানীতে তাহলে স্যাকরা অনেক টাকা পায়।'

'পাবে না। বেশ পায়। বীথি দুটো মাকড়ি ভেঙে সঙ্গে একটা আঙটি দিল—তারপর ত দুল বানাল—তাতেই ষোল টাকা বানী নিল।'

প্রমথ বীথির কান দেখল। এতদিন দেখা হয় অথচ কানের দুল ত চোখে পড়েনি একদিনও। বীথি চোখ নামাল। বলল, 'এসব ত আমার নিজের বানান।' বলে হাত দুখানা দেখাল। দুই হাতে সাত আটগাছা চুড়ি।

'এত সব বানালে কি করে?'

মেজদি বলল. 'ট্যুইশানির টাকায়।' তারপর প্রমথর অবাক হওয়া দেখে

বলল, 'টাকা সব একবারে আমি দিয়ে দিয়েছি। মাসে মাসে ট্যুইশানির টাকা থেকে আমাকে শোধ করেছে।'

প্রমথ এবারে অবাকের চেয়ে আশ্চর্য হল বেশী। অবিশ্যি অবাক আর আশ্চর্যে যদি কোন তফাৎ থাকে। কিছু চিন্তিতও হল। ছোট ছোট ট্যুইশানি আর কোথায় দু'তিনশ টাকার গয়না। এটা ধৈর্য, লোভ না স্বর্ণপ্রীতি। শেষে বীথির সুখী মুখখানা দেখে মনে হল—এসব বোধহয় সুন্দর হওয়ার জন্যেই করে বীথি।

বীথিই বলল, 'সেভিংস ব্যাঙ্ক থেকেও টাকা তুলতে হয়েছে।' ভীতু, খানিকটা লজ্জিত (যেন সামান্য কটা টাকা জমানোর মধ্যে দারিদ্র্য বুঝি আরও বেশী করে ফুটে ওঠে), এমনকি কিছুটা সুখীও মনে হল বীথিকে।

মেজদি বলল, 'বড়দা ওর নামে মাসে মাসে রাখত। বীথিও পাঁচ দশ টাকা করে রেখেছে।'

প্রমথ ভেবে দেখল তার হাতে এমাসে মাইনের পরও খাতা লিখে কিছু এসেছে। কোথায়—একটা টাকাও ত আর নেই।

হঠাৎ মেজদি বলল, 'বাড়িতে সব কি বলছেন?'

'সে ভাববেন না—মত আছে।' বীথি চলে গেছে। প্রমথ ভাল করেই জানে এ ব্যাপারে কারও মত থাকবে না। কিন্তু খোলাখুলি যদি অবস্থাটা বলে তাহলে বীথিরাও ভয় পেয়ে যাবে। তারাও আর এগোবে না। নির্মল চক্রবর্তীর ব্যাপারের পর তারা আর বাড়ি ঘর না দেখে, নিশ্চিন্ত না হয়ে বিয়ে দেবে না।

ফেরার সময় বীথিকে পৌঁছে দিতে হল। রাত হয়ে গেছে, রাস্তাটাও ভাল না। বাইরে গরমে চেয়ার নিয়ে বীথির বড়দা বসে। কোথায় যেন লুকোনো চৌবাচ্চায় জল জমা হচ্ছে। সাঁ সাঁ জলের শব্দ। হেরিকেনটা নেভানো। বাড়িগুলোর পেছনে বোধহয় বড় কোন ড্রেণ আছে। শব্দটা এত সরল, কাছে না গেলে বোঝাও যাবে না কী দুর্গন্ধ কী বীজাণু ঐ ড্রেণে আছে।

বীথির বড়দা বলল, 'বসবে না?'

প্রমথ একটু দাঁড়িয়ে থাকল। আজ বৃষ্টি না হলেও কোথায় যেন সেই ওষুধের গন্ধটা বেরোচ্ছে। উঠোনের ঝুপসি ঝুপসি গাছগুলোয় ফুলও ফুটেছে। বীথি ভেতরে যেতে বীথির মা বেরিয়ে এল। সেই ওষুধের গন্ধটা আবার পেল। বীথির মা কিছু বলার আগেই প্রমথ বলল, 'চলি।'

॥ বাইশ ॥

ক'মাসে সব কেমন পাল্টে গেল। পর পর কতগুলো জিনিস হয়ে যাচ্ছে। এখন যেন ইচ্ছে করলেও বীথির ব্যাপারে পিছিয়ে আসার উপায় নেই। আসল কথা ইচ্ছেও নেই। কিন্তু জোর করে ঝপ্ করে বিয়ে করার সাহসও হচ্ছে না। মেজদা বড়দা যেভাবে বিয়ে করেছে—আশীর্বাদ ইত্যাদি এসব হলেই যেন ভাল। প্রমথর কিছু অস্বস্তি লাগছিল ক'দিন ধরে। বীথি গয়না গড়ায়, সেভিংস্ ব্যাঙ্কে টাকা রাখে, টুইশানি করে। বিয়েটা বীথির পক্ষে কত দরকারী! কত আগে থেকে তৈরী হচ্ছে বীথি! অথচ তার নিজের ত কোনদিন বিয়ে খুব জরুরী মনে হয়নি।

প্রমথ কখন বীথিকে তুমি বলতে সুরু করেছে। কেবল বীথির দাদার ছেলেমেয়েগুলোকে ভয়। তারা যদি রটিয়ে বেড়ায়। প্রমথ দত্ত তাদের পিসে-মশায় হবে। যদি শেষ অবধি না হয় সেই ভয়ে ব্যাপারটা তাদের কাছে চেপে যাওয়া হয়েছে। শিপ্রা বা বীথির দাদার বড় ছেলে বাবলু সামনে এলেই বাড়ির বড়রা ব্যাপারটাকে যতটা সম্ভব ঢেকেঢুকে রাখে।

দুপুরের দিকে ইনফরমেশন অফিসারের অ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার এল। পল্টু বলল, 'ন'দা তোমার টাইম ভাল পড়েছে। রাহু বোধহয় কেটে গেল।'

প্রমথ হাসল। ইস্ আগে যদি এই চিঠিখানা আসত। কী ঘোরাই না ঘুরতে হয়েছে। খাওয়া দাওয়ার পর প্রমথ ঠিক করল ইনফরমেশন অফিসারের চাকরীতে যাবে না। নামেই অফিসার—টাকার বেলায় কলাপাতা। তাছাড়া একটা জায়গায় ঢুকেই টুক্ করে সরে পড়া ভাল না।

সেদিন আর অফিস যাওয়া হল না। বিকেলে বেড়াতে বেড়াতে শঙ্করের ওখানে গেল। শঙ্কর সব শুনে বলল, 'তাহলে ভাল সময় পড়েছে বল।'

প্রমথ কৃতার্থ হয়ে তাকিয়ে রইল। শঙ্কর বলল, 'পরিশ্রম কখনও আন-পেইড থাকে নারে—তোকে বলেছিলাম·না—ভাল একটা কিছু হবেই তোর।' তারপর কি ভেবে বলল, 'চাকরীটা নিস্ বা না নিস্—ব্যাপারটা সেলিব্রেট করি চল্।'

পকেটে একটা টাকা ছিল প্রমথর। শঙ্কর কাৎ হয়ে আয়নার দাঁড়িয়ে চুল

ঠিক করল খানিকক্ষণ ধরে, তারপর দুজনে পথে বেরোল। বেলা তিনটে সাড়ে তিনটে। আকাশে মেঘ থাকায় গরমটা কিছু কম। মাদ্রাজিরা ধুতি লুঙ্গি করে পথে বেরিয়েছে—গলিতে কফির গন্ধ। একটা সোলজার, নাকের নীচে ভারি গোঁফ, ঠোঁট গোল করে মোটা সুরে শিস্ দিচ্ছে—কোন গান হবে। প্রমথর মনে হল এই বিকেলে অফিসে এত ভাল লাগত না।

শঙ্কর বলল, 'সুধার সঙ্গে দেখা হল সেদিন। কিছু বলল না ত?' প্রমথর কথা দেখা হলেই জানতে চায়। শঙ্কর কিছু অবাক হয়েছে। শঙ্কর মুখ খোলার একটু আগেও প্রমথ ঠিক করেছিল—বীথির কথা আজ সব খুলে বলবে। সুধার কথা ওঠায় থমকে গেল।

শঙ্কর বলল, 'তুই কিন্তু মেয়েটাকে দাগা দিবি ঠিক। এত রোগা হয়ে গেছে।'

প্রমথ ইচ্ছে করলে অনেকক্ষণ ধরে শঙ্করকে বোঝাতে পারত—সুধাকে কেন সে চায় না। সুধার ব্যাপার দি এন্ড হয়ে গেছে। কিন্তু ভেবে দেখল বোঝাতে গেলে অনেকক্ষণ ধরে গ্যাজাতে হবে। হোয়াট ইজ লাভ? হু ইজ লাভার? ভাদ্রের মেঘের মত ভালবাসা কখন একটু বৃষ্টি হয়েই বহুদিনের মত শুকিয়ে যেতে পারে। কিন্তু এসব বলে লাভ? তবু এটা সত্যি এই এখন সুধার কথা মনে হওয়ায় প্রমথর সব কেমন ধুলোয় ভরে গেল। ফিরে নতুন করে মুছতে হবে সব।

সেই যে সিনেমা হল থেকে চলে আসা—তারপর আর দেখা হল কোথায়। প্রমথ যেন হাওয়ার মধ্যে এলোপাথাড়ি দৌড়চ্ছে—কিন্তু সামনে এগোতে গেলেই তারে শুকোতে দেওয়া শাড়ি কাপড় উড়ে উড়ে তার চোখে এসে পড়ে—আর একটু এগোলেই বড় রাস্তায় গিয়ে ওঠা যায়—কিন্তু এগোনো যাচ্ছে না, মুখের ওপরের শাড়ি কাপড় সরাতেই সময় চলে যাচ্ছে। আগে হলে সুধার কথায় প্রমথ আরও ভয় পেয়ে যেত। কিন্তু সেদিন ব্যাপারটা জানার পর প্রমথ আর তত ভয় পায় না। পাবে কেন—তাকে আটকাবার মত সুধার ত কোন অস্ত্র নেই আর। তবু নিজেকে দাগী মনে হল। একদিন সুধার সঙ্গে কত কি ছিল। ছিল সত্যি. কিন্তু প্রমথ ভাল করে টের পেল—এখন সে জন্যে তার কোন বাধ্যবাধকতা নেই।

সোলজারটা ট্রাম লাইন বরাবর হাঁটছে। এখান থেকে শিস্ শোনা যাচ্ছে। কী গম্ভীর। কার সঙ্গে দেখা হল।• শঙ্কর বলল. 'বাচ্চুদা একটা ক্যাপস্টান খাওয়াও।'

ভদ্রলোক কিনে দিয়েই চলে গেলেন। প্রমথর খারাপ লাগল। কয়েক বছর আগে সেও শঙ্করের সঙ্গে অন্যের সিগারেট খেয়েছে। তখন শঙ্কর অন্যের

কাছে দুটো সিগারেট চাইত—একটা নিজের, অন্যটা প্রমথর জন্যে। এখন যেন প্রমথর কিছুতেই সেসব আর আসে না।

শঙ্করকে বলল, 'সিগারেট নিলি কেন?'

'তাতে কি হয়েছে। হি হ্যাজ!' তারপর গম্ভীর হয়ে বলল, 'দ্যাখ্, আমার প্রেস্টিজ অত হাল্কা না।'

কথা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। একটি মেয়ে যাচ্ছিল পাশ দিয়ে। হাঁটার ঝোঁকে এতক্ষণ খেয়াল হয়নি। দেখেই শঙ্করের গলা ভারি হল। একটা অত্যন্ত অপরিচিত ভরাট গলায় বলল, 'দে আর অল সারভেণ্টস্।' বলে প্রমথর দিকে অসহায়ভাবে তাকাল। মেয়েটা ফুটপাথ ছেড়ে রাস্তায় নেমে পড়েছে। বোধহয় মোড়ের লেটারবক্সে চিঠি ফেলবে। হেসেই ফেলল শেষে, 'কিরে, চলে গেল!'

প্রমথ এসব জানে। কিছু বলল না। পথে মেয়ে পড়লে শঙ্কর ইংরেজিতে ভরাট করে কথা বলে। এসবের মানে হয় না বলে কিছু বোঝাতে গেল না প্রমথ। আগে সেও মেয়ে পড়লে যতটা পারে গম্ভীর গলায় কথা বলত।

একবার শঙ্করের আদেশে অন্নপূর্ণায় এক ভদ্রলোকের প্লেট থেকে চপ তুলে নিয়েছিল। একদম সামনা-সামনি। হকচকিয়ে গিয়ে ভদ্রলোক চুপ করে ছিল। সেই ফাঁকে দুজনে এসপ্লানেডের ভিড়ে ঢুকে গিয়েছিল। আর একদিন তিনটে ক্যানাডিয়ান টুরিস্টকে দুজন মিলে পথঘাট দেখাল। সে কি খাওয়া। তখন কি আনন্দ হত এসবে।

আজ সিগারেট চাওয়ার ব্যাপারটা বেশ খারাপ লাগল। যেন সে নিজে কোনদিন এসব করেনি! হঠাৎ ভদ্রলোক হওয়ার জন্যে উঠে পড়ে চেষ্টা করছে না ত? মন এমনিতেই খারাপ হয়ে গেল। তার চেয়ে অফিস যখন কামাই গেল তখন শিবপুর গেলেই হত।

কিন্তু রেস্টুরেণ্টে ঢুকে সব ভুলে গেল। শঙ্করের ব্যবহারে সব ভুলে যেতে হল। বারো আনার তিনটে কেক টেবিলে রাখল শঙ্কর। ফাঁকা রেস্টুরেণ্ট। তারপর আরম্ভ হল শঙ্করের কাজকর্ম। ব্যাপারটা যখন চাকরী পাওয়ার উৎসব তখন উপযুক্ত জাঁকজমকের ব্যবস্থাও শঙ্কর একাই করল।

প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার প্রাচীন ইনকা সম্রাট হিসেবে প্রমথকে রেড ইণ্ডিয়ান ভাষায় বরণ করল শঙ্কর। তারপর একখানা কেকের খানিক ভেঙে প্রমথর মুখে গুঁজে দিয়ে বাকিটা গপ্ করে নিজের মুখে চালান করে দিল। খাওয়া শেষ হলে বিখ্যাত কোন্ সাহেব কণ্ডাক্টরের কায়দায় হাত দুখানা খানিকক্ষণ শূন্যে দোলালো, তারপর হঠাৎ থেমে ছোঁ মেরে দুখানা কেকই তুলে নিল। খাওয়া হলে বলল, 'পয়সা আছে না? সিগারেট নিয়ে আয়।'

বিকেলটা বেশ ভালই কাটল। চাকরী পাওয়ার পর প্রমথর হাবভাবে রিটায়ার্ড লোকের আরাম ছড়িয়ে পড়েছে। তাই ত মনে হল শঙ্করের। যাওয়ার সময় কেমন হেলে দুলে প্রমথ গিয়ে বাসে উঠল।

অফিসে কদিনই একটা অবাক কান্ড লক্ষ্য করে যাচ্ছে প্রমথ। ন' তারিখ, দশ, তের, সতের এমনকি একুশ তারিখের যেসব বিল করে দিয়েছে তার একটাও পাশ হয়নি। অথচ অনিয়মিতভাবে একটা দুটো করে বিল বেশ ক্যাশও হয়ে যাচ্ছে। প্রমথ যে নিয়মে সাজিয়ে দিয়ে যাচ্ছে অফিস তা মেনে চলছে না। ব্যাপারটা জানতে হয়। রায়বাবু ঘরে নেই। শেষে কি ভেবে অবিনাশদার ঘরে গেল। আরও দুচারজন লোক ঘরে ছিল। ব্যাপারটা জিজ্ঞাসা করল। অবিনাশদা প্রমথর মুখের দিকে তাকাল। ভ্রু বেঁকে গেল, তারপর ঠোঁট কিছু একত্র হল—শেষে চোখ আধবোঁজা ভাবে প্রমথর দিকে তাকিয়ে অবিনাশদা বলল, 'ইউ আর এ মেয়ার...তোমার কাজ কেবল টিক দেওয়া। এ্যান্ড নাথিং এলস্।'

প্রমথর সব বুদ্ধি যেন একেবারে ভোতা হয়ে গেছে। খুব জোরে নাকের নরম মাথায় ঘুষি মারলে যেমন দুই চোখের মধ্যে দিয়ে মাথায় একটা ব্যথা চলে যায়—চোখের সামনে সব মুছে যায়—প্রমথ তেমনি অবিনাশের টেবিলের সামনে কয়েক সেকেন্ডের মধ্যে একটুকরো কাঠ হয়ে গেল। যখনই হঠাৎ সবকিছু গন্ডগোল হয়ে যায় প্রমথর তখনই এই তুলনাটা মনে আসে। শেষে অনেক কষ্টে বলল, 'আমি জানতে এসেছিলাম—এই বিলগুলো কে করে। আমি এক রকম করে দিয়ে যাই, হয়ে যায় আর এক রকম।...এগুলো কি আর আমি করব ?'

'তোমার স্পর্ধা ত কম নয় ? যাও এখান থেকে।'

যারা বসেছিল তারা প্রমথর মুখের দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমথ চলে এল।

নিজের চেয়ারে বসে প্রমথ খানিকক্ষণ দেওয়াল ঘড়িটার দিকে তাকিয়ে থাকল। আমাকে অবিনাশ চৌধুরী ক্ষণে অক্ষণে ইচ্ছে মত অপমান করে। ঘরে গেলে বসতেও বলে না। অফিসে আমার অস্তিত্ব অপমানের ওপর। বীথি আমার এই অপমানের কথা জানে না।

বিকেলে অফিসের বাইরে এসে অবিনাশদার কথাগুলোর উত্তর দিতে গিয়ে চোয়ালে এক রকমের আরাম হল। কেন যেন মনে হল অবিনাশদা বোধহয় তার বিরুদ্ধে কিছু শুনে তাকে এইভাবে অপমান করছে। হয়ত ভেবেছে প্রমথ বুঝি

বারিদবাবুর দলের। ওদিকে সেদিন সিঁড়িতে বারিদবাবুর সঙ্গে দেখা হতে সে হাত তুলে নমস্কার করেছিল। বারিদবাবুও হাত তুলে নমস্কার করলেন—কিন্তু একটা কথাও বললেন না।

অবিনাশদা তখন যা বলল তার চোখাচোখা উত্তর এখন মুখে আসছে। গা বেয়ে বেয়ে এক রকমের গরম কানের লতিতে চলে আসছে। ঠোঁটে কামড় খেয়ে বোঝা গেল উত্তর দেওয়া হচ্ছিল অবিনাশদার কথার—মনে মনে!

অথচ অবিনাশদার সঙ্গে কথা বলতে গিয়ে মুখে হাসি এসে যায়। ভুল জায়গায় বেশী কথা বলে যা বেসামাল অবস্থা হয়! ইচ্ছে নেই। অপমান করে। তবু মুখ কথা বলে। ভাবখানা—আমি আপনাকে এত ভালবাসি, আর অপমান করলে আসব না। তাতে অবিনাশ চৌধুরীর যায় আসে না। তার ওপরওয়ালা যতক্ষণ খুশী থাকে ততক্ষণ অবিনাশদার কারও দিকে তাকাবার দরকার নেই।

কিন্তু বেসামাল কথা সামলাতে গিয়ে প্রমথর অবস্থা হয় বিশ্রী। অনেকটা সায়েবের বিস্কুট প্রার্থনাকারী কুকুরের মত। লোকে বোঝায়—এইত সংসার ধর্ম। এসব অবস্থায় স্থিরধী হতেই হবে--যাদের ঘাড়ে দায়িত্ব তাদের ত সব সহ্য করতেই হবে। কেন যে সেদিন ইনফরমেশন অফিসারের চাকরীটা রিফিউজ করে বসল! হলই বা ছোট কোম্পানী।

কিন্তু একদিন যদি সব ভাল হয়ে যায়। অবিনাশ চৌধুরী ভাল হয়ে গেল। বুদ্ধির কাজের জন্যে যদি তাকে ডেকে পাঠায়।

কিন্তু আজ, অবিনাশদার ঘর থেকে বেরিয়ে আসার সময় প্রমথ আর যা বলতে পারেনি তা হল—স্যার আমার চাকরীটা খাবেন না—আমি আপনার বিশ্বস্ত কুকুর—বিট মি বাট ফরগিভ মি'

রাস্তা পার হতে হতে প্রমথর মনে হল বীথির বর হওয়ার একটা সুবিধা আছে। আমার পক্ষে অবিনাশদা যেমন ওর পক্ষে আমি তা হব না।

আরও দু একদিন অবিনাশদা এমন কি এর চেয়েও বেশী অপমান করেছে। যেতে যেতে প্রমথর মনে হল অবিনাশের সঙ্গে তার কথা হচ্ছে।

অবিনাশ বলল, 'যা-ও-ও-ও।'

ট্রাম যাচ্ছে—বাসও। ডাইংক্লিনের শোকেসে কোট প্যাণ্ট কিউ দিয়ে ঝুলছে। স্বপ্নের ছবির মত প্রমথ বলল, 'চুউ-প্-প্-প্।'

অবিনাশ থতমত। একটু পরে বলল, 'তোমার মেরুদণ্ড নেই।'

প্রমথ বলল, 'বোর্ডের ডিরেক্টরদের সঙ্গে যখন কোন কথা বলেন তখন গলা মোলায়েম হয়ে আসে কেন?'

'ভদ্রতা।'

'না, আপনারও মেরুদণ্ড নেই। কিংবা আমি যা করি তা হল ভদ্রতা।'

'বেশ, তাহলে—তাহলে তোমার ব্যক্তিত্ব নেই।'

'ভাল, আপনি আর পাড়ার মহেন্দ্র গুণ্ডা রিক্সায় করে দিল্লি যাচ্ছেন। সঙ্গে আপনার ব্যক্তিত্বও যাচ্ছে। বর্ধমান ছাড়িয়ে মহেন্দ্রর সঙ্গে তর্ক হল, মহেন্দ্র বলল, তবেরে—যাঃ! খানায় পড়ে গেলেন। মহেন্দ্র আর রিক্সা দিল্লি চলল। আপনি আর আপনার ব্যক্তিত্ব তখন গড়াগড়ি খাচ্ছেন।'

'এ ত গাজোয়ারী তুলনা।'

'তাইত আপনি করছেন—চেয়ারে বসে সুবিধা মত আদর্শ ভদ্রতার নমুনা দিচ্ছেন—'

'তবেরে—(অবিনাশ চৌধুরী চুল ছেড়ে আর কি)।'

'হ্যান্ডস্ আপ।' অবিনাশদা ভড়কে গেছে। স্বপ্নের মত প্রমথর মনে হল, সে বলছে — 'এটা লুইস গান। ঘোড়া টিপলে একসঙ্গে সত্তরটা গুলী বেরোয়।' স্বপ্নের মধ্যে কে যেন বাধা দিতে এল। গুড়ুম্—ধপাস্। তার-পর—উঃ! কি আনন্দ — গুড়ুম্ গুড়ুম্ — গুড়ুম্ গুড়ুম্। — একটার পর একটা কলা গাছের মত পড়ছে— । প্রথম জেতার আনন্দ। সব নির্বিচারে—কেউ বাঁচবে না—আমিও, ফাঁসী কে আটকায়—

প্রমথর মনে হল তার জ্বর হবে। পাগলের মত এসব কি ভাবছে। অবিনাশদা তাকে ভালবাসে। প্রথম গুলীটা তার গায়ে লাগলে মরবার সময় অবাক হয়ে প্রমথর দিকে তাকিয়ে থাকবে অবিনাশদা — 'শেষে তুমিও প্রমথ' এমনিভাবে যেন অবিনাশদার চোখ তখন কথা বলবে।

সমস্ত ব্যাপারটাই কেমন তালকানার মত এগোচ্ছে। পরের মিনিটে কি হবে বলা যায় না। এখানেই বীথি থাকে। প্রতিমার নাকটা কেমন হাত দিয়ে দেখতে গেলে সবাই খা খা করে ওঠে। বীথির নাকে হাত দিলে, 'আহ্ কি হচ্ছে' শুনতে হয় শুধু।

সব কিছুতে আজকাল ভয় করে প্রমথর। কেবল মনে হয় পায়ের ওপর দিয়ে ট্রামের চাকা চলে যাবে। অন্ধকার ময়দান দিয়েই তখন ট্রাম যাচ্ছে। প্রায় ফাঁকা সিঙ্গিল্ সিটে কোটপ্যাণ্ট পরা একটা লোক নোটবুকে কি টুকছে—মাঝে মাঝে তার দিকে তাকাচ্ছে: প্রমথ অন্যদিকে তাকাল। স্পাই না ত? আজ দিনটাই কেমন যাচ্ছে। নিশ্চয় স্পাই। শুনি থিক্ থিক্ করে চারদিকে। দূর থেকে বোঝা গেল না কি লিখছে। কালি ফুরিয়ে গেছে বলে কলম ঝাকাচ্ছে। 'এই—গায়ে লাগবে সবার'—বলতে যাচ্ছিল, ট্রাম তখন স্টপে। — সিঙ্গিল্ সিটের লোকটাও সেই দমকে উঠে গিয়ে এক দৌড়ে পাদানির সামনে। কলম খোলা রয়েছে হাতে। তারপর—হড়হড়, হড়হড় করে

বমি। মদের গন্ধ। 'ওঃ! তাহলে মাতাল, আমি ভেবেছিলাম—' এই মনে করে প্রমথর আরাম হল। সবাই বলল, 'নেমে যাও, নেমে যাও।' কণ্ডাক্টরও বলল। ড্রাইভারের জায়গায় বালি থাকে। এনে পাদানিতে ঢেলে দেওয়া হল। পাশে অন্ধকার ময়দান। লোকটা পিচের রাস্তায় নেমে গিয়ে পা ফাঁক করে গলা বাড়িয়ে দিল। শুধু বমি। অথচ দেখে মনে হবে যেন একটা কঠিন রাগ সেধে সেধে গলায় আনবার চেষ্টা করছে।

একটু দেরীতেই বাড়ি ফিরল। বাবা সামনের ঘরে বসে চা খাচ্ছে। কথায় কথায় বাবা বলল, 'অচিন্ত্যর বাবা অমূল্যবাবু নেই, না?'

'হ্যাঁ।'

প্রমথ জানে দুজনে একই সময়ের।

স্নান করতে করতে সেই বমি করা মাতালটার কথা মনে হল। লেবু জল খেলে বমি থামে অনেক সময়।

বাবা জলখাবার খেয়ে রাত নটা নাগাদ হাঁটতে গেল।

প্রমথ আপত্তি করতে মা বলল, 'যাক্, হাঁটলে হজম হবে। দীর্ঘায়ু হবে। হজম হয় বলেই ত খাটতে পারে।' তারপর থেমে বলল, 'দেখিস্ না ওর সময়ের কেউ আর নেই। উপেনবাবু শশীবাবু রিটায়ারের পর বসে বসে পট্ পট্ করে মরে গেল।'

মার কথাগুলোয় মাকেই সবচেয়ে স্বার্থপর মনে হল। নিজেরাও কম না। বাবা পরে মরতে চায় বলে খাটে। অবিশ্যি সবাই একদিন অমূল্যবাবুর ধামে যাব। অথচ আজ কেমন জ্বরের রুগীর মত অবিনাশদাকে গুলী করার কথা ভাবছিলাম। গুলী করলে আমার ফাঁসী হয়ে যেত। আসলে হয়ত আমি অবিনাশদাকে ভালবাসি। অবিনাশদা বোঝে না। খাওয়া দাওয়া জামা কাপড়ের জন্যে যে কাজ করতে হয় তাতে অবিনাশ চৌধুরী আমার তদারককারী। কিন্তু কেন যে অবিনাশদা এত জড়িয়ে পড়ে ব্যাপারটা পার্সোনাল করে তোলে—চাকরী অন্তপ্রাণ হয়! প্রমথ ঠিক করল কাল অফিসে গিয়ে একটু বেশী তেল দেবে—তাতে অবিনাশ ছোট হয়ে যাবে—তার চেয়েও বেশী ছোট হবে সে নিজে।

আজকাল কি হয়েছে, যেকোন কাজের মধ্যেই মনে হয় কি একটা আছে—কে যেন আছে। তাই জেনে সব রকম মন খারাপের মধ্যে গুপ্তধন আগলাবার মত করে বীথির নামটা সুড়ঙ্গ দিয়ে মনে আসে। আবার কখনও মনে হয় বীথির সঙ্গে বিয়ে হয়ে গেলে ত সবকিছুর শেষ হয়ে যাবে। তখন বীথির ব্যাপারটা ভারী বোঝার মত লাগে। কিন্তু কয়েক সেকেণ্ড পরেই ঘন একটা

আনন্দ দিয়ে বীথিকে ডুবিয়ে ফেলতে ইচ্ছে করে। তখন আর দেরী সয় না।

পরদিন অফিসে কিন্তু অবিনাশদা ডেকে পাঠালো। 'কিছু মনে করনি ত, নাও সিগারেট খাও।' সিগারেট ধরাবার পর অবিনাশদা সেই হাসিটা হাসল যাতে তাকে পবিত্র দেখায়। কথায় কথায় প্রমথ বলল, 'আপনি মানুষ ভাল। কিন্তু আপনার লেখা যে আজকাল কিছুই হচ্ছে না।'

অবিনাশ গম্ভীর হয়ে প্রমথর দিকে তাকিয়ে থাকল। শেষে বলল, 'তুমি আমাকে ঘেন্না কর?'

কথাটায় প্রমথর দুঃখ হল। কিন্তু কিছুতেই বলতে পারল না, আমি তোমাকে ভালবাসি অবিনাশদা। কেমন ভালবাসি তা জানি না। কিন্তু ভালবাসি। অন্যে খারাপ বললে লাগে। আমার থেকে আপনার কোনদিন কোন ক্ষতি হবে না। এমন কোন কাজ করব না যাতে আপনি ছোট হয়ে যেতে পারেন। চোখে জল এসে যেতে পারে মনে হল প্রমথর। পুরুষ লোকের কাঁদতে নেই। অন্যে খারাপ বললে তাকে বর্শা দিয়ে ফুটো করে দেব। তবে আপনি অনেক বাজে কথাও বলেন—যা হয়ত আপনি আগে বলতেন না।

'সেই মেয়েটির খবর কি?'

'কে?'

'সেই যে আমার টেবিলে নিয়ে এসেছিলে—'

মনে পড়েছে। সুধার কথা বলছেন। প্রমথ বলল, 'কোন খবর নেই।'

হাসতে হাসতে অবিনাশদা বলল, 'অল কোয়ায়েট!'

প্রমথ চুপ করে থাকল। তারপর হঠাৎ বলল, 'আমি বিয়ে করছি শীগ্‌গির।'

অবিনাশদা অবাক হল। 'কোথায়?'

'এখন কাউকে বলবেন না। নীতিশের শালীকে।'

'তাই নাকি। কই নীতিশ ত বলেনি।'

'এখনও সব ঠিক হয়নি। মানে শেষ অব্দি যদি ম্যাচিওর না করে—' বলে প্রমথর মনে হল সে যেন ইন্সিওরেন্সের প্রিমিয়াম নিয়ে কথা বলছে। তাছাড়া অবিনাশদার টেবিলে বসে অনেকদিন পরে সহজ হতে পেরে গলগল করে অনেক কথাই বলে ফেলছে। এখানে চাকরীতে ঢোকার পর অবিনাশদার সঙ্গে সহজ সম্পর্কটা কেমন ঘোরালো হয়ে উঠছিল দিন কে দিন। আজ অনেকদিন পরে আনন্দ হল। আগের মত কথা বলা যাচ্ছে।

কিন্তু একটু আগে সুধার কথা উঠেছে। সুধা মনে আসাতে কিছু সংযত হল প্রমথ। আরও মনে হল আমি সুধাদের বাড়ি গিয়ে অঞ্জুর দিকে তাকিয়ে থাকতাম। সত্যি বছর দেড়েক আগেও আমি কী ছিলাম—খারাপ, বাজে, অসৎ

ছিলাম। মনে হল, সুধাকে ঠকিয়ে আমি বাইরে এসে ভালো সেজে বসে আছি।

'দেখতে কেমন?'

'মানে আমি কি বলব—দেখলে বুঝবেন,' তারপর বলেই ফেলল, 'মুখে কেমন একটা পড়ে যাওয়া রাজসিকতা আছে,—।' আর বলতে পারল না।

'সত্যি বিয়ে করছ?'

প্রমথ মাথা নাড়ল।

অবিনাশদা লাল পেন্সিল দিয়ে সামনের কাগজে দাগ দিতে দিতে বলল, 'যেখানে ভালবাসা নেই—সেখানে বিয়েটাই ভালগার।'

'মানে?'

'তুমি কি ভালবাস মেয়েটিকে?'

প্রমথ কিভাবে বলবে। 'আপনার কি মনে হয়?'

'এই আর কি—আর পাঁচজনের অভ্যেস মত তুমি মনে করছ তুমি ভালবাস।' তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে অবিনাশ বুঝল কথাটা তার কাছে সত্যি হলেও আরও মোলায়েম করে বলতে হবে। 'মনে হয় বোধহয় ভালবাস না। তুমি ভালবাসতে পার না।' একটা সত্যির দরজা এইমাত্র খুলে গেছে এমনি ভাবে তাকাল অবিনাশদা।

প্রমথ দেখল, অবিনাশদা এইমাত্র যা বলল, কিছুদিন আগে সে নিজেও তাই ভাবত। তার যেন মনে হত সেসব দিন পার হয়ে এসেছে। তবে কি এখনও সেসব শেষ হয়নি। তার ভেতরের অন্ধকারের ঢাকনাটা এতদিন খোলা ছিল। সব অন্ধকার নিশ্চয় এতদিনে উবে গিয়ে শেষ হয়ে গেছে। তবে কি এখনও পেছন পেছন আসছে—যদি অন্ধকারটা কি মনে করে অন্যদিকে রওনা দেয় এই আশা করে সে কি এখনও পড়িমরি করে দৌড়চ্ছে।

'আমিই কি কাউকে ভালবাসি? কি জানি!' বলেই কেমন করে হাসল অবিনাশদা। তারপর বলল, 'তুমি আমাকে ঘেন্না কর। আমার স্বভাবের জন্যে আমার বোধহয় বন্ধু নেই। বোধহয় সবাই ঘেন্না করে আমাকে।'

অবিনাশদা আরও কিছু বলত। প্রমথ থামিয়ে দিল। 'এসব আপনার ভুল ধারণা।' কিছুতেই বলতে পারল না, আমি বোধহয় আপনাকে ভালবাসি। বীথিকে আমার যেন নিজের মনে হয়—একথাও বলতে পারল না। অনেকদিন আগে অবিনাশদাই যেন বলেছিল, 'ভূষিমাল জোটালে কোত্থেকে?' সেদিন সুধা সঙ্গে ছিল। অবিনাশদার কথায় প্রমথ সেদিনও কিছু বলতে পারেনি।

কিন্তু আজ যেন প্রমথ কিছু বলতে পারত। আমি একদিন রাত্তিরে নীতিশের সঙ্গে হাওড়া ব্রীজে দাঁড়িয়ে গঙ্গায় বান দেখছিলাম, এমন সময়

নীতিশ বলেছিল, 'বীথি বলেছে—যার সঙ্গে ইচ্ছে বিয়ে দিয়ে দাও—আমি আর পারি না।' এইসব শুনে আমি—আমিও আর পারিনি।

যখন উঠে এল তখনও এসব কিছু বলতে পারল না।

ছুটির পর বাইরে বেরিয়ে ভাল লাগতে লাগল। কিছুদিন ধরে অবিনাশদা যখন তখন যেভাবে ইচ্ছে খুব কঠিন কথা বলছিল। আগেকার মত খোলাখুলি আর মেশা যাচ্ছিল না। আজ সেই জট খুলে যাওয়ায় প্রমথর বেশ হাল্কা লাগছে। সত্যি একা একা অফিসের এইসব ভেবে ভেবে ইদানীং সে প্রায়ই গুলীগোলার কথা ভাবত। সব গুলী করে উড়িয়ে দেব—মনে মনে প্রায়ই একথা আওড়াত। এখন মনে হল সে রুগী হয়ে যাচ্ছিল। ভালবাসা না থাকলে বিয়েটাই ভালগার। অবিনাশদা ত বলে দিল। তার কি আছে তা জানে না। কিন্তু এখন যে বীথির কাছে যেতে ইচ্ছে করছে। সেদিন মালা পরাবার সময় ছোড়দির ওপর দারুণ রাগ হয়েছিল। আজ এই বিকেলে বড় অফিস বাড়িটার সামনে দাঁড়িয়ে সে কথা মনে হতে নিজেকে অপরাধী লাগল। কেমন স্বার্থপরের মত।

অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে—হাওড়ার বাস কোথায়? তারপর উল্টোদিকে হাঁটতে সুরু করল। কফি হাউসের বাইরে নীতিশ দাঁড়িয়ে ছিল। নীতিশকে বলতেই রাজী হল। কিন্তু সেখানেও বাসের দেখা পাওয়া গেল না। ট্রামে ঢুকতে গেলে গা ঘিন ঘিন করে। 'চল এসপ্লানেড থেকে উঠব।'

কথা বলতে বলতে এসপ্লানেডে এসে পড়ল দুজনে। কিন্তু কোথায় বাস কোথায় ট্রাম। শুধু কালো কালো মাথা। শোভাযাত্রার গোড়ার দিকে রোগা রোগা বিধবা—বৌও আছে, ছোট ছোট ছেলে সঙ্গে সঙ্গে দৌড়চ্ছে।

'তাই বল বাস ট্রাম নেই কেন। আজ সেণ্ট্রাল র‍্যালি।'

প্রমথ বলল, 'কিসের?'

নীতিশ কি একটা বলল—শোনা গেল না। শোভাযাত্রা যাচ্ছে। শেষ না হলে পথ পার হওয়া যাবে না। বিমান কোম্পানীর অফিসের সামনে একগাড়ি পুলিশ। ওয়াগনে কাঠের খুঁটি যেমন দাঁড় করিয়ে গাদানো থাকে লরির পাটাতনে তেমনি হাফপ্যাণ্ট পরা অনেক পুলিশকে অল্প জায়গায় গাদানো হয়েছে। তারা ঠাসাঠাসি করে দাঁড়ানো।

নীতিশ বলল, 'এস আমরা গুণে দেখি। কত লোক যাচ্ছে বোঝা যাবে।' তারপর একটা অঙ্কের নিয়ম বলল নীতিশ। এক মিনিটে যদি এত যায় তবে ঘড়ি ধরে বসে থাকলে বোঝা যাবে কত লোক যাচ্ছে। এইসব বলে নীতিশ

হাতঘড়িটার দিকে চোখ রেখে গুণতে থাকল। মাঝে একবার বলল, 'কাল সকালে কোন্ কাগজ সত্যি বলে বোঝা যাবে।'

খুচরো নেতা, কলোনীর উদ্বাস্তু, ধানকলের মেয়েরা আরও অনেকে গেল। শেষে প্রোসেসনের লেজ শুকতে শুকতে পুলিশের গোটা দুই গাড়িও গেল।

প্রমথ আর নীতিশ ধুতি পাঞ্জাবী পরেছে। যারা প্রোসেসন করে গেল তাদের মধ্যে হাফপ্যাণ্ট থেকে লুঙ্গি সব আছে। প্রমথ কোন কথা বলতে পারল না খানিকক্ষণ। 'আমরা ঐ ভিড়ে মিশে যেতে পারি না।'

প্রমথর কথায় নীতিশ চোখ তুলে তাকাল। মাথা নামাতে নামাতে অনেক কিছু মনে হল। কিন্তু মুখ দিয়ে শুধু বেরিয়ে এল, 'কোথায়—'

খানিক এগিয়ে দুজনে দাঁড়িয়ে পড়ল। বাস ট্রাম বন্ধ হয়ে গেছে। অতএব শিবপুর যাওয়ার কথাই ওঠে না। এমন সময় কে যেন বলল, 'ইউনিভার্সিটির ওদিকে কোথায় গোলমাল হয়েছে।'

প্রমথ বলল, 'আজকের রাতটা আমাদের বাড়ী থাক। কাল সকালে যেও।' নীতিশ কিন্তু কিন্তু করায় প্রমথ বলল, 'বড়দা বড়বৌদি পল্টু কেউ এখানে নেই। ঘর পড়ে আছে।' অনেকটা পথ হাঁটতে হল। বাড়ির দিকে যত এগোয় দুজনে—ততই নানারকম খবর শুনতে থাকল। লাঠিচার্জ, গুলী। আস্তে আস্তে বীথির কথা কখন বন্ধ হয়ে গেছে। মাঝে একবার কি একটা কথা বলবার চেষ্টা করল প্রমথ। তেমন জমল না। পথে কেউ কারও সঙ্গে কথা বলছে না। বাড়ী পেঁছিতেই দশটা হল। মুখে দেওয়া যায় না এমন রান্না। বড়দার খাটে শুয়ে পড়ল দুজনে। শোয়ার সময় নীতিশ বলল, 'কাল সকালে পায়ে কিছু ব্যথা হবে। আমরা কিন্তু কম হাঁটিনি।' প্রমথ মনে মনে হিসেব করে দেখছিল ক'মাইল হেঁটেছে আজ। 'কাল ভোরে তুলে দিও। ফার্স্ট ট্রামে যাব।'

'কেন? কেয়া চিন্তা করবে?'

নীতিশ দেখল প্রমথর এই কথায় হাসতে পারলে ভাল হত। কিন্তু হাসি এল না। তা কিছুটা ত চিন্তা করবে ঠিকই।

আজ প্রোসেসনটা সব গুলিয়ে দিয়ে গেছে।

অনেক রাতে ঘুম ভাঙতে পেচ্ছাব করতে উঠল প্রমথ। সামনের বারান্দায় দাঁড়াতে দেখল ঢাকনা ফেলা দুখানা রিক্সা টুং টুং করে আসছে। পথে একটাও আলো নেই। পাড়ার সিনেমা হলের তেতলায় অপারেটরের ঘরে আলো জ্বলছে শুধু। বোধহয় শেষ শো ভাঙল। একখানা রিক্সা প্রমথদের বাড়ির সামনে থামল। আলো নিভে গেছে। রিক্সাওয়ালা সলতে ঠিক করে নিল। রিক্সা চালু হতেই দেখল রিক্সায় পাড়ারই এক চেনা বেশ্যা বসে। কোত্থেকে ফিরছে।

মদনের দিশীর দোকানের পাশের গলিতে টিউবয়েলটা ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছে প্রমথ। আজ শহরে গোলমাল বলে অনেকদিন পরে মনের মত ফাঁকা রাস্তা পেয়েছে রিক্সাওয়ালা। আগেরটা কিছু এগিয়ে গেছে। সেটা ধরবার জন্যে ফূর্তিতে দৌড় দিল। রিক্সার ওপরের বেশ্যা টাল খেয়ে উঠল। 'করিস্ কি?' সামলে নিয়েছে। দিনের বেলার চেনা রাস্তায় অন্ধকারে এখন অনেক-গুলো মাদী কুকুর জোড়া বেঁধে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

আজ যে ঠিক কি হয়েছে কাল সকালের আগে বোঝা যাবে না। গুলী চলল না লাঠি—কিংবা কোনটাই হয়ত না, কিংবা দুটোই চলতে পারে। শিবপুরে বীথিদের ওদিকেও কিছু হয়েছে হয়ত। অর্ধেক ঘুমের পর সন্ধ্যে-বেলার প্রোসেসনের চেহারাটা আস্তে আস্তে প্রমথর মনে উঠে এল। অতবড় প্রোসেসনটাকে কলকাতা কোথায় উগরে দিল—কোথায় গিলে নিল।

এই গরমে নীতিশ ঘুমোয় কি করে। প্রমথর কিছুতেই মশারির ভেতরে ঢুকতে ইচ্ছে করল না।

॥ তেইশ ॥

পল্টু অফিসে এসে দেখল প্রমথ তার চেয়ারে নেই। ক্যাণ্টিনে গিয়ে খুঁজে পেল। গলা অব্দি বোতাম এটে চা খাচ্ছে ন'দা। দেখেই মনে হল ন'দা এখন একটি প্রথম শ্রেণীর অফিসি জীব। লোককে বেকার অবস্থায়ই সুন্দর লাগে।

'তুই আবার অফিসে এলি কেন?' আজকাল যেন প্রমথর অসুবিধে হয় পল্টু এলে। বেশ জমিয়ে বসেছিল। পথে বেরিয়ে কিছু ঠিক করা গেল না। সিনেমা, দুলুর ওখানে যাওয়া কিংবা কফি হাউস—কোনটাই মনে ধরল না। শেষে ঠিক হল বাড়ি গিয়ে দু'সের মাংস আনতে দেবে পণ্টু। বড়বৌদি এসেছে। রান্না করবে ঝাল দিয়ে।

বাস স্টপে এসে পল্টু বলল, 'ওকি! রেড্ সিগন্যালটা ভাঙা যে।'

ট্রাফিক পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাত দেখাচ্ছে। 'বাঃ! গুলী চলল। পাবলিক দুধের গুমটি পুড়িয়ে দিল।'

'এতটা হয়েছে।' তারপর থেমে পড়ল পল্টু। 'আমাদের ওখানে দুদিন ত কোন কাগজই পাইনি। তবে একটা কিছু যে হচ্ছে তা বুঝতে পেরেছি।'

প্রমথর আর বোঝানোর ইচ্ছে হল না। বলে বোঝানো যাবে না। 'হাওড়ায় তিনদিন কোন পুলিশ ঢোকেনি।'

'শিবপুরে?' পল্টু সোজাসুজি তাকিয়ে হাসছে।

শিবপুরে কিছু না হলেও দিন আট দশ ওদিকে যেতে পারেনি।

বাড়ি ফিরতে মার মুখ দেখল অন্ধকার হয়ে আছে। খাওয়া দাওয়ার পর বিজয় ঘটকের আনা বিয়ের সম্বন্ধের কথা উঠল। বড়বৌদি বলল, 'তার আগে বাড়িটা বদলাতে হবে। বিয়ে করে এখানে থাকবে কোথায়?'

পল্টু বলল, 'বাড়ি বদলানোর আগে ন'দার বিয়েটা দিয়ে দাও। নাহলে—'

মা বলল, 'তুই নাকি নীতিশের শালীকে বিয়ে করবি? পল্টু আজ সকালে বলছিল।'

পল্টু হাসতে হাসতে বলল, 'তুমি অস্বীকার করতে পার ন'দা?'

এই এক ধরণের মজা পল্টুর। নিত্যও এমনি করে।

হঠাৎ কিছু না—টুক্ করে বড়দাকে বলে দিল—প্রমথ না বড়দা, পরমেশের টাকা নিয়ে ঘোরাচ্ছে। বেচারার এখন টাকা দরকার—অথচ! এমনিভাবে সব বলে দেয়। দিন কয়েক আগে কিন্তু নিত্যর ওপর রাগ হয়নি। নিত্যর সেই বান্ধবী চায়নার দিদি—সে নাকি সেদিনকার জ্বরে মারা গেছে। এমনভাবে নিত্য বলল সেদিন! প্রমথ একটা সহানুভূতির কথাও বলতে পারেনি। একেবারে হঠাৎ।

অথচ এতে যে প্রমথর নতুন নতুন গণ্ডগোলে পড়তে হয় পল্টু তা বোঝে না। মা'র কথায় হ্যাঁ না কিছুই বলল না প্রমথ।

'অল্প বয়সী সুন্দরী দেখে বৌ আনব। দেবে থোবে—ফেনীর টাকাও শোধ হয়ে যাবে।'

রেবার বিয়ের সময় তিনু মাসী, ফেনী মাসী, বড় মামার বড় মেয়ে শ' পাঁচেক করে টাকা দিয়েছিল। ফেরৎ দেওয়া হয়নি। প্রমথ এবারও কিছু বলল না। ভাল করেই জানে মা যে রকম আশা করে তার সিকির সিকিও বীথির দাদা যোগাড় করতে পারবে না। কোত্থেকে দেবে।

মা এবার বলল, 'পল্টু যা বলল তাই যদি হয়—তবে আমাদের পথে বসাবি। কথা দেওয়া আছে তোর বিয়ের টাকায় শোধ দেব।'

এবারে আর প্রমথ থাকতে পারল না। 'ধার শোধ দেওয়ার জন্যে আমি বিয়ে করতে পারব না।'

'তা কেন। যেখানে সেখানে বিয়ে করে একটা দরিদ্র পরিবার বানাবি।' মা'র এই হ্যাংলামি প্রমথর কাছে বিষের মত। মা এবারে একটু একটু করে ছুঁচ ফোটাতে আরম্ভ করল। পল্টু শুয়ে শুয়ে সিনেমার ম্যাগাজিন দেখছে। মুখে হাসি।

'তোর ত কত প্রেম দেখলাম! সুধা, ইন্দিরা—সব নাম মনেও নেই—সুধা এসে সেদিন কত কথা বলে গেল—'

প্রমথ কেঁপে উঠেছিল। বলল, 'সুধা? এসেছিল? কোথায় বলনি ত?'

'কি বলব? প্রমথদা, প্রমথদা করে গেল—।'

প্রমথ চুপ করেই থাকল। কিন্তু সুধার কথা ইন্দিরার কথা তুলে মা যা তাকে বলল তা এখন আর খাটে না। কি করে বলি বীথির ব্যাপারটা অন্য-রকম। কি রকম তা বুঝিয়ে বলতে পারব না।

আঠারো তারিখ অফিসের পর অবিনাশদা ধরে নিয়ে গেল। 'এখনই যাবে কোথায়? চল চল।' ট্যাক্সিতে বসে বলল, 'অবিশ্যি যদি শিবপুরে যাও তবে আটকাই না।'

প্রমথ বলল, 'এখন যাব কি?'

'কখন যাও?'

'কখন আর—মানে ধরা বাঁধা কিছু ঠিক নেই, তবে—' প্রমথ খোলাখুলি কিছুই বলতে পারল না।

অবিনাশদা বলল, 'কেয়াকে দেখেছি। নীতিশের সঙ্গে এসেছে। ওরকম ফর্সা?'

'না। কালোই বলতে পারেন।' তারপর বলল, 'সবাই ত তাই বলে। আমার কিন্তু কেমন ফর্সা লাগে।'

অবিনাশদা হাসল। ট্যাক্সি এক লাফ দিয়ে ব্রীজ পার হয়ে গেল। মানে কলকাতার যে অব্দি ট্রাম তা পেছনে পড়ে থাকল। এবার খানিক যেতেই অবিনাশদার বাড়ি। মোড় ঘোরার আগে অবিনাশদা বলল, 'আজ আমার বিবাহ-বার্ষিকী।'

'তাই নাকি?' তারপর একটু উসখুস করল প্রমথ। 'বৌদি অপেক্ষা করে থাকবেন। সেখানে আমার গিয়ে হাজির হওয়ার মানে হয় না।' প্রমথ আগে থেকেই বুঝতে পারছে ব্যাপারটা। এইসব প্রিয় ঘটনা উপলক্ষে অবিনাশ একা থাকতে সাহস পায় না। কোন না কোন ভাবে কাউকে সঙ্গে রাখবেই রাখবে।

'তোমার অত ভাবতে হবে না। আমি বলেছি—তুমি যাবে।' তারপর হেসে বলল, 'এখন তোমার Boss হিসেবে বলছি।'

কলকাতা এখনও পুরোপুরি সেরে ওঠেনি। এত বড় একটা প্রোসেসন গেল। মনে মনে একটা ঘেন্নার ঢেউ অনেকেই পুষছে। অন্নপূর্ণার সামনের পীচের রাস্তায় দিন দুই লাল লাল দাগ ছিল। বাজারে ভাগে মাংস কেনার

সময় দেখা যায় ভারি হাত দা দিয়ে কেমন সহজেই এক কোপে অনেকগুলো মোটা হাড় ঘচ্ করে কেটে ফেলে।

কলকাতায় আগে অনেক রকম জিনিস নিয়ে আলোচনা হত। প্রোসেসনটার পর সবাই ঝিমিয়ে গেছে। কিংবা গুম্ মেরে বসে আছে। কোন জিনিস কেউ আলোচনা করে না। খবরের কাগজে মাঝে মাঝে খবর বেরোয়, কারা যেন শহীদ বেদী বানাচ্ছে, কারা যেন তা ভেঙে দেওয়ার চেষ্টায় আছে।

বাড়িতে ঢুকতে ঢুকতে হঠাৎ অবিনাশের মনে হল, সেই লাইনটা কার লেখা। হয়ত প্রমথ বলতে পারবে। 'স্বাবিরতা কবে তুমি আসিবে গো বল না তা।' কার লেখা। আমার ত মনে হয় আমি লিখব বলে ভেবে রেখেছি। একটা সবচেয়ে বড় মুস্কিল হয়েছে আপ্তবাক্যের সঙ্গে আমার জীবন মিশছে না। চল্লিশোর্ধে মানুষ গম্ভীর হয়, ঘন হয়, প্রবীণ হয়—আমি কি হলাম।

লিলি হাসতে হাসতে দরজা খুলল। তারপর প্রমথকে দেখে বলল, 'ভাল করেছেন এসে।' এই মহিলার রান্না প্রমথর খুব ভাল লাগে। কি মাংস কি ডাল সব। 'তোমার শাড়িটা পেয়েছি।'

অবিনাশদা মাথা তুলে বলল, 'লক্ষ্মণ তিনটের মধ্যে এসেছিল?'

'হ্যাঁ।' এমন করে মাথা নাড়ে লিলি বৌদি কিছুতেই মনে হয় না দশ বারো বছর হয়ে গেল বিয়ে হয়েছে। অবিনাশদার তাহলে তালে ঠিক আছে। ড্রাইভার দিয়ে শাড়ি আগেই পাঠিয়ে দিয়েছে।

খাওয়ার টেবিলে বসে দুজন মিলে খেল। বৌদি দাঁড়িয়ে থাকল। প্রমথ বলল, 'একি আপনি বসুন।' শেষে অবিনাশদাকেই বলল, 'আমাকে নিয়ে এলেন কেন আজ?'

'তাতে কি হয়েছে! বসুন ত আপনি।' বলে বৌদি জলের জগটা তুলে ধরল।

অবিনাশ ভেবে দেখল মাত্র কয়েকমাস আগে সে সোনেরিল খেয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। ভাগ্যিস শীতলের লিফ্‌ট্ মাঝপথে খারাপ হয়ে গিয়েছিল। তারও বোধহয় বছরখানেক আগে আমি অবিনাশ চৌধুরী শ্যামনগরে অন্ধকার ঘরে নীলিমার কোমরে তের সেকেণ্ডের জন্যে হাত রেখেছিলাম। মাটিতে নাকি একরকমের ক্রিমি আছে—খালি পায়ে হাঁটলে শরীরে ঢুকে যায়। আমি যে কতকাল এমনি খালি গায়ে খালি পায়ে খারাপ জিনিসে গড়াগড়ি দিয়েছি—এখন হয়ত ইচ্ছে করলেই ক্রিমির ডিম পাড়তে পারি।

প্রমথর সব খাওয়া হয়ে গেছে। তাকিয়ে দেখল, অবিনাশ কেবল মিষ্টিটা খেয়েছে। লিলি মুখ কালো করে তাকাল। ততক্ষণে অবিনাশ 'আমি কি করতে পারি ক্ষিধে না থাকলে' এমনি ভাবে তাকিয়ে উঠে পড়েছে।

বাচ্চারা আজ ঘরে নেই কেউ। লিলি পুরনো দুখানা রেকর্ড বেছে নিয়ে আলাদা করে রেখেছে। একবাক্স নতুন পিনও আনিয়েছে।

জানলার দিকে পিঠ দিয়ে বসে আছে অবিনাশ। অবিনাশের পেছনে বসতবাড়িগুলোর মাথার ওপর শহরের জলের ট্যাঙ্ক। কোণে একটা মোটা নল যত পারে ধোঁয়া ছাড়ছে। হঠাৎ ঘটাং করে একটা লম্বা আওয়াজ হল। দূরে মালগাড়ি শান্টিং হচ্ছে। শব্দের সঙ্গে সঙ্গে বিকেলটা ফেটে গেল—কোথায় যেন চিরে গেছে. ডুবন্ত সূর্য বাড়িগুলোর পেছনে এখন. পাড়ায় একটা বাচ্চাও আজ নেই (বোধহয় যেখানে গ্রাম সুরু সেখানে পুকুর কাটা দেখছে ভিড় করে), থাকলে অন্তত কিছু চেনা শব্দ পাওয়া যেত।

'চাবিটা নিয়ে এস।' অবিনাশ ডাক দিল। সঙ্গে মিষ্টি. মোলায়েম একটা আদেশও লুকোনো আছে।

লিলি নতুন শাড়িটা পরেছে। মাড় লাগানো আঁচল ফুলে উঠেছে। এখন কাঁধের পাশে পেছন থেকে আমের একটা পঞ্চপল্লব হাতে ধরে দাঁড়ালে দূর থেকে লিলি বৌদিকে ক্যালেন্ডারের লক্ষ্মী মনে হবে।

'বের কর।' না তাকিয়েই বলল অবিনাশদা। লিলি শক্ত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকল খানিকক্ষণ. তারপর ঝনাং করে চাবির গোছাটা টেবিলে রাখল।

'কি হল?'

'আমি পারব না।'

'এই দেখ। যাও না, আমি আবার উঠব।' ঘুম লাগানো হাসি অবিনাশদা যখন তখন হাসতে পারে। বেতে মোড়া একটা ছোট শিশি দেরাজ থেকে বের করে লিলি টেবিলে রাখল। তারপর প্রমথর দিকে তাকিয়ে বলল. 'দেখুন ত, আজ কোন মানে হয় এসবের।' প্রমথ হাসবে কি গম্ভীর হবে ঠিক করতে পারল না। ঘরে একটুও হাওয়া নেই। বৌদি ছোট গ্লাসটাও টেবিলে দিল। কলকল শব্দ করে খানিকটা গ্লাসে ঢেলে অবিনাশদা নিজেই শিশিটা বন্ধ করে দিল। তারপর হাতে নিয়ে দেখল লিলি নেই। 'দিস্ ওম্যান!' এমন করে দাঁত চেপে বলল যে প্রমথর মনে হল সে একটা চিলে কোঠার ওপর বসে আছে—তার সামনে গ্লাস ঠোঁটে লাগাচ্ছে যে সে অবিনাশদা না—অন্য একটা লোক. যে ইংরেজিতে কাঁদতে পারে।

প্রমথর আর ভাল লাগছে না এঘর। বেরোতে পারলে বাঁচে। বীথির কাছে যাওয়ার ইচ্ছে হচ্ছে। আমার অনেক রকম ইচ্ছে হয়। এই শরীরের থেকে বেরিয়ে আসতে চাই। কতদিন ভাবি অন্য কোন জায়গায় চলে যাব। গঙ্গা আর ভাল লাগে না। সে জায়গা কলকাতার চেয়ে অনেক ভাল। সেখানকার জাহাজ জলে নিয়ে যাওয়ার জন্যে আসবে। এখানে সব জায়গা

রোজ ছোট হয়ে যাচ্ছে। শরীর ছাতকুড়ো মাখা। কোন কাজে আসবে না শেষে। অথচ এর মধ্যেই আমি থাকি। কতদিন, ক'বছর আর এখানে থাকতে হবে। কারও সঙ্গে মেশা যায় না। মাথা ভর্তি চর্বি। চোখ খুললেই সামনে আমার শ্যাওলাধরা শরীরটা ঠান্ডা হয়ে দেখা দেয়। কতদিন এখানে আছি। ঘুরি ফিরি হাসি—চর্বি বাদে কিছুই জমা পড়ে না।

অবিনাশদা গ্লাসের মধ্যে সিগারেটের ছাইটা ফেলল।

কোন নতুন জায়গা বোধহয় নেই। অন্য কোন গঙ্গাও নেই। যে পথেই ঘুরি না কেন কলকাতা ঠিক পেছনে আছে—অন্যদিকে যায় না। বরং আমার ঘোরার শেষ নেই। তিরিশের শহরতলী মনে মনে ছেচল্লিশেও একই থাকবে। শেষে একটা বাড়ির মধ্যে থাকতে থাকতেই চুল সাদা হয়ে যাবে। শহরটাই একটা খাঁচা। আগুনে পোড়া কারখানা বাড়ির মত।

আমাকে ফেলে আমি কোথাও যাওয়ার জায়গা পাব না। এই ভাড়াটে বাড়িটা ভাড়া পরিষ্কার থাকলে আমার। আসলে সত্যি কোন জাহাজ নেই। থাকলেও ট্রাম লাইন বেয়ে আসতে পারবে না। সবটা যখন ভাড়াটে বাড়িতে নষ্ট আমরাও ভাড়াটে বাড়িতে বাড়িতে নষ্ট। এখানকার ম্যানহোলের ঢাকনা খুললেই মহিষের পেচ্ছাবের গন্ধ আসে। কতদিন পীচের রাস্তায় কালো শুকনো দাগ দেখেছি—দেখেই বোঝা যায় মহিষটা মাদী ছিল, পেচ্ছাবের জল হলদে ছিল—পেছনে গোয়ালা দাঁড়ান। আমি ত সবই জানি!

'আমি আর থাকতে পারছি না। আমি বেরোবোই অবিনাশদা।'

খুব আস্তে হাসল অবিনাশ, গলার স্বর আরও নীচু। 'কেন? দরজা জানলা খুলে দিচ্ছি। দেখ, ভাল লাগবে।'

'না। আমাকে বেরোতেই হবে। কাজ আছে।'

'কোথায়?' প্রমথকে আজ ছাড়তে ইচ্ছে করছে না। 'শিবপুর যাবে?'

প্রমথ মাথা নাড়ল। এখনও গেলে মাখনবাবুর বাড়িতে বীথিকে পাওয়া যেতে পারে।

'বেশত চল। আমিও যাচ্ছি।'

'আপনি যাবেন? বৌদি?'

অবিনাশ হাত নেড়ে যেন মাছি তাড়াল। 'যেতে দাও' বলে অবিনাশের মনে হল প্রমথটা বোকা এবং ছেলেমানুষ। লিলির জন্যে তোমাকে ভাবতে হবে না। লিলিকে আমি রীতিমত ভালবাসি। বিবাহ বার্ষিকীতে মদ খেলাম? সে ত করার কিছু নেই বলে খেলাম। ছুটে বাড়ি এলাম—ভাবলাম খুব একটা কিছু করতে হবে। কিন্তু এসে দেখি করার কিচ্ছু নেই। সময় আছে, সময় হোক—তখন সবকিছু হবে।

সর্টকাট করতে গিয়ে ট্যাক্সি আটকে গেল। অবিনাশদা ভীষণ অস্থির হয়ে উঠল। শেষে বলল, 'এই দেখ—তোমাকে আমি কত ভালবাসি। লিলি, নীতিশ ওদের ভালবাসার এ্যাকাউণ্ট থেকে দশ পারসেণ্ট শেয়ার তোমার এ্যাকাউণ্টে দিয়েছি।' বলেই হাসতে লাগল। 'সবকটা প্রেফারেন্স শেয়ার! ভালবাসার প্রেফারেন্স শেয়ার!'

প্রমথ ট্যাক্সি থেকে নেমে খবর দিতে গেল মাখনবাবুকে। অবিনাশদা ত তারই অতিথি। ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে অবিনাশদা এসে ঢুকল। সামনের ঘরে খানিকক্ষণ সিগারেট ফুকল তিনজনে। মাখনবাবু পানের প্লেট এগিয়ে ধরলেন। শেষে বীথি চা নিয়ে ঢুকল। প্রমথ চোখ দিয়ে বসতে বলল। অবিনাশদা হাসলেন। তাকিয়ে থাকলেন। তারপর বীথি উঠে যেতে বললেন, 'ভাল, ভাল!'

ঘরে গরম। শেষে ছাদে নিয়ে বসাল অবিনাশদাকে। মাখনবাবুর সঙ্গে শিবপুরের রাস্তা নিয়ে কথা হচ্ছিল। প্রমথ বলল, 'এদিকটা চেনেন?'

অবিনাশ বলল, 'দশ বছর আগে অব্দি কলকাতা হাওড়ায় যা ছিল—তার সব চিনি আমি। মানে—নতুন যেসব হয়েছে চিনি না। যাওয়া পড়ে না ত আজকাল।' অবিনাশের সবই চেনা। প্রায় চেনা। যখন বিডন স্ট্রীটে থাকতাম তখন দুশো তেত্রিশ টাকা মাইনে ছিল। টালিগঞ্জের বাসায় চারখানা ঘর ছিল। লিলির তখন বাচ্চা হবে। তখন ভাড়া দিতাম নব্বই—মাইনে ছিল তিনশ নব্বই। টালির নালার কাছে উঠে গেলাম যখন তখন পাঁচশ পার হয়ে গেছি। নয়ন দত্ত লেনে ইন্সিওর করলাম পঞ্চাশ হাজারের। প্রথম চার বছর কোয়াটারলি প্রিমিয়াম ছিল একশো বিরাশি। এখন মাসে মাসে প্রভিডেণ্ট ফাণ্ড কাটে বায়ান্ন টাকা।

ছাদে ছাদে বাড়ি লাগান। অন্ধকার করে সন্ধ্যে হয়ে গেছে অনেকক্ষণ। বীথির সঙ্গে প্রমথর হয়ত বিয়ে হবে। মেয়েটি লম্বা। প্রমথর কথামত মুখে সত্যি খানিকটা রাজসিকতা আছে। এখন প্রমথ শ দুই মাইনে পায়। আমিও ঐ রকমে বিয়ে করি লিলিকে। ফাঁকা ঘরে লিলির মুখে প্লেট থেকে সন্দেশ পুরে দিয়ে আলাপ। আচ্ছা প্রমথর বয়েসে ফিরে যাওয়া যায় না।

'উঠবে নাকি?'

'চলুন।' প্রমথর কিন্তু এখন যাওয়ার ইচ্ছে নেই। দরজায় বীথি, মেজদি মাখনবাবু দাঁড়াল। মাখনবাবুর ছাদে উঠে প্রমথর মনে হয় কলকাতার বাইরে লাফিয়ে পড়েছে—বোধহয় চৌবাচ্চার বাসি জলের মত পুরনো এই শরীরটাও প্রমথ কিছুক্ষণের জন্যে মেলে দিয়ে বাইরে এসে দাঁড়াতে পারে।

বাস আসতে দেরী আছে। প্রমথ ঠিক করল অবিনাশদাকে পণ্টাপষ্টি

বলবে—সে এখন যাবে না। কি আর মনে করবে অবিনাশদা। নিশ্চয় বুঝবেন। বীথি দরজায় দাঁড়ান। অবিনাশদার ঘাড়ে গালে অদ্ভুত একটা লাবণ্য। সত্যি এত ভাল লোকটাকে প্রমথ গুলী করার কথা ভাবে। প্রমথ যখন এসব ভাবে তখন তার গায়ে জ্বর উঠে আসে যেন। এমন কেটে কেটে অপমান করে—তখন আর মনে থাকে না আমি অবিনাশকে ভালবাসি।

এখন যাবে না বলায় অবিনাশ কিছু আহত হল। আমি ট্যাক্সি করে নিয়ে এলাম এতটা—তারপর মনে হল, এভাবে লোক যোগাড় করে চুক্তি করে বন্ধুত্ব হয় না। খুব একা লাগল। হাওড়ার সেই মেয়েটির কাছে যাবে। চার বছর কোন যোগাযোগ নেই। গল্প পড়ে প্রথম প্রথম চিঠি দিত। তারপর ঠিক করল, না, লিলির সঙ্গে শুয়ে শুয়ে গল্প করব। বাড়ি যাই। মুখে বলল, ‘তাতে কি! তুমি থাক না।’

বাসটা যেমন তাড়াতাড়ি এল তেমন তাড়াতাড়ি একলা অবিনাশকে নিয়ে মোড়ে অদৃশ্য হল। প্রমথর অনেকক্ষণ ধরে খারাপ লাগল। এটা কি ভাল হল। একসঙ্গে এলাম—অথচ যাওয়ার সময় ছেড়ে দিলাম। অবিনাশদা অনেকদিন আগে বলেছিল, ‘জান প্রমথ আমরা একই রকমের। তাই মাঝে মাঝে খটাখটি লাগবেই!’ এমন কঠিন করে সত্যি কথাগুলো ভাবে, বলে দেয় অবিনাশদা। আমি কিন্তু অবিনাশদাকে কেমন আগলে রক্ষা করতে চাই। যেন সামনে বিপদ আছে। আজ গেলেই পারতাম একসঙ্গে। গত বছরের আগের শীতে কেমন একদিন নীলিমার ফাংশানে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিল আমাকে। নীলিমা সামনে আসতে আমার সঙ্গে কথা শেষ না হতেই থামিয়ে দিল। নীলিমা ত নেই অনেকদিন।

আজকে মাখনবাবু ছাদে যেতে বাধা দিল না। বীথি আগে এসে বসে আছে। প্রমথ আজ চুমু খেয়ে বলল, ‘তোমার দাঁতে কালো কালো কি যেন লেগে আছে।’

‘কোথায়?’

‘ঐ ত ওপরে—কোণে।’

মাথা নামিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ। টিউবয়েলের জলে দাগ হয়,’ তারপর বলল, ‘চুলও উঠে যাচ্ছে।’

প্রমথ মুখের দিকে তাকাতে পারল না। সুধাকে জবা ফুলের মালা কিনে দিয়েছে একদিন। নাভিতে মাথায় লেই লেই জবা ঘষলে চুল ওঠে না। ওষুধটা কিছুতেই বীথিকে বলতে পারল না। এমনকি বীথির দিকে তাকাতেও পারল না খানিকক্ষণ। শেষে নিজেকে বোঝাল, আমি সুধার সঙ্গে

মিশতাম সত্যি—কিন্তু যদি তাকালে বমি আসে তাহলে আমার দোষ কি। টাকা থাকলে সুধার জন্যে ভাল ছেলে খুঁজে বিয়ে দিতাম। সুধার বাচ্চা আমাকে মামা ডাকলে আমার অস্বস্তি হত না।

'টিউবয়েল ত বাইরে।' একদম বাড়ির বাইরে।

'ছোড়দা, শিপ্রা এনে দেয়।'

'দাদার মেয়েকে দিয়ে জল আনানো ঠিক না।'

'আমরাও ত এনেছি একদিন।'

প্রমথ তাকাতে বীথি বলল, 'হ্যাঁ। যখন ফ্রক পরতাম। আমি কেয়া দুজনেই এনেছি।'

প্রমথ বুকে মুখ ঘষে দিয়ে বলল, 'আর কোনদিন ওসব করতে দেব না। করতে হবে না।'

বীথি হেসে ফেলল। খুব আস্তে বলল, চোখ এখন নামানো, মুখখানা এমন রাজসিক, 'কি হচ্ছে।'

প্রমথর হাতে নরম গুঁড়ো গুঁড়ো কি উঠে এল। বীথির চোখের কাছে হাত তুলে ধরতে বীথি কাপড় দিয়ে আঙুলগুলো চেপে ধরে মুছে দিল।

'কি এগুলো?'

'পাউডার।'

'তাই বল। তাই এত সুন্দর গন্ধ তোমার বুকে।' ভেলভেটের ব্লাউজটা যেন পুরন্ত কোন পাহাড়ী ফলের ওপরের খোসা। প্রমথর দুই এক সময় সন্দেহ হয় ওটাও বুঝি শরীরেরই একটা অংশ। কেবল রঙকরা। মেয়েদের শরীরে যে কত রঙ থাকে! অথচ কনসিডারেট মেয়ে একদিন—তখন তার সঙ্গে প্রেম করা হয়—বলেছিল, বাঙালী ছেলেরা রাখতেই জানে না। এ ব্যাপারে সাহেবরা খুব ঠিকঠাক। ব্যাপারটা মাটির নীচের মূর্তি সংরক্ষণ না—আবার জিনিস দুটো ঘর সাজানোর পুতুল না যে ইচ্ছে হল টেবিলে রাখলাম—ভাল লাগল না ত রেডিওর ওপর বসালাম। ওখান দিয়ে সময় মত বাচ্চাই ত দুধ খাবে!

প্রমথর বিশ্বাস করতে খারাপ লাগল যে ওটা পাউডারের গন্ধ। আরও দুএকদিন হাতে ওই নরম গুঁড়ো গুঁড়ো লেগেছে। ঘামে ভেজা পাউডার।

'আচ্ছা, তোমার সঙ্গে যদি শেষ অব্দি বিয়ে না হয়।'

বীথির কাছে এটা মজার কথা। এ আবার কি কথা। বিয়ে ত হবেই। প্রমথর মন যাতে ভারি হয়ে যায় সেজন্যে গম্ভীর হওয়ার চেষ্টা করে বলল, 'তাহলে আর বিয়ের দিকে যাব না কোনদিন।' প্রমথর মনে হল কুড়ি বছর আগের মাসিক পত্রিকার গল্প থেকে একটা পুরনো মেয়ে কথা বলছে।

প্রমথর এবার খুব ভয় হল। কী দরকার এসব বলে—এসব ভেবে। সে বীথিকে বিয়ে না করে পারবে না। সেদিন হাওড়া ব্রীজের ওপর দাঁড়িয়ে নীতিশের সঙ্গে গঙ্গায় বান দেখেছিল। নীতিশ বলেছিল, 'বীথি বলেছে—।' তখন লাস্ট ট্রাম চলে গেছে।

এখন রেসকোর্সেও অন্ধকার। সাপ বেরোতে পারে। সুধার ভীষণ সাপের ভয়। আমি আর সুধার কাছে যাব না। বীথির দিকে ফিরতে আবার সেই সুন্দর গন্ধটা পেল। পাউডার না কিছুতেই। এ বীথির গায়ের গন্ধ। একেবারে ভেতরের—।

॥ চব্বিশ ॥

কয়েকমাস কাজ হতে দেখা গেল অফিসের অনেকের সঙ্গেই প্রমথর জানা-শুনো হয়ে গেছে। একদিন ত রায়বাবু বলল, 'আপনার দেখি সবার সঙ্গেই আলাপ। তিন বছর আছি—কোথায়? কজনের সঙ্গে আলাপ হল!'

প্রমথ ঠিক করতে পারেনি রায়বাবুর এসব কথা প্রশংসার না নিন্দের। তাই চুপ করে ছিল। ফিটফাট চেহারার কটি ছেলে কম্পিউটর মেসিনে বসে বোতাম টেপে। টিফিনে ওরা হাসতে হাসতে রাজভোগ খায়। যেদিকটায় ওরা বসে সেদিকেই সারা অফিসের একমাত্র এয়ারকুলার বসান। প্রমথর চেয়ারে বসে সব দেখা যায়। দিব্যি আছে। ওভারটাইম নিয়ে আরাম করে বলার মত মাইনে পায়। এসব ভাবে টের পেয়ে প্রমথ একদিন নিজেই বুঝতে পেরেছে সে ওদের এমন আরাম দেখতে পারে না।

ওদের পাশেই বিজ্ঞাপন বিভাগ। দিন কয়েকের জন্যে সেখানে যেতে হল। কাজ বিশেষ কিছু না। কাউণ্টারে বসে রেট অনুযায়ী টাকা নেওয়া আর বিজ্ঞাপনের কপি লিখে রেখে দেওয়া। তবে শব্দ প্রতি নয়া পয়সার হিসেবটা ঠিক হওয়া চাই।

বিজ্ঞাপন বিভাগে যাওয়ার দিন দুই পরেই অজয় এসে হাজির। কতদিন দেখা নেই। অজয়ও কিছু অবাক হল। এ কি চেহারা হয়েছে প্রমথ দত্তর। দুই গালে পাউরুটির মত মাংস। তারচেয়ে বোধহয় বেশী অবাক হল প্রমথ। মাঝারি দামি প্যাণ্ট-কোট, ছুটির দিনের একটা টাই—সঙ্গে টাইপিনও আছে,

তার ওপর যখন পকেট থেকে ভারি একটা ওয়ালেট বের করে অনেকগুলো নোটের ভেতর থেকে অজয় বিজ্ঞাপনের ম্যাটার বের করল তখন প্রমথর মুখে আপনা আপনি হাসি এসে গেছে। এ হাসি দুর্গাপুরে পাল সাহেবের সামনে দাঁড়িয়ে অজান্তেই মুখে এসেছিল। অজয় ওপরওয়ালা হলে প্রমথ হয়ত হাত কচলাত।

ব্যাগ থেকে নিজের ছবির একটা ম্যাট বের করল অজয়। তারপর কাগজে লেখা কপিটা দিল। 'এগারো তারিখ যাচ্ছি। কালকে বেরোনো দরকার। একটু ভাল জায়গায় দেবেন। সবাই যেন দেখতে পায়।'

প্রমথ কথা না বলে কপিটা দেখল। 'শ্রীঅজয় চৌধুরী ইণ্ডিয়ান স্মল-টুলস্ মেসিনারিজের পক্ষ হইতে উচ্চ শিক্ষার্থে পশ্চিম জার্মানী যাইতেছেন। ১১ই এপ্রিল বোম্বাই হইতে তিনি স্ট্রেইথাম জাহাজযোগে রওনা হইবেন। শ্রীচৌধুরী মালিপাঁচঘড়ার পরলোকগত শিক্ষাবিদ্ অক্ষয় চৌধুরীর কনিষ্ঠ পুত্র।'

পড়া হয়ে গেলে অজয়কে বলল, 'সুধাদের অফিস ছেড়ে দিয়েছেন তাহলে।'

'অনেকদিন। আপনি যখন সুধাকে ছাড়তে আরম্ভ করলেন তার কিছু-দিন পরেই।'

এ কথায় আপত্তি করা যায়। প্রমথ তার কিছু করল না। সুধাকে তাহলে ছেড়ে দিয়েছি। ব্যাপারটা চোখে পড়েছে।

'আপনার আর ভাইরা কোথায়? কলকাতায়?' বিজ্ঞাপন থেকে অনেক কিছু জানা গেছে।

'ভাইরা কোথায়! একভাই মোটে। দাদা, নৈহাটীতে। বাবা বেঁচে থাকতেই বিয়ে করে আলাদা হয়েছে।'

'এডুকেশনিস্ট ছিলেন?' এইভাবেই ত লোকে কথা জেনে নেয় আস্তে আস্তে।

'হাই স্কুলে ছিলেন। ওদিকে সবাই চেনে। আগে মা গেল।'

প্রমথর মন খারাপ হয়ে গেল। এ কথাগুলো না জিজ্ঞাসা করাই ভাল ছিল।

'অনেক কাঠ খড় পুড়িয়ে যেতে হচ্ছে। আগের অফিসের প্রভিডেণ্ড ফাণ্ডটাও পেয়ে গেলাম। আচ্ছা বিজ্ঞাপনটায় কিছু কমিশন করে দেবেন ত?'

প্রমথ অন্য কথা ভাবছিল। বলল, 'সুধাদের খবর কি, অঞ্জু?'

একটুও কাঁপল না অজয়। বলল, 'বাজে ফ্যামিলি। এখন সেই মুদিটা জুটেছে। সেই যে নৃপেন। চিঠি ছুঁড়ত অঞ্জুকে। আপনি ত জানেন সব।'

প্রমথ সবই জানে। অজয়ও জানে প্রমথ সুধাকে ছেড়েছে। তবে সুধাদের

ফ্যামিলি কিছুতেই বাজে না। ভাল না, খারাপ না, গোল না, চওড়া না—সুধাদের ফ্যামিলি সুধাদের ফ্যামিলি—তারচেয়ে বেশী কিছু না।

'তিন বছরের জন্যে যাচ্ছি, অনেক খরচ হবে। কোত্থেকে যে কি হবে জানি না। গিয়ে উঠছি ত।' তারপর থেমে বলল, 'কমিশন হবে ত?'

প্রমথ সে পথ দিয়ে না গিয়ে বলল, 'খরচে পোষাবে না তবে যাচ্ছেন কেন?'

এবারে অজয় যা বলল তা যেমন হ্যাংলা তেমনি করুণ। 'একটা কিছু হতেই হবে। দিস্ ইনসিগনিফিক্যান্স—।' কতদিন আগে নম্বর বাড়িয়ে বলতাম!

প্রমথর ভাল লাগল না। এতগুলো টাকা দিয়ে বিজ্ঞাপন দিয়ে সবাইকে জানান—অথচ ভেতরে ভেতরে একদম লোভী ভিখারী, ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত আর কেউকেটা হওয়ার করুণ বাসনা—অসহ্য! কমিশন দিতে পারব। তবু বলল, 'কমিশন ত হবে না—আর এ বিজ্ঞাপনও কাল বেরোবে না।'

অজয় রুমাল দিয়ে মুখ মুছল। 'কেন? বেরোবে না কেন?'

'জাহাজ ছাড়ার আগে ছেপে দেখা গেছে—জাহাজই ছাড়েনি। কিংবা বিজ্ঞাপনটাই মিথ্যে, একদম মিথ্যে।' তারপর অজয়ের মুখ কালো হয়ে যাচ্ছে দেখে বলল, 'আমি বলছি না আপনি মিথ্যে বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন—আপনার কেস জেনুইন—কিন্তু ছাপতে পারব না—অফিস প্রোসিজিওর।' শেষে একটা সিগারেট এগিয়ে দিল প্রমথ। 'নিন্ খান। দূরে চলে যাচ্ছেন। মস্ত হয়ে ফিরে এলে আর হয়ত দেখাই হবে না।' আগুন দিয়ে ধরিয়ে দিল প্রমথ। 'কপি, ম্যাট আর টাকা রেখে যান। এগারো তারিখের পরে বেরোবে।'

'বেশ তাই থাক্।' বলে টাকাটা দিল অজয়। তারপর 'উঠি' বলে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে চলে গেল।

রেজিস্ট্রির অফিস নীতিশের চেনা। এই অফিসেই কেয়ার সঙ্গে বিয়ে হয়। ফর্মখানা কিনে অফিসে গেল। নীতিশের সঙ্গে ঠিক হল অফিসের পরে প্রমথ শিবপুরে যাবে। মাখনবাবুর বাড়িতে বসে সইটা হয়ে যাবে। বীথির মা দাদা যেমন বাড়ির লোকের মত না নিয়ে তাদের মেয়ের বিয়ে দেবে না, তেমনি নীতিশও বুঝতে পেরেছে প্রমথর পক্ষে বাড়ির লোকের মত করান রেজিস্ট্রি হয়ে গেলেই আরও সহজ হয়ে যাবে। তা ঠিক, প্রমথ নিজেই খানিকটা এগিয়ে থাকলে বাড়ির থেকে আর না করবার উপায় থাকবে না।

সন্ধ্যেবেলা মাখনবাবুর ওখানে গেল। প্রমথকে দেখে বীথি আজ মাথা তুলতে পারল না। ওদিকে হেরিকেনের আলো যায়নি। বীথি সেখানে সরে বসল। কেয়া বলল, 'আপনার বন্ধু আসেনি?'

'আমাকে ত বলল আসবে। নিশ্চয় এসে যাবে—'

প্রমথর কথার পর মাখনবাবু বলল, 'ছোট গিন্নির টানে বেশীক্ষণ দূরে থাকতে পারবে না!'

কেয়া 'উ উ' বলে আনন্দে মাথা নেড়ে অস্বীকার করল। মেজদি বলল, 'কিন্তু সত্যি। কেয়াকে কম যন্ত্রণা সহ্য করতে হয়নি। বাড়িতে চিঠি আসত। বেরোলে পথে বিরক্ত করত—'

বীথি বলল, 'সেই আনন্দ ঘোষ। কেয়ার বিয়ে হয়ে গেল বলে পরীক্ষাই দিল না।'

কেয়া লজ্জা পেল। 'থামবি ফুলদি।' তারপর বলল, 'প্রমথবাবুর সেসব অনেক! ওর কাছে শুনিস!'

প্রমথ ভদ্রতা করে আপত্তি করল। নিশ্চয় অনেক না। সুধা কি অদ্ভুত করে বলত—'তোমাকে দেখে মনে হয় তুমি আমার প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছ।' অঞ্জুকে নৃপেন চিঠি ছুঁড়ত। এখন নৃপেন জুটেছে। অজয় ভাল চাকরীতে গেছে। সুধা আমার চাকরীর চেষ্টা করত। আমি চাকরী করি—সুধা নেই। হয়ত শিবপুর শেষ হয়ে গেলে মাঠ আছে--সেখানে কোন ক্ষেত থাকতে পারে—ধানের, সরষের।

তাকিয়ে দেখল—মেজদি, কেয়া, বীথি একরকমের সুখের মধ্যে ডুবে আছে। সুখটা হল—আমরা সুন্দর, আমাদের পাশে অনেকে ঘুরত—এরকম ভাবার সুখ। প্রমথ ভাল করে দেখল। কেয়া বীথি মেজদি কেউ ত খুব একটা সুন্দরী না। বোধহয় মোটামুটির চেয়েও কম। হেরিকেনে, ভালবাসায় বীথিকে খুব সুন্দরী মনে হওয়ার কথা। কিন্তু তা হচ্ছে না বলে কি বীথিকে আমি ভালবাসি না। প্রমথ এইসব ভেবে কিছু ঠিক করতে পারল না। পাশের বাড়ির মেঝেতে হামান দিস্তায় কিছু গুঁড়ো করছে। তারই গুম গুম শব্দ এ ঘরে সবাই শুনতে পেল।

কেয়া বলল, 'আপনার না সেই মীরা না কার সঙ্গে ভাব ছিল।'

ভাব ছিল অনেকের সঙ্গেই। তবু আগের মতই ভদ্রতা করে লজ্জা লজ্জা ভাবে 'না! কোথায়!' বলে অন্যদিকে তাকিয়ে থাকল প্রমথ। মীরা মানে কনসিডারেট মেয়ে। তার ধারণা ছিল প্রমথ একটা প্রতিভা। টাকা পয়সা যোগান দিয়ে প্রমথকে জাগিয়ে রাখা দরকার—এই ভেবে কনসিডারেট মেয়ে অনেক খরচ করত। কিন্তু যেই দেখল এই প্রতিভার জাগতে অনেক দেরী

তখন কবিতা করে সরে গেল। আসলে ত অনেকের সঙ্গেই প্রমথ ছিল। এই-ই ত প্রমথর কাজ ছিল। সেকথা ভদ্রতা করে লজ্জায় নুয়ে পড়ে পাঁচজনের কায়দায় 'না' বলার মধ্যে কেমন গ্রামবাসের ভদ্রলোক হওয়ার চেষ্টা রয়েছে বলে প্রমথর মনে এল। অথচ বীথি নিশ্চয় বিশ্বাস করে কেয়া খুব সুন্দরী। কি বোকামি। হামান দিস্তায় এখনও গুম গুম করে শব্দ হচ্ছে। এখন এই দেওয়াল, ছাদ—তুলে নিয়ে গেলে বড় রাস্তার পাশে আমরা অসুবিধের মধ্যে পড়ে থাকতাম। এক সেকেন্ড ধরে প্রমথ এইসব ভাবতে গিয়ে দেখল সবাই মনে মনে অসহায় হয়ে যাচ্ছে। এই সেকেন্ডটা, মানে একেবারে এখন—বীথি ঠিক না জেনে সুন্দরী ভাবার বিশ্বাসে হয়ত অসহায় হয়ে যাচ্ছে।

কেয়া বলল, 'ফুলদিকে ত দিদি বলে ডাকত একজন!'

মেজদি বলল, 'হ্যাঁ। অরবিন্দ চৌধুরী—ময়দানের ওখানটায় থাকে। মনে মনে ষোল আনা ইচ্ছে—এদিকে বীথিদি বলে ডাকবে।'

কেয়া বলল, 'এদিক্‌কার ছেলেদের ঐ এক রেওয়াজ।'

কেয়ার কথায় প্রমথর হাসি পেল। অভিজ্ঞ পাট ব্যবসায়ীর মত কথা বলছে কেয়া। ঢাকার পাটের আস বড়, সুতো মোলায়েম—নদী পার হলে ত আস ছোট হয়ে গেল। দোকানে বিভিন্ন দিকের ছেলে যেন হুকে ঝোলানো থাকে—কেয়া কিনতে গিয়ে হাত পা মন সব টিপে টিপে পরীক্ষা করে দেখেছে। 'অরবিন্দ চৌধুরী? কই আগে শুনিনি ত?'

মেজদি বলল, 'দেখনি আমাদের বাড়ি?' তারপর ভেবে বলল, 'না তুমি দেখবে কোত্থেকে। নীতিশ দেখেছে। গান গাইত বারান্দায় বসে।'

'গান জানত।'

কেয়া বলল, 'জানত কি—শেখাত। ফুলদি শিখত।'

এবারে বীথি কথা বলল। 'শিখতাম কোথায়—মা শুনতে চাইত, তাই বারান্দায় বসে গাইত।' হামান দিস্তা থেমে গেছে। মাখনবাবুর কাঁধে ছেলে চড়েছে। ছেলেকে খুব ভালবাসেন। মাঝে মাঝে বলছেন, 'এই চাষা, নাম—ঘাড় ভেঙে গেল।'

'অরবিন্দকে দাদা বলেছিল, বীথিকে বিয়ে করবে?—' বলতে গিয়ে থেমে গেল কেয়া। 'তা কোথায়—সেই যে গেল।'

প্রমথ বলল, 'বীথির সঙ্গে বিয়ের কথা হচ্ছিল?' প্রমথর কিন্তু এসব শুনে খারাপ লাগছে না। এরকম ত হতেই পারে।

মেজদি বলল, 'কত লোকের সঙ্গে হয়েছে।' বলে প্রথমর দিকে তাকিয়ে থাকল।

এবারে বীথি খুব আস্তে আস্তে বলতে থাকল। 'অধিকারীর সঙ্গে

বিয়ের কথা চলল, তারা দেখে পছন্দ করল। শেষে ভেঙে গেল।' মাটির নীচে বসে কথা বললে এমন গম গম করে। 'ঘরে বসে থাকতাম। কেয়া বলল, ফুলদি আমাদের ক্লাবে ভর্তি হবি?—হলাম। নরহরিদার ঘরে সবাই যেত—' বলতে বলতে প্রমথর দিকে তাকাল। প্রমথ হাসি ভাসিয়ে রেখেছে মুখে। সুতরাং বীথি নিশ্চিন্তে আরম্ভ করল। 'গানের ক্লাব। একদিন বৃষ্টির জন্যে বসতে বসতে রাত হতে অরবিন্দ পেঁছে দিল—তারপর প্রায়ই আসত।'

কেয়া বলল, 'আমাকেও দিদি বলত। অথচ দেখেই বোঝা যেত নরম হয়ে গেছে।'

প্রমথ বলল, 'নরম শক্ত বোঝা যায়—'

'ওই হল আর কি। আপনি বুঝতে পারেন না?'

প্রমথ খুব পারে। মুখে বলল, 'দাদা বলল,—ইচ্ছেও আছে!—অথচ আর এল না?' বলে প্রমথ বুঝতে পারল, বীথির বিয়ের ব্যাপারে ওদের দাদা বোধহয় অনেকটা এগিয়ে গিয়ে অরবিন্দকে পরিষ্কার করে বলেছিল। একা অরবিন্দ কেন—বীথিও কি নরম হয়নি সেদিন।

'ঐ এক ধারা। মিশবে ঠিকই, তারপর কিছু বললে আর দেখা যাবে না।' মেজদি কি রাগ থেকে এসব বলছে।

বীথি বলল, 'প্রথমত, দ্বিতীয়ত, তৃতীয়ত—একশো গন্ডা বিতাং দিয়ে চিঠি দিয়েছিল—কেন আমাকে বিয়ে করতে পারবে না।' তারপর বলল, 'তাই বলে পালাবে কেন? কি সুন্দর গাইত।'

প্রমথর খুব ভাল লাগল। বীথির কথাগুলো সুন্দর। এই কথার জন্যে এ ঘরের দেওয়াল রাঙতা দিয়ে মুড়ে দেওয়া যায়। আমিই বা পালিয়ে এলাম কেন। পরমেশকে আটকাবার জন্যে বৌদিকে বুদ্ধি দিতাম। সুধার ব্যাপারে বেঁচে গিয়ে মুক্তো হয়ে গেলাম। না হলে সুধার কাছে কি সুন্দর মিথ্যে কথা বলতাম। পরীক্ষার নম্বর কেমন বাড়িয়ে দিতাম। নিজের মেরুদণ্ডের ওপর শুকোতে দেওয়া ভিজে জামার মত প্রমথর সারা শরীর কেমন নেতিয়ে যেতে থাকল আস্তে আস্তে। জায়গায় জায়গায় হাত পা মাথা যেন ঝুলে পড়েছে।

এমন সময় নীতিশ এল। এইসব অরবিন্দ ফরবিন্দর কথায় মাখনবাবুর অস্বস্তি লাগছিল। জোর করে থামানও যায় না—তাহলে উল্টো বুঝতে পারে। আর এই মেয়েগুলোও বোঝে না। হেরিকেনের সামনে টুলের ওপর প্রমথ ফর্মখানা রেখে সই করল। নীতিশ, মেজদি, মাখনবাবু, কেয়া বেশ গম্ভীর হয়ে গেছে। বীথি সহজভাবেই লালচে রাইটার কলমের ক্যাপ খুলে নিল। তারপর পরিষ্কার করে ইংরাজিতে নাম লিখল।

প্রমথর মনে হল তাহলে কি এখন থেকে বাসে ট্রামে অন্য মেয়ের দিকে

তাকাব না। দি এন্ড। বীথি কেমন টোপা কুলের মত আরামে লজ্জায় নতুন শাড়ীতে ফুলে উঠেছে।

ফেরার সময় নীতিশ আর প্রমথ বীথিকে বাড়ি পৌঁছে দিতে গেল। অল্প পথটুকু নীতিশ অনেক ঠাট্টা করল। দুজনের সই করা ফর্মখানা প্রমথর পকেটে—লাল রাইটার কলমটা বীথির ব্লাউজে।

বাড়িতে ঢুকে দেখল অন্ধকার উঠোনে একখানা চেয়ারে বীথির বড়দা বসে। প্রমথর জন্যে বড়দার মেয়ে আর একখানা চেয়ার দিল। কি আর কথা হবে দুজনে। নীতিশই গল্প জুড়ল। নীতিশের শাশুড়ী ওরই মধ্যে কোত্থেকে আজ সন্দেশ আনিয়ে দিল। কেবল জল দেওয়ার সময় অন্ধকারের মধ্যে একবারের জন্যে বীথি ফুটে উঠল।

প্রমথ খুব কাছেই যেন সেই বৃষ্টি ভেজা ওষুধের গন্ধটা পেল। আজ ত বৃষ্টি হয়নি একদম। কতদিন আগে কদিনের জন্যে প্রমথ খেয়ে দেখেছিল। একদম বাজে। খেলেই পেট ব্যথা করে তার।

বাইরে বেরিয়ে প্রমথকে ট্রাম লাইনে তুলে দিতে এল নীতিশ। কেয়াকে নিয়ে ফিরতে হবে বলে নীতিশ থেকে যাবে। আজ সারাটা দিন ট্রাম বাসেই যাচ্ছে। অবিনাশদা একটা চিঠির ব্যাপারে রাইটার্স বিল্ডিংয়ে পাঠিয়েছিল দুপুরের দিকে। বাস আসতে দেরী হচ্ছে। প্রমথ খুব সাবধানে বলল, 'তোমার বড়শালা খায়?'

নীতিশ মাথা নাড়ল। মানে খায়। একরকমের ঠোঁট ফাঁক করা অল্প হাসি নীতিশের মুখে। এরকম হাসিকে বোধহয় দুঃখের হাসি বলে। প্রমথ চুপ করে থাকল।

'গোড়ায় তোমাকে বলিনি। তুমি যদি ওদের ভুল বোঝ—' নীতিশ একবারে আর বলতে পারল না। অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আমি বিয়ের আগেই জানতাম—অনেকদিন ধরে খাচ্ছে।'

নীতিশের কথায় প্রমথ চমকে গেল। এতসব জেনেও চুপ করে থেকেছে—পাছে প্রমথ ওদের বাড়ির সবাইকেই ভুল বোঝে। ওদের জন্যে নীতিশ চিন্তা করে। আমি নীতিশ ত এক বয়সী। কোথায়—আমি ত এরকম ভাবি না। এখানে বীথি থাকে। এখানে পছন্দ করার পর অনেক চায় বলেই বীথির বিয়ে অনেক দিন আটকে আছে। বীথি কেমন বলে, 'আমি আর পারি না—যেখানে ইচ্ছে দিয়ে দাও—।' এসব বলার সময় বীথি কেমন হয়ে যেতে পারে, কেমন ভাবে বলে—প্রমথ তা ভেবে নিয়েছে। কিন্তু এখন আর ভাবার সময় নেই। বাস এসে গেছে।

একা একা ফেরার সময় বাসে বসে বেশ মন খারাপ হয়ে গেল। বীথিদের বাড়ি যাওয়ার পথটা এত খারাপ। বারান্দায় হেরিকেনটা নেভানো। বাচ্চাগুলো মেঝেতে শুয়ে ছিল। বীথি বাড়িতে পেঁছেই কেমন অন্ধকারে ঢুকে যায়। আর বীথির দাদাও তাহলে খায়। সুধার বাবাও ত খায়। সুধা কেমন বলত, 'অথচ দেখ আমরা কি-ই বা খাই। আজকাল বাড়িতে ত কিছুই থাকে না।'

মহরমের প্রোসেসন যাবে বলে ট্রাম বাস বন্ধ হয়ে গেছে। হাজরায় নেমে হাঁটতে আরম্ভ করল প্রমথ। খানিকদূর গিয়ে নিত্যর সঙ্গে দেখা। নিত্য আর চায়নার দিদি নীচু হয়ে ফুল কিনছে। প্রমথকে দেখে নিত্য খানিক হাসল। 'ভূত না। সত্যি! বেঁচে আছে।' তারপর তেমনি হেসে মেয়েটিকে ডাকল। চায়নার দিদি বলল, 'কি! মরিনি। আপনার বন্ধুর কান্ড!' প্রমথ রীতিমত রেগে গিয়ে নিত্যর দিকে তাকাল না। নিত্য বলল, 'দিয়ে দিলাম একটা গুল।' কোন কারণ নেই—এমনিই মিথ্যে কথা বলে দিয়েছে ছোটবেলায় কত। কিন্তু এখন একটা লোক মরে যাওয়ার কথা মিথ্যে করে বলে কেমন করে। নিত্যর বাবা হার্টফেল করেছে মাস দুই আগে। মাথার চুল বড় হয়নি এখনও। প্রমথকে তাকাতে দেখে বলল, 'মরে গেলে কি হয় রে!' তেমনি হেসে বলল, 'এই ত আমার কোলের মধ্যে শুয়ে বাবা মরে গেল—' প্রমথর বুকের বোতামটা আঙুলে নাড়তে নাড়তে বলল, 'কষ্ট দেখে কষ্ট হচ্ছিল ঠিক—কিন্তু মরে গেলে পর আর কি!—আর কি?' একসঙ্গে দুখানা হাতই ঝপ্ করে কুয়োয় বালতি ফেলার মত হঠাৎ কাঁধ থেকে নীচে ফেলে দিল নিত্য।

মেয়েটি ফিরে গিয়ে মালা দর করছিল। দুগাছি হাতে জড়িয়ে নিয়ে হাইহিলের ওপর টাল সামলে কাছে এসে নাকের বড় বড় ফুটো দিয়ে ঘোড়ার মত নিঃশ্বাস ছাড়তে লাগল। অনেকক্ষণ নীচু হয়ে থাকলে এমনি হাঁপ ধরে।

ওরা দুজন আরও খানিক বেড়াবে। এই ত মোটে দশটা। প্রমথ রাস্তা পার হতে হতে দেখল দুজনে একটা পাঞ্জাবী হোটেলে ঢুকছে।

॥ পঁচিশ ॥

পল্টু কলকাতায় থাকতেই চিঠিখানা এল। এ চাকরীতে জয়েন করার আগে ইণ্ডিয়া গভমেণ্টে একটা পরীক্ষা দিয়েছিল। সে প্রায় বছর দুই আগে। তারই এ্যাপয়েণ্টমেণ্ট লেটার। যোগ দেবে কিনা তা ঠিক করে দু সপ্তাহের মধ্যে জানাতে হবে।

চল্লিশ দিন ট্যুর করার পর সাত দিনের রেস্টে কলকাতা এসেছিল। এসে এখন মুস্কিল। সরকারী কাজ---মাইনে কম---তেমনি দুশ্চিন্তাও কম। ওদিকে যেখানে আছে সেখানে দেয় বেশী কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে খাটায়ও বেশী। খাটনিতে আপত্তি নেই—কিন্তু কোন্ সময় কোন্ বড় সায়েব যাবে তার জন্যে রীতিমত তৈরী হয়ে থাকতে হয়। এক রকমের মেণ্টাল টরচার। তাছাড়া—কেমন আন-ডির্গানিফাইড্।

বাবা মা বড়দা মেজদা একবাক্যে চাকরী বদলাতে বারণ করল। 'এই বয়েসে এতগুলো টাকা মাইনে দেবে কে তোকে? গোণা মাইনের মানের জল ধুয়ে খাবি?' মা আবার এইভাবে বলে। 'চিরটা কাল টাকা গুণে গুণে সংসার করে ঘেন্না ধরে গেছে।'

তাছাড়া পল্টুও দোটানায় পড়ল। এয়ার কণ্ডিশন ট্রেণে যাতায়াত, যেখানে যাবে সেখানকার সেরা হোটেলে থাকবার ব্যবস্থা তার ওপর চার মাস বোনাস। এসব ছেড়ে সরকারী চাকরীর মাপা মাইনেতে যাওয়াও মুস্কিল। ব্যাপারটা নিয়ে ন'দার সঙ্গে কথা বলতে হবে বলে ঠিক করল।

কিন্তু এদিকে ন'দাই মুস্কিল বাঁধিয়ে বসে আছে। কেন যে সেদিন মরতে নীতিশের শালীর কথা মাকে বলতে গেল।

প্রমথর ছুটি ছিল। মা এমনিতেই কদিন বেশ মুখ থমথমে করে আছে। পল্টুর আণ্ডারঅয়ার ছিঁড়ে গেছে। ভগবতী স্টোর্স থেকে কাপড় আনা দরকার। কিন্তু আগের মাসের বাকি টাকাটা দু দুবার চেয়ে গেছে। ছেঁড়া জায়গাটা কলে সেলাই করছিল মা। পল্টু আর প্রমথ খাটে শুয়ে শুয়ে দুলুর বিয়ের কথা, রেবার মেয়ে সুপুর আধো আধো কথা এইসব নিয়ে গল্প করছিল।

মা বলল, 'হ্যাঁ রে, আজকাল তোর ফিরতে এত দেরী হয় কেন? দশটা এগারোটা রাত হয়ে যায়—'

পল্টু বলল, 'হবে না। হুলিদাস শিবপুরে গিয়ে ডিউটি দেয়!' ন'দার যে কোন কথা এইভাবে বলে আরাম পায়। আগে যখন ছোট ছিল তখন ন'দার সঙ্গে কেমন একটা দূরত্ব ছিল। শেষে কারখানা ছাড়বার পর ন'দা যখন ফিরে পড়তে আরম্ভ করল তখন পল্টু এক ক্লাশ এগিয়ে গেছে। সেই থেকে ন'দা যেমন ফ্রেন্ড, তেমনি ব্রাদার—।

পল্টুর কথা উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করল প্রমথ। কিন্তু সুবিধা হল না। মা বেশ কড়া করে ধরল। 'তোর বিয়ের টাকা দিয়ে রেবার বিয়ের দেনাটা শোধ করে দেব। আত্মীয়ের মধ্যে দেনা রাখার মত পাপ আর নেই।' কথা বলার সময় মা'র কাঁচাপাকা চুল মুখে পড়ে। এখনও বেশ কোঁকড়া—অনেকটা লম্বা।

শেষে কথায় কথায় ঝগড়ার মত হয়ে গেল।

প্রমথ জানে মা যেসব টাকা পয়সা গয়নাগাটি আশা করে তার সিকির সিকিও বীথিরা দিতে পারবে না। বাড়িতে এই অবস্থা—অথচ ওদিকে সেদিনের সেই সই করা রেজিস্ট্রি ফর্ম একদিন দুপুরে গিয়ে জমা দিয়ে এসেছে প্রমথ।

মা বলছিল—পল্টু আর প্রমথর বিয়ে দিয়ে যা পাবে—তাতে দেনা শোধ করে একটা বড় বাড়ি নেবে। বড়দা বাইরে বাইরে থাকে। মেজদা আলাদা। রেবা দূরে। এখন সংসারও কিছু ছোট। পল্টু আর প্রমথর জন্যে নতুন বাড়িতে আলাদা দুখানা ঘর থাকবে। মা যখন এসব বলে তখন চোখ দুটো ভেসে ওঠে। যেন নিজেই হাত দিয়ে ছেলেদের জন্যে ঘর সাজিয়ে দিচ্ছে এমন একটা ভঙ্গী মুখে চোখে ফুটে ওঠে মা'র।

পল্টু বলল, 'এ অবস্থায় আমি বিয়ে করব না।'

'কেন? অল্প বয়সী বৌ আসবে। আমি আর কদ্দিন। তোদের দেখা-শুনো তোদের বৌ-রাই করবে।' সেলাই কিন্তু থামেনি। হাতও চলছে মার। এখন পল্টুর চামড়ার সুটকেশের ঢাকনাটা নিয়ে পড়েছে মা।

'লোকের কাছে চাওয়া কেন? এরকম হ্যাংলার মত টাকা পয়সা চাওয়া অসভ্যতা।'

পল্টু যেমন করে বলে প্রমথ ততটা বলতে পারে না। বাবা মা বহুদিন হাড় বের করে পরিশ্রম করেছে। এই সংসার একটু একটু করে মা'র নিজের হাতে সাজান।

পল্টুর কথায় মা যেন মুহূর্তে দিক হারিয়ে ফেলল। ঠিক করেছিল

ধীরে সুস্থে কথা বলে প্রমথর মনের কথা জেনে নেবে। মেয়েটি কেমন—বয়েস কত, কে কে আছে—কি কি দিতে পারবে—সব কিছুর একটা আন্দাজ নেওয়ার ইচ্ছে ছিল। কিন্তু পল্টুর কথায় সব গোলমাল হয়ে গেল।

মা সোজাসুজি জানতে চাইল, 'তুই কি মেয়েটিকে বিয়ে করবি?' মা এত ঘন করে তাকায়। এখানে আর মিথ্যে বলে লাভ নেই।

প্রমথ স্বীকার করল। সব বলল। শেষে তার গলা একদম নরম হয়ে গেল। 'তুমি দেখ মা। মেয়েটি ভাল। মুস্কিল শুধু টাকা পয়সা দিতে পারবে না।'—শেষে হেসেই বলল, 'থাকলে ঠিকই দিত।—নেই যে—'

প্রমথর কথার পর মা অনেকক্ষণ চুপ করে ছিল। কিন্তু যখন মুখ খুলল তখন আর আশা ভঙ্গের ভাবটা একটুও ঢাকতে পারল না। বরং তা যেন আরও বেশী আরও প্রবল হয়ে মা'র কথায় আর চোখে ফুটে উঠল।

'ভেবেছিলাম এতদিন পরে সব ঠিকঠাক করে বসব।'

প্রমথ কিছু বলতে পারল না।

পল্টুর বয়েস কম। গলাটা উঁচু। বলল, 'টাকা ছাড়া কি চাওয়ার কিছু নেই।'

'তুই-ই বল—টাকা ছাড়া একদণ্ড চলে?'

এবারে পল্টু আর থাকতে পারল না। এতদিন যা মাইনে পেয়েছে সব বাড়িতে দিত। তারপর হাতখরচের যা দু দশ টাকা থাকত তাও মা একটা একটা করে চেয়ে নিত। শেষে কোম্পানীর ট্যুরের যে টাকা থাকে তাতেও মা'র হাত বসবে। মা'র দোষ নেই। দরকার। একশ গণ্ডা দরকার। ন'দা এতদিন বেকার ছিল। তারপর সংসারে সবাই কি আর বুঝদার হয়! পল্টু বড় চাকরী করে অতএব যত পার, যখন ইচ্ছে, যেখান থেকে হোক্ পল্টুকে টাকা দিতে হবে। ফলে শেষ অব্দি কোম্পানীর টাকায় ডেফিসিট। কোন্‌দিন এ্যাকাউণ্টস্ চেক্ করে বসলে চাকরীটা গয়া—এসব কি কম দুশ্চিন্তার।

মা'র কথায় রাগ হয়ে গেল পল্টুর। হঠাৎ বলল, 'এতদিন ত সংসার করলে —এবার একটু ছাড়ো। এবারে ত্যাগ করত সব—' বলে চান করতে চলে গেল। হুড় হুড় করে জল ঢালার শব্দও পাওয়া যাচ্ছে।

পল্টু একদম ক্লান্ত হয়ে পড়েছে। ক্লাশফ্রেণ্ড, বন্ধুরা সবাই প্রায় কলকাতায়। তারা কম টাকাতে হলেও, বেশ দশটা পাঁচটার অফিসে আছে—বিকেলে পাঞ্জাবী পরে সিগারেট টানে। আর ট্যুরে থাকলে পল্টুর ত বিকেল বলে কিছু নেই।

দু'একদিন দুলু, পৃথ্বীরাজ, বিমলবাবু ওদের আড্ডায় পল্টুর সঙ্গে গেছে। সবারই পকেটে দু দশ টাকা থাকে। পল্টুর বোরিং লাগে—এই ভিখারীর মত, হাতে একদম পয়সা থাকে না!

আসানসোল গিয়ে পল্টু কিরকম পাল্টে যাচ্ছিল। মদ খেয়ে 'সোবার' হয়ে বই পড়তে পারে। বন্ধুরা প্রশংসা করে। তারা জানে না পল্টুর মুখে তখন ছোটবেলার হাসি থাকে।

ছোটবেলায় মা রামায়ণ পড়াত, মহাভারত পড়ে শোনাত। মহাভারতে মহাপ্রস্থানের সময় যুধিষ্ঠিরের সঙ্গের কুকুরটা দিশী না বিলিতি এই নিয়ে পল্টু কতরকম কথা মা'র কাছে জানতে চাইত। শেষে ত একটা কালো মত কুকুরের বাচ্চা পুষতেও আরম্ভ করেছিল।

মহাপ্রস্থান অদ্ভুত জিনিস—এখন ত তাই মনে হয় প্রমথর। নিজের হাতে তৈরী সব কিছু ফেলে দিয়ে শেষবারের মত চলে যাওয়া। আর কোনদিন ফেরা হবে না। আমার নাম কোনদিন থাকবে না। তনুদা যে চলে গেল—কোথায়—আর ত ইচ্ছে হলেও ফিরে আসতে পারবে না। হয়ত ভূত হয়ে আশে পাশেই আছে—অথচ আমাদের দেখতে পেয়েও আমাদের জানাতে পারছে না—সে আছে, সে আছে।

উপুড় হয়ে শুয়ে গান ধরল। 'আমি তোমায় যত—' গাইতে গাইতে কখন গানটা সানাইর একটা রাগ হয়ে গেছে বলে মনে হল। তখন সুধা, বীথি এসব কেউ আর নেই প্রমথর। এমন সময় পল্টু চান করে এল। বলল, 'চল ঘুরে আসি।'

প্রমথ উঠে বসল। গা ধোবে নাকি। মা একপাশে শুয়ে আছে। পাশের ঘরে যাওয়ার সময় দেখল মা'র চোখ খোলা—দুচোখেই জল। ওপরের চোখের জল নাকের পাশে পথ করে মুখ বেয়ে নেমেছে। কাঁচাপাকা চুলে মাথাটা ভর্তি—বেশ কোঁকড়া আর লম্বাও।

পল্টু কেন ওরকম ভাবে বলে, 'এবারে ত্যাগ কর—'

মা কতদিন আছে। আমরা তার কতদিনের—

পল্টু বেরোবার জন্যে রেডি হয়ে বলল, 'কি এখনও চান করনি। তবে থাক। আমি চললাম।'

'যা।'

পল্টু একবার দাঁড়িয়ে কি ভাবল। তারপর গুণ গুণ করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

প্রমথর চান করতেও ইচ্ছে হল না। অথচ শরীরটা খারাপ লাগছে। খবরের কাগজে, কর্পোরেশনের সভায় কিছুদিন ধরে কলকাতায় বসন্ত কলেরার কথা লেগেই আছে। মোড়ে মোড়ে লাল সালু টানিয়ে ভলাণ্টিয়ার ডাক্তাররা টিকা দিচ্ছে ক' সপ্তাহ। অসুখ হবে না ত—

বিকেলের দিকে সামনের ঘরে কে যেন জোরে জোরে কথা বলছিল। প্রমথর ঘুম ভেঙে গেল। মা আসন করে বসে আকাশের আলোর দিকে বই রেখে পড়ছে। চোখে চশমা। সকালের চুলের গুছি আবার মুখের ওপর ঝুলে পড়েছে। উঠে দেখল সামনের ঘরে আর কেউ না—নিত্য এসেছে। বাবার সঙ্গে গল্প করছে। বাবাও বুঝি আজ সকাল সকাল অফিস থেকে এসেছে। হাতে পান ছেঁচার হামান দিস্তে। নিত্য খুব জোরে কথা বলছে—বাবা কানে হাত রেখে কিছুটা ঠোঁট নড়া লক্ষ্য করে কি বলছে নিত্য তাই বুঝবার চেষ্টা করছে। ছোটবেলা থেকেই দেখছে প্রমথ—বাবা কানে খুব কম শুনতে পায়।

'বস্। চান করে আসি।' বলে তোয়ালে নিয়ে বাথরুমে গেল। নিত্য একটু বোকা আছে। প্রমথর যেসব খবর বাড়িতে অপ্রিয় সেগুলো নিত্য বাড়ির লোককে অনেকবার হাসতে হাসতে জানিয়ে দিয়ে মজা দেখেছে। সেবার কারখানার চাকরী ছাড়ার কথা সপ্তাহ দুই চেপে রেখেছিল। নিত্য জানত। ভাল মানুষের মত একদিন বড়দাকে সব বলে দিয়েছিল। সে কি যন্ত্রণা বাড়িতে। নিত্যর এ এক মজা দেখার আনন্দ। ভয় ছিল—নিত্য না জানি বাবাকে একা পেয়ে নতুন কিছু না বলে দেয়। নিত্য নাকি ইচ্ছে করেই এসব বলে দেয়—শঙ্কর ত তাই বলে।

পাশের ঘরে দাঁড়িয়ে মাথা আঁচড়াতে আঁচড়াতে শুনতে পেল, নিত্য হাসতে হাসতে বলছে, 'মেশোমশাই—আমাদের সবার বাবাই ত একে একে যাচ্ছেন—এক আপনিই বাকি!'

প্রমথর হাত থেমে গেল। চিরুনিটা রেখে মা'র দিকে তাকাল। মা'র হাতের বই বন্ধ হয়ে গেছে। দেওয়াল আর দরজার ফাঁক দিয়ে যেটুকু আকাশ ধরা পড়েছে—সেটুকু নির্মেঘ—ঘন নীল। দূরে রেডিওর এরিয়াল। মা আস্তে আস্তে চশমাটা খুলল। প্রমথ দৌড়ে সামনের ঘরে গেল।

বাবা বোধহয় কথাটা শুনতে পায়নি। কানে হাত রেখে নিত্যর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কি বললে। এ্যা?'

নিত্যর ওপর রাগ হল। মোটা বোকা ভোড় সব — সব কিছু নিত্য। এক্ষুণি ধরে বের করে দেওয়া উচিত। অথচ নিত্য অন্যদিকে এমনিতে ভালও। অনেক গুণ আছে। তাছাড়া প্রমথকে বোধহয় ভালও বাসে।

নিত্য জোরে বুঝিয়ে বলতে যাচ্ছিল। বাবা নীচু হয়ে হামান দিস্তা দিয়ে বোধহয় একটা শক্ত সুপুরি থেঁতলাতে গেল। দাঁত যা আছে তা নরম। অনেকটা মাড়ি ফাঁকা বলে চিবুকটা বিকেলে আলোর অভাবে ফুলো দেখায়।

প্রমথ চোখ টিপে নিত্যকে থামাল। নিত্য না বুঝতে পেরে চোখ দিয়ে জানতে চাইল, কি ব্যাপার? প্রমথর পক্ষে এখন বোঝানো সম্ভব না। বাড়ির সামনেই ট্রাম স্টপ। লাইন কামড়াতে কামড়াতে একটা ট্রাম এসে থামল। বিকেল চিরে যাওয়া একটা ঘ্যাষড়ানো শব্দতেই ঘরে বসে যেকোন ট্রামের গতিবিধি বোঝা যায়। ভাগ্যিস লাইন আছে। না হলে বোধহয় দাঁতাল চাকা শুদ্ধ ট্রামগুলো দোতলায় এসে আমাদের সবাইকে চাপা দিত। মাঝে মাঝে যেমন ব্রীজের ওখানটায় ট্রেণে কাটা পড়া বাছুর, গোয়ালা বৌ পড়ে থাকে। অথচ ট্রেণগুলো এমনিতে দেখতে নিষ্পাপ, বাধ্য, প্রভুভক্ত চাকরের মত!

এমন সময় 'হরিবোল' শোনা গেল। কী চীৎকার! নিশ্চয় তারকদের দল। সামনে ইলেকশন। বলরামবাবুর ভলাণ্টিয়ার সেজে এখন কিছুদিন কণ্ট্রাক্টে মড়া পোড়াবে।

প্রমথ দাঁত চেপে বলল, 'বস্। আসছি এখুনি।'

নিত্য কিছু বুঝতে না পেরে ঝিম্ মেরে বসে থাকল। একবার গোবিন্দর বাড়িতে হোয়াইট লেবেলের সঙ্গে দিশী মিশিয়ে খাবার পর বমি—তারপর এরকম একধারা ঘণ্টা তিনেক ঝিম্ মেরে বসে থাকতে হয়েছিল।

নিত্যকে নিয়ে বেরিয়ে যেতেই হবে। আজ দিনটাই কি পড়েছে। যে যা ইচ্ছে বলছে। জামা পরে বেরোবার আগে মা'র ঘরের দরজায় দাঁড়াল। নিত্যর ঐ কথার পর ঘরে ঢুকতে সাহস হল না। মা সব শুনতে পেয়েছে। পা টান করে বসে আছে। আকাশের দিকে মুখ। আকাশটা একেবারে নীল। দূরে রেডিওর এরিয়াল। হরিধ্বনিটা এতক্ষণে বোধহয় ব্রীজ পার হয়ে রাসবাড়ির পথ ধরে এগোচ্ছে। ব্রীজের নীচে প্রমথর সব সময় ভয় হয় এই বুঝি ট্রাম তার পায়ের ওপর দিয়ে চলে যাবে।

পল্টু বলে গেল সবকিছু ছাড়তে। এই বয়েসেই আকাশ দেখলে প্রমথ হয়ত নির্জন মাঠে জামা কাপড় ফেলে দিয়ে উলঙ্গ হয়ে দাঁড়াতে পারে। যদি কিছু তাকে দুহাতে তুলে নিয়ে পেছনের এইসব ফেলে দিয়ে একেবারের মত নিয়ে যায়। মা'র বয়েসে অত আকাশ দেখা ভাল না। এক সেকেণ্ডের জন্যে মনে হল, মা'র এখনও যাওয়ার সময়ই হয়নি। অপারেশন হয়ে সুস্থ মত আরও দশটা বছর অন্তত থাকুক। এখনও অনেক বাকি, অনেক কিছু বাকি।

কোন কথা না বলে নিত্যকে নিয়ে বেরিয়ে গেল।

॥ ছাব্বিশ ॥

অফিসে কি ব্যাপারে অবিনাশদা ডেকে পাঠাল। রায়বাবুর সঙ্গে বসে গল্প করছিল। হাতে কাজও ছিল না। চাকরীতে ঢোকার আগে অবিনাশদার সঙ্গে সহজভাবে মিশতে পারত। এখন অফিসে ওপরওয়ালা বলে তেমন আর সহজ হওয়া যায় না। ঘরে ঢুকে দু একবার এমনও নার্ভাস হয়ে গেছে—অবিনাশদা সিগারেট ধরিয়ে দিয়ে চেয়ারে বসতে না বললে প্রমথ হয়ত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কোন দিন বলে ফেলত, 'আমায় ডেকেছেন স্যার?'

প্রমথ ঢুকতেই অবিনাশ বলল, 'আমি তোমায় দু' দু'বার ক্ষমা করেছি—।'

প্রমথ ভেতরে কেঁপে গেল। কোন্ ব্যাপারে অবিনাশদা এসব বলছে। প্রমথ মনে করতে পারল না।

'তুমি যেখানে বস—দেয়ার ইজ এ নেস্ট এগেইনস্ট মি। শীগ্‌গির ভেঙে দিতে হবে।'

'তার আগে—'

তার আগে—মানে, তার আগে প্রমথকে শেষ করে দিতে হবে, ভেঙে দিতে হবে। এ ঘরে ঢুকতেই অবিনাশদার রেগে যাওয়া মুখ দেখে প্রমথর সবচেয়ে খারাপ লেগেছে এই ভেবে—আমি কেন অবিনাশদার এই সব রাগ রাগ ভাব সহ্য করব? মুস্কিল হল কখনও ভাল ব্যবহার করবে কখনও এত বিশ্রী ব্যবহার—যে অন্য কেউ হলে প্রমথ তার হাড় গুঁড়ো গুঁড়ো করে দিত। কিন্তু অবিনাশদার ব্যাপার অন্য—তাকে যেন কোথায় একটু ভালবাসে—কতদিন আগে কি আশ্চর্য সব গল্প লিখেছিল—প্রমথরা একটা বয়েসে ছাত্রের মত সেই সব গল্প পড়েছে। তবে কি বারিদবাবুর সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা আছে মনে করে এইসব কথা? বারিদবাবু খারাপ লোক না। তার সঙ্গে রীতিমত ভাল ব্যবহারও করেছেন। এখানে শুধু শুধু জট পাকাবে বলে প্রমথ বারিদবাবুর কাছে যায় না।

কিন্তু এখন মনে হল, আমি যদি বারিদবাবুর কাছে যাই তাতে অবিনাশদা পাহারা দেবার কে? না হয় পাহারা দিল, কিন্তু ক্ষমা করবার কে সে? এবং কোথায় তার বিরুদ্ধে পাখির বাসা বেড়ে উঠছে তা তার নিজের ব্যাপার।

হয় পোকা মাকড় দিয়ে পাখিগুলো বড় করুক না হয় পুরো বাসাটাই আছড়ে ভেঙে দিক। কিন্তু সে কথা আমাকে জানিয়ে লাভ। আমি কি পাখিদের পিওন! আমি আমার ব্যাপার জানি। ইস্, হাওড়ার ইনফরমেশন অফিসারের কাজটা ছেড়ে দেওয়া ঠিক হয়নি।

প্রমথ বলল, 'আপনি জমিদার না। আপনি যেখানে কাজ করেন আমিও সেখানে করি। আপনি আমাকে ক্ষমা করবার কে?'

অবিনাশ যে ব্যাপারে চটে গিয়েছিল, ভেবে দেখল—তাতে প্রমথর কোন দোষ নেই। কোনরকম দুর্বলতা থাকলে কেউ এভাবে কথা বলতে পারে না।

অবিনাশের মুখ নরম হয়ে গেছে। প্রমথর দিকে একখানা কাগজ এগিয়ে দিল। হাতে নিয়ে দেখল এযে তারই একটা এ্যাপলিকেশন। সবাইকে গাড়ি করে অফিসে আনা হয়। সে যেখান থেকে আসে অফিস টাইমে সেখানে বাসে ওঠা কঠিন। অতএব আপনি যদি অফিসের বাসটাকে বলে একটা ব্যবস্থা করেন। নীচে প্রমথর পুরো নাম বড় বড় করে লেখা। আগে অবিনাশদাকে ব্যাপারটা নিয়ে দু' একবার বলেছে। অবিনাশদা বলেছে, হবে—হবে—অস্থির কেন এত!

গতকাল এ্যাকাউণ্টসের দু'চারজনের বুদ্ধিতে এই এ্যাপলিকেশনটা লিখে বেয়ারা দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল প্রমথ।

অবিনাশের মনে হয়েছিল, আমি যখন বলেছি হবে—তখন হবেই, তাই নিয়ে এ্যাপলিকেশন কেন। আমার কথা বিশ্বাস হল না। প্রমথর এই এ্যাপলিকেশনের পেছনে নিশ্চয় বারিদবাবুদের কারও বুদ্ধি আছে।

প্রমথ এ্যাপলিকেশনটা হাতে দিয়ে বলল, 'হ্যাঁ, আমি লিখেছি। ওখান থেকে বাসে ওঠা যে—'

অবিনাশদা থামাল, 'বুঝেছি।' তারপর বলল. 'তা মুখে বললেই পারতে। এসব লেখালেখি আমার ভাল লাগে না।'

পুরোটাই কেমন সহজ হয়ে গেল।

অফিসের পর শিবপুরে গেল। অফিসে আজকাল কেমন খারাপ লাগে। কিন্তু শিবপুরে গিয়ে আরও খারাপ লাগল।

হেরিকেনগুলোর রোজ কি চিমনি ফেটে যায়। কেবল পথের আলোতে উঠোনটা কিছু পরিষ্কার দেখা যায়। না হলে সবটাই অন্ধকার। বীথি ভেতরে ছিল। বেরিয়ে এল। কিন্তু কোন কথাই প্রায় হল না। শিবপুরে যাওয়াকে যদি প্রেম করা বলা হয়—তাহলে এসব নিশ্চয় প্রেম না। কোন নরম কথাই হয় না। আলাপের পর যতই দিন যাচ্ছে ততই প্রমথ গম্ভীর হয়ে যাচ্ছে।

বাড়ির লোকদের রাজী করানো, অফিসে এখনও টেম্পোরারী—সব মিলিয়ে এই গভীর অন্ধকারে বীথিকে বিয়ে করা আর যাই হোক্ নরম কিছু নয়। বরং অনেক রকম চিন্তায় প্রমথ দিন দিন ডুবে যাচ্ছে।

বীথি আজই প্রথম তুমি বলল। 'এলে কেন?'

এটা রসিকতা কিনা বোঝার আগেই বীথি বলল, 'দাদার দুদিন কোন খবর নেই।'

'খোঁজ নিয়েছ।'

'জানি কোথায় আছে। আসবে ঠিকই।' তারপর বলল, 'বৌদি বাচ্চা হতে বাপের বাড়ি গেছে সেই কতদিন। এখন ত এলে পারে।'

'বাচ্চা হয়েছে?'

'কবে। মাস দুই বয়েস হয়ে গেল।—ছোড়দির ত বিশ্রাম নেই। হাবুলটা বৌদির জন্যে সন্ধ্যে হলেই কাঁদবে।' ছোড়দি কেন, বীথিরও বোধহয় এক অবস্থা।

প্রমথ চুপ করে থাকল। অন্ধকার বাড়িটার সবকিছু তার কাছে এখন পরিষ্কার। বীথি এখানে থাকে।

বীথি বলল, 'এখন কিন্তু চা দিতে পারব না। চিনি আনাতে হলে কাবুলকে জাগাতে হবে আবার—'

'দরকার নেই। আমি উঠব।' বলে প্রমথ উঠল। বীথি ভাবল তার কথায় রাগ করল না ত। আগের মত হাসিখুশী ভাবটাও কেমন প্রমথর মুখে আজকাল আর থাকে না। একবার ভাবল ডেকে বসাবে। কিন্তু প্রমথ তখন দরজার বাইরে পা দিয়েছে। এখান থেকে ডাকতে হলে গলা চড়াতে হবে। আর কি বলেই বা ডাকবে। 'এই--!' কিছুতেই তা পারল না বীথি।

বাড়ি যেতে বেশ রাত হল। খাওয়া দাওয়ার পর মা বলল, 'কোথায় ছিলি? এত দেরী হল—'

'এক বন্ধুর বাড়ি যেতে হল ছুটির পরে—বিবেকানন্দ রোডে।'

'নীতিশের শ্বশুরবাড়ি না ত? শিবপুরে—'

প্রমথ এবারে আর থাকতে পারল না। 'হ্যাঁ, শিবপুরে ছিলাম এতক্ষণ। আমি ওখানেই বিয়ে করব।'

অল্পক্ষণের মধ্যে সব চুপ হয়ে গেল। প্রমথ জানে মা কেন এখানে বিয়ে দিতে রাজী না। টাকা পয়সা পাবে না। না পেলে রেবার বিয়ের দেনা শোধ হবে না। অন্ধকারে মশারিতে ঢোকার পর আর কেউ কোন কথা বলল না। পল্টুই আগে এসে এসব খবর দিয়েছে বাড়িতে। এখন মড়ার মত ঘুমোচ্ছে।

ক'দিনের মধ্যে একরকম জেদের মাথায় প্রমথ সব ঠিক করে ফেলল। জেদ না করলে মা'র গো কমবে না—আবার ওদিকে বীথিদের বাড়ির লোকও প্রমথর বাড়ির মত পাওয়ার আবদার ছাড়বে না। বীথির দাদাকে মা'র সঙ্গে দেখা করতে বলেছে। বলতে বলেছে—দেখুন আমার পণ দেওয়ার উপায় নেই। কিন্তু তিনি তা বলতে পারবেন না। বলতে তার মান যায়। আজকাল ত বিপদে পড়লে সবাই বলে ওকথা। এদিকে বাড়িতে বড়দা মা ওরা প্রমথর জেদ দেখে বলল, 'ওদের দেখা করতে বল্। যা পারে তাই দিক। কিন্তু একবার অন্তত দেখা করুক।' মানে—শেষ আশা, যদি কিছু দেয়। কিন্তু প্রমথ জানে —দেওয়ার কোন উপায় নেই।

এ অবস্থায় রেজিস্ট্রিই উত্তম। নীতিশ সব বুঝল।

প্রমথ বলে দিল শুক্রবার আঠাশে সে রেজিস্ট্রি করবে। সবাই চুপ করে গেল বাড়িতে। পল্টু কিছুটা ক্ষুণ্ণ। তারও চাকরী ছাড়ব ছাড়ব মনের অবস্থা। গভর্মেণ্ট চাকরীতে জয়েন করবে কিনা ঠিক করতে পারছে না।

অবিনাশদা সব শুনে হাসল। বলল, 'পারবে ত?' প্রমথ চুপ করে থাকল। অবিনাশের ভয় হচ্ছিল, সব না বুঝে প্রমথ কোন ভুল করছে না ত।

বৃহস্পতিবার কিছু টাকা যোগাড় করে শিবপুর চলল প্রমথ। গোটা দুই বাজে। বীথির শাড়ী ব্লাউজ আঙটি কিনতে হবে। টেলিফোন ভবনের কাছে সরকারী বাগানে মালী রবারের নল দিয়ে জল দিচ্ছে। নতুন ট্রাম লাইন পাতা হচ্ছে। ব্রিটিশ আমলের টাক মাথা এক সাহেবের মূর্তি ঘাসের ওপর শোয়ান। লাইন বসান হয়ে গেলে জায়গা বদলে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হবে। সাহেবটার পাথরের চোখে বাগানের জল লেগে আছে। সাহেবটা মৃত্যুর বহু পরে কলকাতার মাঠে শুয়ে কাঁদছে। সেদিন মা কেমন বিছানায় শুয়ে ছিল। পল্টু বলেছিল, 'এবারে ত্যাগ করত।' প্রমথও ত পার্কে পাথর হতে চায়। সুধা মার্ক-সীট টাইপ করে দিয়ে কেমন গম্ভীর হয়ে ছিল অনেকক্ষণ।

কথামত নীতিশ, কেয়া, ছোড়দি, বীথি রেডি হয়ে ছিল। প্রমথ পৌঁছতে পাঁচজনে বাজার করতে বেরোল। কাল প্রমথর বিয়ে।

আঙটির দোকানে সিগারেট দিল দোকানদার। প্রমথর মন্দ লাগছিল না। প্রমথ একটা পাঞ্জাবীও কিনে ফেলল। বীথির শাড়ীটা নীল রঙের। ব্লাউজের দাম নিল ছ'টাকা। কেনাকাটার পর নীতিশ সরবতের দোকানে নিয়ে তুলল। কেয়া বেশ সহজে সরবৎ খেল। মুস্কিল হল বীথির। স্ট্র দিয়ে সরবৎ টানতে

পারছে না। পারে—মানে, এরকম সবার সামনে—। বীথি গুণে বলে দিতে পারে ক'দিন পথে বেরিয়েছে। কেয়া বলল, 'কি রে ফুলদি—ঠান্ডা লাগছে?' বীথি সাবধান হয়ে গেল। এর পর না কেয়া বলে ফেলে—জানেন, ফুলদির না বাঁ দিকের নীচের পাটিতে একটা দাঁতে কি ব্যথা হয়।

প্রমথর ভালই লাগছিল।

হাসি ঠাট্টার মধ্যে ওদের বাসে তুলে দিল। নীতিশ পৌঁছে দিতে গেল। পাঞ্জাবীর প্যাকেট হাতে যখন বাড়ি ফিরল প্রমথ তখন রাত দশটা। মা'র ঘরে মেজদা, মেজবৌদি বসে আছে। তাদেরও খবর দেওয়া হয়েছে। প্রমথ একটু নার্ভাস হল। মেজদা হেসে ফেলল। প্রমথর এরকম ঢোকা দেখে গম্ভীর থাকা যায় না। প্রমথ বেশ ভালভাবে জানিয়ে দিল, কাল সে বিয়ে করছে।

মা প্রথমে কিছু না না করল। এখন মা'র ওপর কেমন একটা দাঁত রী রী করা রাগ হতে থাকল প্রমথর। ভেবে অবাক হল—আজ দুপুরের দিকে চোখে জল লাগা শোয়ান পাথরের সাহেব দেখে প্রমথর মনে হচ্ছিল মা বুঝি ওরকম ভাবে শুয়ে শুয়ে সেদিন কাঁদছিল!

শেষে মা বলল, 'বেশ ত এখানেই বিয়ে দেব। একটা পয়সাও চাই না। তারা একবার মেয়ে দেখাক শুধু।'

মেজদাও তাই বলল। প্রমথ দেখল রাজী হয়ে যাওয়া মন্দ না। তাছাড়া রেজিস্ট্রি করে, ঝগড়াঝাটি করে বিয়ের মজাই কেমন কোর্ট পুলিশের মত থমথমে হয়ে যাচ্ছে। প্রমথ বলল, 'বেশ।'

রাতে পল্টুর সঙ্গে বিছানায় শুয়ে শুয়ে অনেক কথা হল। পল্টু কাল রিজাইন দেবে। সরকারী চাকরীই ভাল। কার ভাল লাগে ছোট ছোট সাহেবদের ভয়ে তটস্থ হয়ে থাকতে—আজ অন্ডাল, কাল আসানসোল! তাছাড়া কলকাতায় থেকে আরও পড়াশুনোও করা যাবে। ঠিক হল যেখানে যা খবর দেওয়ার প্রমথ আর পল্টু কাল সকালে জানিয়ে দিয়ে আসবে। একবার শিবপুরে গিয়ে বুঝিয়ে বলে আসতে হবে ব্যাপারটা। তাছাড়া রেজিস্ট্রি অফিসেও একটা ফোন করতে হবে।

বীথির মা শুনে খুশীই হল। এই ত ভাল। সবার আশীর্বাদ নিয়ে যা হয়—।

বুধবার কি একটা ছুটি ছিল পরের সপ্তাহে। নীতিশ তার দিদির বাড়িতে বীথিকে দেখানোর ব্যবস্থা করল। সকালের দিকে মা আর বড়দা দেখতে গেল। প্রমথ পল্টুর সঙ্গে বসে বসে ফিউচার প্ল্যান নিয়ে মশগুল হয়ে থাকল। বাড়িটা পাল্টাতে হবে প্রথম—তারপর একটা ভাল বৈঠকখানা। এখন ত পল্টু

কলকাতায় পোস্টেড। বাড়িতে বেশী করে দিতে পারবে। ঘণ্টাখানেক পরে মা আর বড়দা ফিরে এল। মেয়ের কিছুই ভাল না। তবে নাকি লম্বা আছে আর মুখখানা সুন্দর।

'কিন্তু মেয়ের বড়ভাইকে যে একবার আসতে হয়। কথাবার্তা হোক্।' বড়দা কিছু খারাপ বলেনি।

প্রমথ যেন অনেকখানি চিন্তা মুক্ত হয়ে গেছে।

নীতিশের দিদির বাড়ি প্রমথ চেনে। বিকেলের দিকে গেল। নীতিশ আর বীথি বেরোবার জন্যে রেডি। শিবপুরে পেঁছে দিতে হবে বীথিকে। কলোনির মত এলাকাটা। নীতিশের দিদির বাড়ির উঠোন নানা রকম ফুলে ভর্তি। প্রমথ গেট খুলে ঢুকতে বীথি মাথা নামাল। প্রমথ ঢুকতে কেয়া বেরিয়ে এল। 'তারপর!'

প্রমথ কিছু বলতে পারল না। নীতিশ বলল, 'চল।'

'কেয়া যাবে না?'

নীতিশ মাথা নাড়ল। 'সামনের বুধবার এসে নিয়ে যাব। ও এখানে থাকবে ক'দিন।'

নীতিশ প্রমথ বীথি তিনজনে বেরিয়ে গেল। কেয়া বারান্দায় দাঁড়িয়ে যতক্ষণ দেখা যায় ওদের দেখল।

বাসে একটাও কথা হল না একটু আগে বীথি কেমন সাবধানে নীতিশের দিদির বাড়ির উঠোনে একটা ফুল আলগোছে বোটা থেকে ছিঁড়ে নিচ্ছিল—এই কথাটা বারে বারে গুছিয়ে ভাববার চেষ্টা করছিল প্রমথ—মনের মধ্যে একটু আগে অল্পক্ষণের জন্যে দেখা ছবিটা প্রায় সাজিয়ে এনেছিল—এমন সময় এমন জোরে বাসটা ব্রেক করল, সবাই ঝুঁকে টাল সামলে নিল। এদিকটায় এখনও সহর আরম্ভ হয়নি পুরোপুরি! কলোনির কাদের গরু রাস্তা পার হচ্ছিল। টাল সামলাবার সময় বীথির হাত ঝাঁকি খেয়ে একটুর জন্য প্রমথর গায়ে লেগে গেল। বাসে লোক কম। বীথি হাত সরিয়ে নিচ্ছিল। নীতিশ বলল, 'এই! কি হচ্ছে?'

বীথি হেসে জানলা দিয়ে তাকিয়ে থাকল।

॥ সাতাশ ॥

সব সহজেই হয়ে যাবে আশা করেছিল। কিন্তু তা হল না। বীথির দাদা কথা বলতে এল ঠিকই। কিন্তু বড়দা গয়নাগাটি টাকা পয়সা কিছু চেয়ে বসল। বীথির দাদা আর আসে না কেন—ক'দিন পরে বড়দা জানতে চাইল। 'কি করবেন তিনি তা ত এসে জানিয়ে যাবেন কথা ছিল।'

তিনি আর জানিয়েছেন! প্রমথ সন্ধ্যেবেলা শিবপুর গেল। বীথির দাদা বাড়ি নেই। ছোড়দি বলল, 'দাদা যেতে রাজি হচ্ছে না।' অনেক পরে চা দেওয়ার সময় বলল, 'যায় কি করে—বলত, আমরা এতসব কোথায় পাব?'

প্রমথর রাগ হলেও মুখে কিছু বলল না। এদিকে বীথিদের দাদা পরিষ্কার বলতেও পারবে না—'আমার দেওয়ার উপায় নেই।' তাতে নাকি প্রেস্টিজ যায়। কিন্তু প্রমথ কোন্ দিক সামলাবে। বাড়িতে যদি বলে, 'তোমরা না বলেছিলে কিছু চাইবে না?'—তাহলে শুনতে হয়—'আহা, দেখি না কি দিতে পারে—তুই চুপ করে থাক্ না।' মা আবার ভয়ে ভয়ে বলে, 'তুই নিজে গিয়ে যেন কোনরকম বারণ করিস না।'

এই ভরাট হ্যাংলামির মধ্যে মা'র সাবধান করে দেওয়ায় প্রমথর হাসিই পায়। সে কি বারণ করবে। যদি কিছু দিতে পারে তাতে মা ওরা খুশীই হবে। কিন্তু হাড় বের করে কিছু দেওয়ার ত মানে হয় না। ধার দেনা দুশ্চিন্তা—এসব ত কম হয়নি রেবার বিয়েতে। কিন্তু মা কি তা বুঝবে।

চা দেওয়ার পর বারান্দায় শুধু ছোড়দিই ছিল। বীথি কোথায় বলতে ছোড়দি গম্ভীর হয়ে থাকল। খাটাল তুলে দিচ্ছে বলে পাড়ার এক গোয়ালা দুটো গরু বীথিদের উঠোনেই রাখে আজকাল। হাবুলও খাঁটি দুধ পাচ্ছে। প্রমথ আবার বলতে ছোড়দি বলল, 'ট্যুইশানিগুলো ছেড়ে দিতে গেছে।'

'কেন?'

'আমার বলার ইচ্ছে ছিল না প্রমথ—তবু বলছি, তোমাকে নিয়ে কথা উঠেছে। জায়গাটা ত ভাল না। রাত করে মেজদির বাড়ি থেকে পৌঁছে দিয়েছ দু-একদিন। তাইতেই—'

চায়ের কাপ তুলতে তুলতে ছোড়দি বলল, 'আচ্ছা লোক এত কুচুটে হয় কেন বল ত?'

প্রমথ একটু আগে গম্ভীর হয়ে পড়েছিল। ছোড়দির এ কথায় হাল্কা হল। 'এতদিনেও জানেন না লোক কেন খারাপ হয়!'

কথাটা এমনিই বলা। কিন্তু ছোড়দি ভারি হয়ে গেল। চায়ের কাপ নিয়ে যেন উঠতেই পারছে না। শেষে উঠল ঠিকই। ঘরে যাওয়ার সময় বলল, 'তা ঠিক!' যেন মনে মনে কি মিলিয়ে নিল। খচ্ করে নির্মল চক্রবর্তীর কথা মনে হল প্রমথর। ছোড়দিকে সে আঘাত দিতে চায়নি। নিজের কথাই বলছিল। নির্মল চক্রবর্তী, সে—এরা সব এক দলের। তাই ত মনে হত।

প্রমথ উঠে দাঁড়াল। ঠিক এখনই নীতিশ কলকাতার বাইরে। কেয়াকে একটা খবর দেওয়া দরকার। তারপর মনে হল ট্যুইশানি ছেড়ে দিয়ে ফিরে আসার আগেই সব ব্যবস্থা করতে হবে।

প্রথমে রেজিস্ট্রি অফিসে ফোন করল। অফিস বন্ধ। গাইড দেখে ভদ্র-লোকের বাড়িতে ফোন করল। কাল সকালে রেজিস্ট্রি হবে। ভদ্রলোক রাজী হলেন। ফোন করে মাখনবাবুর ওখানে গেল। মাখনবাবু মেজদি দুজনেই ছিল। তারাও রাজী। সত্যি অবস্থাটা যেমন ঘোরালো হয়ে পড়ছে—তাতে না সব ভেস্তে যায়।

বীথিদের বাড়ি যাওয়ার সময় মেজদি মাখনবাবু সঙ্গে চলল। প্রমথ বেশ ক্লান্ত হয়ে গেছে। বীথি এখনও ফেরেনি। বীথির মা বলল, 'যা ভাল বুঝবে তাই করবে।' হেরিকেনের আলোয় এইসব কথা অন্ধকার রাত্তিরে ত্রিপল ঢাকা ডুবন্ত স্টীমারের প্যাসেঞ্জারের মুখেই মানায়। যে কোন মুহূর্তে বীথি এসে পড়তে পারে। প্রমথ বলল. 'তাহলে মেজদি, আপনি ত আছেন—'

'হ্যাঁ, তুমি এস। কোন চিন্তা নেই।'

পরদিন ভোরে উঠে পরমেশ, বীরুয়া, অনুতোষকে খবর দিল। পল্টুকে এখন জানান ঠিক হবে না। এমনিতেই কিছুটা ক্ষুণ্ণ হয়ে আছে। কিন্তু কি করে বোঝায়—তোমরা সবাই যা যা চাও তার তলায় পড়ে একটা মেয়ে এর মধ্যেই ট্যুইশানি ছেড়েছে—তারপর সব যদি হয়ও তখন আমি—আমি একা কেন, বীথিও হয়ত ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়বে।

পরদিন সময় মত মাখনবাবু আর বীথি ট্যাক্সি থেকে নামল। পরমেশ ওরাও সময় মত হাজির। বীথি সেই শাড়ী ব্লাউজ পরেছে। তারপর নীল

কাগজে সই। দুজনেই আলাদা করে শপথ নিল। রেজিস্ট্রার তার ঘরে বসে দুটো ভদ্র কথা বললেন। কাঠের সিঁড়িতে দরোয়ানকে একটা টাকা বকশিশ দিতে হল।

পরমেশ আর মাখনবাবু স্যাঙ্গুভ্যালিতে নিয়ে তুলল। পুডিং, কেক সঙ্গে চানাচুর। বীরুয়া একটা চা নিল। সব শুদ্ধ বিল উঠল তিন টাকা চুয়ান্ন নয়া পয়সা। ঘণ্টাখানেক একেবারে উড়ে গেল। প্রমথ হাসছিল ঠিকই। কিন্তু কাঁটার মত একটা চিন্তা তখনও তাকে একটু একটু করে ছুঁচ ফোটাচ্ছিল। বীথি কেমন একটু ঘোমটা দিয়েছে। পরমেশ বীথিকে বলল, 'তিরিশ বছর আগে পৃথিবীতে ছিল না এমন একটা জিনিসের নাম বলুন ত।'

বীথি শুধু হাসল। পরমেশ প্রমথর কাঁধে হাত রেখে বলল, 'এই আমাদের প্রমথ!'

মাখনবাবুও হাসল। প্রমথ পরমেশের কথা আর শোধরাল না। তার এখনও তিরিশ হয়নি। আজকে হিসেব করার মানে হয় না। একটু বেহিসেবী হতে দোষ কি। অন্তত বয়েসটা ত আমার। তা নিয়ে বাড়িয়ে বলে বড়লোকি করাতে কখনো কখনো আরামও আছে।

দোকান থেকে বেরোবার সময় বীরুয়া বলল, 'দেবুদার দোকানে আসিস কিন্তু।'

ট্যাক্সি অফিস পাড়ার মধ্যে দিয়ে যাওয়ার সময় প্রমথকে অফিসে নামিয়ে দিয়ে গেল। প্রমথ সিঁড়িতে দাঁড়িয়ে দেখল তার এইমাত্র বিয়ে করা বৌ ট্যাক্সিতে শিবপুরে যাচ্ছে। খাতায় সই করার সময় দেখল বেশ খানিকটা লেট হয়ে গেছে।

এ ক'মাসে অফিসে বন্ধু কম হয়নি। কেউ কেউ ব্যাপারটা জানত। আর আজ এমন হঠাৎ বিয়ে হয়ে যাওয়ার খবর প্রমথ চেপেও রাখতে পারল না। বিকেলের দিকে একবার অবিনাশদার ঘরে বলতে গেল। ঘর ভর্তি লোক। অফিস থেকে বেরোবার সময় ফোন তুলে দেখল, লাইন এনগেজ্ড্।

এসপ্লানেডে এসে ঠিক করল, বাড়ি গিয়ে ফরসা ধুতি পাঞ্জাবী পরে শিবপুরে যাবে। সাজগোজে কিছু দেরী হল। পথে দেবুদার দোকান পড়ল। নেমে সেখানে কাউকে পাওয়া গেল না। কাছেই অনুতোষের বাড়ি। হাঁটতে হাঁটতে এগোল। ক'মিনিট আর থাকবে। দেখা হলে কিছু কথা বলেই শিবপুরে যাবে। আজ থেকে বীথি তার বৌ।

অনুতোষের বাড়ির সামনে সবাই আছে। সঙ্গে বৌদিও এসেছে। পথে দাঁড়িয়ে গল্প হচ্ছে। প্রমথ যেতে বীরুয়া বলল, 'একদিনেই চেকনাই দিচ্ছে চেহারায়।' প্রমথ আজ দাড়ি কামিয়ে স্নো মেখেছে। তারপর পাউডারও দিয়েছে।

ধোপ-ভাঙা ধুতি পাঞ্জাবী। চুল আঁচড়াতে অন্তত পাঁচ মিনিট লেগেছে। তাও কি বাগে আনা যায় সহজে।

পরমেশ বলল, 'তোর বৌ কিন্তু বেশ লম্বা।'

বৌ বলতে প্রমথর মনে হল, বীথি তাহলে এখন তার। আগে কার ছিল। অরবিন্দ চৌধুরীর। এমন সময় নতুন জুতোর বাক্স হাতে সুধা বেরোল নিউ সু স্টোর্স থেকে। প্রমথ আর প্রমথর সব বন্ধুকে একসঙ্গে অনেকদিন পরে দেখে খুশীই হল। এগিয়ে এসে পরমেশের সঙ্গে গল্প আরম্ভ করল। একথা সেকথা—, 'জুতোটা ছিঁড়ে গেছে—তাই এটা কিনলাম—' তারপর যাওয়ার সময় প্রমথকে বলল, 'কবে যাচ্ছ আমাদের ওখানে?' এর বেশী সুধা আজ বলতে পারবে না। সেদিন সিনেমা হলের সামনে প্রমথর ওপর রাগ দুঃখ ইত্যাদি সব হলেও বারে বারে দেখা করার ইচ্ছে হয়েছে সত্যি—কিন্তু সেধে কিছুতেই আর যায়নি। আজ হঠাৎ এমনি দেখা হয়ে যাওয়াতে বাঁচা গেল।

প্রমথ এতক্ষণ কাঁটা হয়ে ছিল। বৌদি অন্যদিকে তাকিয়ে বীরুয়াকে কি বোঝাচ্ছে। প্রমথ বলল, 'যাব একদিন।'

সুধার অনেক কিছু বলার ইচ্ছে হলেও কিছু বলতে পারল না। সবার দিকে তাকিয়ে 'যাই' বলে ভিড়ে মিশে গেল। প্রমথ আর কোনদিন যাবে না হয়ত। অথচ আমি সৎ হতে চাই। মৃত্যুর সময় আমরা সবাই বিনা চেষ্টাতেই সৎ হয়ে যাব।

বৌদি বলল, 'কিছুই জানে না?'

পরমেশ দেখল, আজ প্রমথর বিয়ে হয়েছে—এখন এসব নিয়ে চিন্তা করার মানে হয় না। রেগে বলল, 'বাদ দাও ত।'

রেসকোর্স থেকে বেরিয়ে একদিন রিক্সায় চড়েছিলাম আমি। সুধা পাশে বসেছিল। আজ সুধার বুকের কাপড় মেঘ মনে হল না। আমার চোখ আর লালচে হল না হয়ত। যা দেখি তাতেই ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে এগোব না আর কোনদিন। কলকাতা শেষ হলে মাঠ আছে—রেল লাইনের পাশে দূরে ছবির মত গ্রামও আছে হয়ত, সেখানে 'নিশ্চিন্তি;'—কথাটা নিশ্চিন্ত বোধহয়।

সুধা যেদিকে গেল তার উল্টো দিকে দেবুদার দোকান। অনুতোষ দোতলা থেকে নেমে এল। আজ আর শিবপুরে যাবে না প্রমথ। যেতে ইচ্ছে করছে না। পরমেশ পুরো দলটাকে তাড়াতে তাড়াতে নিয়ে চলল। উল্টো দিকে এইমাত্র একটা মন খারাপ করা মেঘ চলে গেছে।

পরদিন অফিসে বিকেলের দিকে অবিনাশদাকে বলতে গেল। কথা শেষ

হওয়ার আগেই অবিনাশদা বলল, 'জানি।' আবার মুখ সেরকম কুঁচকে গেছে। 'তোমার খবর অন্যের মুখে শুনতে হল আমাকে!' তারপর থেমে বলল, 'আমি ঠিক করেছি এখন থেকে আর তোমাদের সঙ্গে মিশব না। কি দরকার—সবাইকে চিনি।'

প্রমথ বুঝল, অবিনাশদার আহত হওয়ারই কথা। কিন্তু হয়ত সন্দেহ করছে—আমি আর সবাইকে বললাম—অথচ তাকে কেন বলিনি? নিশ্চয় অন্য যারা তাদের কেউ কেউ বারিদবাবুর দলের। কিন্তু প্রমথ ত এখানে নতুন। ভাল করে জানেও না কারা কোন্ দলের।

কেন বলতে পারেনি তা বোঝাবার চেষ্টা করল।

বাড়িতে এখনও বলা হয়নি। পল্টু জানে না। নীতিশ ফিরেছে কিনা কে জানে। কাল বীথিদের বাড়ি যাওয়া হয়নি। পথে সুধা এল। সবটাই কেমন জটপাকানো। তার ওপর অবিনাশদার সেই সন্দেহ। আর কত পারা যায়। আমি কি করে বলি—আপনি আমার পর না। খবরটা আপনাকে ইচ্ছে করে চেপে যাইনি। বারে বারে সন্দেহ করলে ওপরসা এই 'অবিনাশদা' ডাকটা কেমন মিথ্যে লাগে।

প্রমথ মরীয়া হয়ে বলল, 'আপনি যা ইচ্ছে ভাবুন আমার আসে যায় না। আপনি, শিবপুর, আমাদের বাড়ি—সবাইকে খুশী করা আমার শক্তিতে কুলোয় না।' তারপর হঠাৎ বলল, 'চারদিকে সাকসেসফুল লোকের ভিড়। আপনি চেষ্টা করায় আমার একটা চাকরী হয়েছে সত্যি—সেজন্যে বিয়ে করতেও সাহস পেয়েছি। জীবনে কোনদিন ভাল রেজাল্ট হয়নি। আমি একা থাকতে চাই।'

প্রমথ উঠতে উঠতেই দেখল অবিনাশদা ঝুঁকে পড়ে প্রমথর দিকে তাকিয়ে আছে। প্রমথ চলে যাচ্ছিল। অবিনাশদা ডাকল, 'শোন, শোন—আরে শোন।'

প্রমথ দাঁড়াল না। নিজের সিটে এসে কলমটা টেবিলে রাখল। তারপর পুরো এক গ্লাস জল দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেয়ে ফেলল। বসে মনে হল, আরও একটা কথা অবিনাশদাকে বলা হয়নি। আপনাদের সবাইকে খুশী করা আমার পক্ষে সত্যি সম্ভব না। বিশ্বাস করুন। আমার জন্যে একটি মেয়ে সুখী হবে—এই নিয়েই আমি ব্যস্ত। মাথা ঠাণ্ডা করে বসবার পর মনে হল—সত্যিই কি একথাটা বলতে পারতাম।

বিকেলে মাথা ধরতে এ্যানাসিন খেল। শিবপুরে পেঁৗছে দেখল নীতিশ কেয়া দুজনেই আছে। মেজদি সতরঞ্চি পেতে দিল। নীতিশকে কি বলতে নীতিশ বলল, 'তোমার শাশুড়ীকে প্রণাম করেছ? যাও করে এস।' এটা

রসিকতা, না রীতকরণ? না রেজিস্ট্রি করার সময় খবর দেওয়া হয়নি বলে রাগ। কতজনকে খুশী করব। অফিস আছে এবং একশ গণ্ডা আরও অনেক কিছু আছে। প্রমথ প্রণাম করতে বীথির মা বলল, 'মা জানেন ত।'

প্রমথ হাসতে হাসতে বলল, 'জানবেন নিশ্চয়।' কথাটা হাসি মিশিয়ে অবহেলায় বললেও এখনও ঠিক করে উঠতে পারেনি—কিভাবে মাকে বলবে। হাজার রকম চিন্তা মাথায় ভারি মেঘের মত ঘন হয়ে আছে।

আজ বীথি খুব কমই সামনে এল।

কেয়া নীতিশ কেউই কথা বলল না। কেন খবর না দিয়ে সাত তাড়াতাড়ি রেজিস্ট্রি করতে হল তা আর ভেঙে বোঝাতে গেল না প্রমথ। কেয়া নীতিশ উঠল। প্রমথও উঠল। হাওড়ায় এসে দশ নম্বর বাস আর পাওয়া যায় না। প্রমথ ওদের তুলতে গিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নিজের লাস্ট বাসটাও মিস করল। খুব খারাপ লাগল।

এ কি রকম? এতক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে— তার সঙ্গে একটা কথাও বলছে না দুজনে। অথচ দিব্যি কথা বলছে নিজেদের মধ্যে। শেষে জানা গেল ওদের লাস্ট বাসও চলে গেছে। প্রমথ ট্যাক্সি ডেকে তুলে দিল দুজনকে। তাকে একবার উঠতেও বলল না নীতিশ। ট্যাক্সিটা যখন ব্রীজে উঠল পেছনের কাঁচ দিয়ে কেয়া ফিরে তাকাল এক সেকেণ্ডের জন্যে। প্রমথ তখনও ট্যাক্সি স্ট্যাণ্ডে দাঁড়িয়ে আছে।

টাকার দরকার এবং সময় মত কিছু ওভারটাইমের কাজও পাওয়া গেল। দিন তিনেক অফিসের পর ঘণ্টা চারেক করে কাজ করেও শেষ করা যাচ্ছে না। আর দুদিনের কাজ বাকি। শুক্রবার রাত আটটা নাগাদ অবিনাশদার ঘর থেকে ফোন এল। 'কাজ হয়ে গেলে একবার আসবে।'

কে জানে নতুন কি আবার হল। যাক্‌গে, যা হয় হবে। প্রমথ স্কেলটা নিয়ে নতুন একটা ঘর কেটে নিল। শীগ্‌গির অডিট হবে অফিসে। শিবপুর যাওয়া এখন একদম বন্ধ। রায়বাবুও ক'দিন আসছে না। বাড়ি বদলাচ্ছে।

সাড়ে ন'টা নাগাদ অবিনাশদার ঘরে গিয়ে দেখল আলো নেভানো, তালা বন্ধ। তাহলে অপেক্ষা করে চলে গেছে।

পরদিন শনিবার। অফিসে একটু আগে এসে বিল সেকসনের সিনিয়র অনাথবাবুর সঙ্গে গল্প করছিল প্রমথ। এমন সময় হাসিমুখে অবিনাশদা ঢুকল। টেবিলে হাত রেখে ঝুঁকে পড়ে অনাথবাবুর সঙ্গে কি কথা বলতে

আরম্ভ করে দিল। হঠাৎ থেমে বলল, 'প্রমথ, তুমি আমার ঘরে গিয়ে বস। আমি আসছি।'

প্রমথর ভয় হল। কাজে কোন ভুল হয়নি ত।

অবিনাশদার ঘরে ক'মিনিট বসতেই অবিনাশদা এল। বেশ ঢিলেঢালা হয়ে নিজের চেয়ারে বসে সিগারেটের মুখ খোলা প্যাকেটটা প্রমথর দিকে এগিয়ে দিল। 'প্রাইভেট রিজার্ভ। ধরাও।' তারপর হাসতে হাসতে বলল, 'তোমাদের রায়ের প্রোমোশন হয়েছে। এখন থেকে কম্পিউটার মেসিনে বসবে।'

'গুড্ নিউজ!' সত্যিই ভাল খবর। গ্রেড আছে। সুরুতেই সব নিয়ে তিনশোর ওপর। তারপরে কাজ শিখলে অনেকদূর অব্দি যাওয়া যায়।

'তুমিও কম্পিউটারে বদলি হয়েছ। তোমারও প্রোমোশন হয়েছে!' মুখ ভর্তি হাসি অবিনাশদার।

'সত্যি!'

'হ্যাঁ। কাল তোমাকে বলব বলে ডেকেছিলাম।'

'এসে দেখি আপনি নেই। কাজের চাপও ছিল।'

'জানি।' তারপর বলল, 'বিজ্ঞাপনের প্রণবেশেরও হয়েছে। তোমাদের তিনজনের একসঙ্গে হল।'

প্রমথ কি বলে অবিনাশদাকে ধন্যবাদ দেবে। মুখে ধন্যবাদ দেওয়াটা এমন সন্দেহজনক। এখুনি পল্টুর অফিসে একটা ফোন করতে হবে।

'যাও মন দিয়ে কাজ কর।'

প্রমথ উঠছিল। অবিনাশদা থামাল, 'এখন আর মন খারাপের কিছু নেই। মোটামুটি একটা মাইনে পাবে--ইনক্রিমেণ্ট আছে—কি বল।'

কি বলবে প্রমথ।

'শিবপুরের খবর কি?'

'কদিন যেতে পারছি না।—'

'যাও—ঘুরে এস' তারপর থেমে বলল, 'বাড়িতে বলেছ?'

'এবারে বলব।'

'বলে দাও।'

অবিনাশদার সব কথাগুলোই খুশীর দমকে মাখানো। 'আমি ফোন করে দিচ্ছি—আজ আর তোমার ওভারটাইম করতে হবে না। যাও—' একরকম তাড়া দিয়েই ঘর থেকে বের করে দিল প্রমথকে।

বেরিয়ে এসে পল্টুকে ফোনে ধরবার চেষ্টা করল। খবরটা যে এক্ষুণি দেওয়া দরকার। ট্রাম বাস রাস্তা পার হয়ে খবর দিতে গেলে খুশীতে তার বুক ফেটে যাবে—না বলতে পেরে পেট ফুলে যাবে।

বিকেলের দিকে একটা সাপ্লিমেণ্টারী বিলে ক্যাশ থেকে কুড়িটা টাকা পাওয়া গেল। বাড়ি ঢোকার আগে পাড়ার পোস্ট অফিসের সামনের কাপড়ের দোকান থেকে মা'র জন্যে সাড়ে ষোল টাকা দিয়ে একখানা শাড়ি কিনল। আজকাল মা'র সঙ্গে শুধু ঝগড়াই হয়।

বাড়িতে পল্টু ছিল। দুলু আর বিজু ক্রিকেট নিয়ে তর্ক করছে। মা'কে শাড়িটা দিয়ে প্রোমোশনের কথা বলল। বিজুকে বাকি টাকাটা দিয়ে সন্দেশ আনাতে পাঠাল প্রমথ। পল্টু বলল, 'তাহলে সত্যিই গুড টাইম পড়ল। কি বল! একবার বিমলবাবুর বন্ধুকে দিয়ে হাতটা দেখাবে নাকি!'

সন্ধ্যের দিকে রেজিস্ট্রির কথা বলে দিল প্রমথ। মা চুপচাপ আলো নিভিয়ে শুয়ে থাকল সন্ধ্যেটা। বড়দা সব শুনে গুম হয়ে থাকল। খাওয়া দাওয়ার সময় মা রোজ সামনে বসে। আজ এল না। অন্ধকারে খাটে বসে বসেই বড়দাকে বলল, 'তাহলে ভানু বিয়ে দিয়ে ঘরে নিয়ে আয়। ও কাগজের বিয়েতে আমার বিশ্বাস নেই।' কথাগুলো ভারি। মা অন্ধকারে বসে বললেও প্রমথ মা'র মুখের চেহারা আন্দাজ করতে পারছিল।

অন্ধকারে নিশ্চয় পা মেলে বসে আছে মা। আজ আর আকাশের দিকে তাকায়নি। গোল মুখে মাংস কমে গিয়ে কোথাও কোথাও গর্ত হয়েছে। টানা চোখের ওপর কাঁচা পাকা চুলের একটা গুছি হয়ত ঝুলে পড়েছে। মেলে দেওয়া হাতে ব্রোঞ্জের চুড়ি ঘসা খেয়ে খেয়ে জায়গায় জায়গায় নীল দাগ পড়েছে। মা নিশ্চয় চুলকোচ্ছে--অন্যমনস্ক হয়ে।

॥ আঠাশ ॥

পঞ্জিকা দেখে যেদিন বিয়ে হল সেদিন রবিবার। বড়বৌদি লবঙ্গ দিয়ে চন্দন পরিয়ে দিল। সাধারণ ধুতি পাঞ্জাবী। শেষ অব্দি বাবাও আশীর্বাদ করতে সঙ্গে গেল। যাওয়ার সময় নিত্যর খোঁজ পড়ল। একজন বন্ধুস্থানীয় সঙ্গে থাকা দরকার। মেজদা বার বার নিত্যর নাম করল। কিন্তু নিত্যর ঘর বন্ধ। ডবল তালা ঝুলছে। পল্টু দুলুও চলল। অন্য আর কাউকে বলেনি প্রমথ। শঙ্করকেও না। শঙ্কর পরমেশ সবাইকে বৌভাতে বলবে ঠিক করেছে।

পাড়ার ক্লাবঘরে ডেকরেটরের কার্পেটে টোপর হাতে বেশীক্ষণ বসে থাকতে পারল না প্রমথ। ট্যাক্সিতে বসেই ঘসে ঘসে চন্দন মুছে ফেলেছে। বাইরে বেরিয়ে দেখল নীতিশের সঙ্গে অবিনাশদাও এসেছে।

ছাদনাতলায় যেতে ছোড়দি আর কেয়া জলচৌকিতে দাঁড় করিয়ে অনেকটা স্নো পাউডার মাখিয়ে সাজিয়ে দিল। এই সময় কারও দিকে তাকান যায় না। বিশেষ করে যেখানে ভীড়ের মধ্যে পল্টু বিজু ওরাও আছে।

বিয়ের পিঁড়িতে বীথি এমনভাবে বসল যেন ঠিক মেজদির ঘরে বুলা ওদের পড়াতে বসেছে। বেনারসীতে বড় নরম লাগল। হাত ঠিক মুঠো করা। প্রমথর আর হাতের ওপর হাত রেখে গল গল করে কিছু বলতে হবে না।

শুভদৃষ্টির সময় দুলুর ক্যামেরার ফ্ল্যাশবাল্‌ব্‌ তো কয়েক সেকেণ্ডের মত চোখ ধাঁধিয়ে দিল। তাহলে সত্যি সত্যি বিয়ে হয়ে গেল।

খালি গায়ে চাদর গলায় উঠে দাঁড়াতে নতুন একজন বিধবা মহিলা প্রমথর হাত ধরে বলল, 'ছোট থাকতেই পিতৃহীন মেয়ে—দোষ দেখলে ঢেকে দিও বাবা, গুণ থাকলে উঁচু গলায় বলবে।' এমন করে হাত ধরে বলল! মহিলার গায়ের রঙ মাটির মত নিটোল শান্ত। নদীর পাড় থেকে উঠে আসা একটা করুণ অনুরোধের মত লাগল তার কথাগুলো। দূরে বীথি। শাড়িতে কিছু ঝক্‌মকে গয়নায় একেবারে নতুন। তাহলে আমি কাঁচের মার্বেলের মত 'কি জানি' ধরণের চোখ বসানো, পিঠে একটা বেণী ফেলে দেওয়া—এই বীথির সব কিছুর আমিই সব।

বিয়ের পর বাবা অনেকক্ষণ ধরে দুজনের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করল। যাওয়ার সময় বিজু আর পল্টু ভীড়ের মধ্যে লজ্জা করে বীথিকে বলল, 'তাহলে চলি বৌদি।' বীথি মাথা নাড়ল।

আর পাঁচটা বিয়েতে যা যা হয় সবই তাহলে হল।

সবাই চলে যেতে প্রমথ ছোড়দিকে বলল. 'আমাদের বাসরের নিয়মে সবাইকে ঘরে থাকতে হয়। মা বলে দিয়েছে।' ছোটবেলায় মা বেহুলার গল্প কেমন ভাব দিয়ে বলত। প্রমথ জাঁতিখানা শক্ত করে ধরে রেখেছে।

নীতিশ হাসতে হাসতে বলল, 'নিশ্চয় আমরা ঘরে থাকব। সবকিছু পাহারা দিতে হবে না!'

দাদাকে এতক্ষণ কোমরে তোয়ালে জড়িয়ে পরিবেশন করতে হয়েছে। তিনি হঠাৎ ঘরে ঢুকলেন। আগের কথা কিছু শোনেননি। বললেন, 'উঠোন পরিষ্কার করতে গিয়ে কাল সকালে একটা সাপ বেরোল।'

প্রমথকে তাকিয়ে থাকতে দেখে বললেন, 'না, মেরেছি—'

সাপকে ভয় পেতে যাবে কেন প্রমথ। জাঁতিখানা বালিশের নীচে রেখে দিল। পাশের কারখানা বাড়ি থেকে ইলেকট্রিকের কানেকশন আনা হয়েছে। সুইচ নেই। শোবার সময় প্রমথ উঠে সাবধানে বাল্‌ব্‌গুলো খুলে দিতে ঘর অন্ধকার হয়ে গেল।

অনেক রাতে বীথি হাতপাখা নাড়ছিল। প্রমথ হাত দিয়ে থামিয়ে দিল। সবাই ঘুমুচ্ছে। রাস্তার আলোটা বারান্দা অব্দি পৌঁছতে পেরেছে।

প্রমথ বলল. 'তোমাদের বাড়িতে সাপ আছে বুঝি।'

'আগে আরও ছিল। একদিন বৌদি মশারি টানাতে গিয়ে দেখে আলনায় একটা সাপ ঝুলছে।'

'তারপর।'

'তাড়া দিতেই চলে গেল।' প্রমথর বিশ্বাস হল না। সব সাপ তাড়া খেয়ে পালায় না।

বীথি বলল, 'দাদা যেটা মেরেছে—তার সঙ্গে বোধহয় আর একটা থাকত।' দূরে নালা দিয়ে কুল কুল করে জল পড়ার শব্দ হচ্ছে। শব্দটা এত শান্ত, এত পবিত্র—দূর থেকে বোঝার উপায় নেই জলটা কতখানি ময়লা—কত বীজাণু আছে তাতে।

বীথি তার কথা সাজিয়ে বলার চেষ্টা করল, 'ওরা জুড়ি বেঁধে ঘোরে ত।' হয়ত এই অন্ধকারে আর একটা সাপ আছে। প্রমথরা ইস্কুলে থাকতে একটা জুড়ির সাপ মেরেছিল। মেরে মাঠে ফেলে দিয়েছিল। ফিফ্‌থ্‌ পিরিয়ডে

মরা সাপের গায়ের গন্ধে জুড়ির অন্যটা ক্লাশ অব্দি এসে হাজির। কি ফোঁস ফোঁসানি। ড্রিল স্যার মেরেছিল সেটাকে।

জাঁতিটা বালিশের নীচে আছে। রেসকোর্স এখন অন্ধকার। উঁচু ঘাসের মধ্যে বিকেলে হয়ত সেখানে সাপ বেরোয়। সুধা সে কথা বলতে প্রমথ বলেছিল—আমাদের কামড়াবে না।

আজ আসার সময় বড় রাস্তায় পথ না পেয়ে ট্যাক্সিগুলো পাশের রাস্তা ধরে শিবপুর আসছিল। পথে সুধাদের গলি পড়ল। প্রমথ কতদিন সুধার সঙ্গে এই গলি দিয়ে গেছে।

প্রমথ বীথির গলা জড়িয়ে ধরল শক্ত করে।

ওভারটাইমের টাকাগুলো পাওয়া গেল প্রায় মাস দুই পরে। নতুন সুটকেস, প্রায় আলাদা ঘর—তারপর বীথি, জীবনটা যেন আর একরকম করে সুরু হয়েছে প্রমথর। মা'র পক্ষে বীথিকে নিতে খুব কোন অসুবিধে হয়নি। অন্তত তাই ত মনে হয় প্রমথর।

শনিবার অফিসের পর দুজনে সিনেমায় গেল। সিনেমার পরে মিষ্টির দোকানে ঢুকল। বীথি রেস্টুরেণ্টে কেমন অস্বস্তিতে পড়ে। ভাল করে চায়ে চুমুকও দিতে পারে না। সব সময় মনে করে এই বুঝি সবাই তাকে লক্ষ্য করছে। লোকের আর কাজ নেই।

তার চেয়ে মিষ্টির দোকান ঘরোয়া। 'আর কিছু খাও' বলতে বীথি গা মোড়া দিল। 'ভাল লাগছে না।' বলে শুধরে নিল, 'মিষ্টিগুলো ভাল—আমারই গা পাকাচ্ছে, এত মিষ্টি।' পার্কে বসল দুজনে। চিনে বাদাম, আইসক্রিম দুই-ই হল। বিকেল হয়ে এসেছে। আমি এখন এখানে। পরমেশ ওরা দেবুদার দোকানে নিশ্চয়। শঙ্করের মনের মত তারা দিয়ে চাঁদ দিয়ে আকাশটা একটু পরে নিজেই সেজে উঠবে। 'আমাদের কিছু হবে না।' শঙ্কর এসব বলত। আমি সেসব জায়গা থেকে কতদূরে চলে এসেছি। সেসব কথা থেকে কতদূরে।

বাড়ি গিয়ে ড্রয়ার খুলে বসল। কয়েকটা লেখার সুরু পড়ে আছে। শেষ হয়নি। শেষ নেই।

মাঝে একদিন বীথির জন্যে দোকানে মাপ দিয়ে ব্লাউজের অর্ডার দিয়েছিল। প্রমথর এখনকার ভাবসাব রীতিমত বিবাহিত লোকের। সেই যাদের 'লোক' 'লোক' মনে হত প্রমথ এখন পুরোপুরি তাই।

সেদিন রায়বাবু অফিসের পর একসঙ্গে রাস্তা পার হওয়ার সময় বলল, 'আপনি ত মশাই একদিকে দারুণ সাক্‌সেসফুল।'

'কি রকম?'

'মানে যা ভেবেছিলেন—যাকে ভেবেছিলেন, তার সঙ্গেই ত বিয়ে হল।'

তা সত্যি। কবিতা করে না বললেও প্রমথ এখন বলতে পারে সুধার জন্যে এখন সে খুব কিছু বোধ করে না। হ্যাঁ, আলাপ ছিল, বৌদি চা কিনতে যাওয়ার পর—যা হল, তা আমি অস্বীকার করতে পারি না—কিন্তু তার জন্যে আমার এখনকার এইসব কোনদিক থেকে থেমে যাওয়ার না।

জুন মাস ভর্তি বৃষ্টি। রেবা রেবার বর ক'দিনের জন্যে এসে একদম পাগল হয়ে যাওয়ার যোগাড়। বড়দা কাকদ্বীপে বদলি হয়ে এসেছে। বাসে ঘণ্টা তিনেকের পথ। রেবা বীথি সবাইকে যেতে বলে বড়দা—কিন্তু যাওয়া হচ্ছে না।

বীথির বিয়ের দুলজোড়া ভারী। কানে ব্যথা হয়ে যায় প্রায়ই। রেবা বলল, 'ন'দা তুমি চল্লিশটা টাকা দাও আর বৌদির একটা আংটি আছে—পাঁচ আনা সাড়ে পাঁচ আনার মধ্যে একজোড়া রিঙ হয়ে যাবে।'

ছেলেদের জিনিসপত্তরের দাম কত কম। চল্লিশটা টাকা দিল ঠিক, কিন্তু মন খারাপ হয়ে গেল।

মাইনে পাওয়ার পর দিন তিনেকের জন্যে বীথিকে শিবপুরে রেখে এসেছিল। বীথিকে আনতে গিয়ে দেখল কেয়াও এসেছে। ভারী মাস। কিছুদিন থাকবে। নীতিশ ছিল। তিনজনে একসঙ্গে ফিরল।

চিৎপুরের মধ্যে দিয়ে পুরনো ট্রাম দুল্‌কি চালে যাচ্ছিল। কাঠের সিটে দুজনেই ঠুক্‌ঠাক্‌ ধাক্কা খাচ্ছিল এদিক ওদিক। বীথিও লেডিজ সিটে বসে দুলছে। কথা হচ্ছিল বাচ্চা আসে কি করে। কেয়ার এবার দ্বিতীয়বার।

পাশাপাশি থাকার সহজ নিয়মেই ছেলে মেয়ে আসে। কথায় কথায় নীতিশ বলল, 'এ ব্যাপারে জান, কোনদিকে যদি কিছু না মিটে থাকে তাহলে অশান্তি আসবেই।' কথাটা পুরনো। আইন আদালতের পাতায়—গল্প উপন্যাসে এই নিয়ে জটপাকানো কত কাহিনী থাকে। প্রমথ জানে।

মাঝে মাঝে ভেবেও দেখেছে, এসব পাতানো সম্পর্ক কোথায় কয়েক সেকেন্ডের অতৃপ্তিতে আস্তে আস্তে আলগা হয়ে যায়। পুরনো পালঙ্কের জোড় যেমন খুলে ফেলে ফিরে লাগাতে গেলে অনেক সময় আর লাগে না—একদিন যে কোন সময় পালঙ্ক ভেঙে পড়তে পারে—তেমনি। অথচ কত ভাল ভাল মন্ত্র পড়ে আমরা একত্র হই।

বিয়ের আগে ত রীতিমত ভয় ছিল—সময় হওয়ার আগেই যদি শেষ হয়ে যাই। তাহলে? মা বাবার এসব সম্পর্ক পুরনো হতে হতে এখন অন্য আবহাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে। সত্যি যদি হাঁপিয়ে পড়ে তাহলে কি এসব পাতানো জোড় খুলে যাবে না। তৃপ্তি, সুখ এসব বোধহয় শরীরের মাংসের সরু সরু ডগায় ক্ষিধে মেটার এক একটা ঘটনার ওপর নির্ভর করে ধক্‌ধক্‌ করে জ্বলতে থাকে। একদিন কোষ্ঠ পরিষ্কার না হলে দার্শনিকের সারাদিনের দর্শনই কেমন পাল্টে যায়। আসলে আমি বা বীথি কোথাও যদি নিজেদের কাছে দম ফুরিয়ে থেমে পড়ি--তাহলে আমাদের ভেতরের জ্বলন্ত আনন্দ সপ্‌ সপ্‌ করে চারদিক চেটে বেড়াবে—যেখানে মেটার মত কিছু পাবে সেখানে মিটে গেলে স্থির তক্ষকের মত অনেকক্ষণ ধরে ঝিমোবে। মানে আর কি—আমি বা বীথি কারও কাছে কেউ বোধহয় তখন হেরে যাব!

তখন ধুতি পাঞ্জাবীর ভেতরে উলঙ্গ আমি গলা অব্দি ঠাসা একটা লিকলিকে প্রবৃত্তি হয়ে দুলতে থাকব। তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। বহুবার এসব মনে হয়েছে প্রমথর। কথাগুলো কি সত্যি—কি দয়ামায়া শূন্য! তাই এখনও মাঝে মাঝে প্রমথর খুব সন্দেহ হয়, ভয়ও হয়—আমি সময় হওয়ার আগেই শেষ হয়ে যাই না ত? বীথির কি ভরে ওঠে। বাবাদের সময়ে এসব কি কেউ ভাবত।

নীতিশ অফিসের কাছে নেমে গেল।

আজকাল অনেকক্ষণ কোথাও থাকার পরে মনে হয় বাড়িতে বীথি আছে। অবিশ্যি বীথির সঙ্গে এই ত এতক্ষণে ট্রামে করে এলাম! চারদিক্‌কার জিনিস-পত্র ছোট হতে হতে এখন একখানা বিছানা. তিনটে সুটকেশ আর—রাত্তিরে কয়েকঘণ্টার বন্ধ ঘরে গল্প করে ঘুমিয়ে সময় শেষ হয়ে যায়।

সবার ভাত দিয়েছে। মা বীথিকে ডাকল। রেবা এসে বলল, 'বৌদি খাবে না। মাথা ধরেছে।' প্রায়ই ধরে। মা ডাকাডাকি করতে বীথি এসে দাঁড়াল। রেবা বলল. 'ন'দা তুমি ডাক্তার দেখাও না কেন? বৌদির রোজ মাথা ধরে। নিশ্চয় দাঁত থেকে—বৌদি বলছিল—'

বীথি বলবে কি। প্রমথ জানে। বীথির কানের পাশে হাত দিয়ে দেখেছে। একটা শিরার মধ্যে সব সময় দপ্‌দপ্‌ করছে। টিপে ধরলে আরাম হয়।

মা বলল, 'আমার দাঁত যেখান থেকে হল—সেখানে দেখা না।'

প্রমথ কোন কথা বলল না। পরদিন রেবাকে দিয়ে ডেণ্টিস্টের কাছে বীথিকে পাঠাল। কোন চিন্তা নেই—আটটা ক্যালসিয়াম ইঞ্জেকসন. স্ক্রেপ

করতে হবে জায়গায় জায়গায় আর দুটো দাঁতে সিল করতে হবে—তাহলেই সব সেরে যাবে।

ইঞ্জেকসন আরম্ভ হতে ক'দিন বীথির আর মাথা ধরছে না।

অফিসে নীতিশ বলল, 'চল না একদিনের জন্যে ত্রিবেণী থেকে ঘুরে আসি।'

'বেশ ত। কিছু খাবার সঙ্গে নিয়ে যাব।'

'উঁহু। তা কেন। বৌ রয়েছে কি করতে—'

'হ্যাঁ। সেই ভাল।' বলে প্রমথর একটু পরে সন্দেহ হল। নীতিশের কথায় ত দিব্যি হ্যাঁ হ্যাঁ করে যাচ্ছে--কিন্তু সত্যিই কি একদিনের জন্যে বীথিকে নিয়ে বাইরে যাবে প্রমথ। এখন অফিস, বাড়ি—বন্ধুদের আড্ডা সব কিছু তালগোল পাকিয়ে একাকার হয়ে গেছে। মুখে মুখে আউটিংয়ের আলোচনা হয় ঠিকই—কিন্তু যাওয়ার বেলায় কোনদিক থেকে পয়সা হয় না। ভালবাসা-বাসি করে বিয়ের পর অন্তত কিছুদিন লোকে অন্যদিকে তাকাবার পথ পায় না। কিন্তু প্রমথ যেন ভাত খাওয়ার পর ধীরে সুস্থে পানটি হাতে নেওয়ার মত নিশ্চিন্তে বীথির সঙ্গে মেশে। তাহলে কি বীথির জন্যে আকুপাকু ভাব নেই বলে কোথাও কিছু ভাটা পড়েছে! ছোটবেলায় পাশের বাড়ির ধীরেন অডিটারকে কতদিন দেখেছে—বৌ-র সঙ্গে জড়াজড়ি করে শুয়ে আছে, রুদ্দুর কিন্তু উঠে গেছে অনেকক্ষণ—জানলাও খোলা। তখন শুনত তাদেরও নাকি লাভ-ম্যারেজ।

ত্রিবেণী যাওয়ার কথায় প্রমথর বিশেষ গা নেই দেখে নীতিশ আর এগোল না। সত্যি একদিনের জন্যেও কলকাতার বাইরে যাওয়া নিয়ে কথা বলা মানচিত্রের সমুদ্রের মত। একেবারে নীল।

সবশুদ্ধ গোটা আটেক কম্পিউটর মেসিন অফিসে। এয়ারকুলারের লাগোয়া পার্টিশনে প্রমথরা বসে। বুধবার গোটা তিনেকের সময় বেয়ারা এসে বলল, 'এক দিদিমণি আপনাকে ডাকছেন।'

কে রে বাবা! পুরুষলোকের অফিস। একজন মেয়ে এলে সবাই তাকিয়ে থাকে। তারপর প্রমথ এখানে নতুন আর কে কি রকম লোক তা জানারও উপায় নেই।

লিফ্‌টের কাছে সুধা দাঁড়িয়ে আছে। প্রমথ এক সেকেণ্ডের মধ্যে শক্ত হয়ে গেল।

সুধা হাসতে প্রমথ বলল, 'কি ব্যাপার—'

সুধা প্রমথর মুখের চেহারা লক্ষ্য করে সাবধানে বলল, 'একদম যাও না যে—'

প্রমথ কোনরকম ভূমিকা না করেই বলে দিল, 'আমি বিয়ে করেছি সুধা। তোমাকে বলব ঠিক করেছিলাম। —এসে ভালই করেছ।'

সুধা প্রথমে সবটা শুনতে পায়নি। অন্ধকার মত জায়গাটা। সিঁড়ি ভেঙে ওপরে এসে দাঁড়িয়েছে মাত্র। হাঁপ ধরে গেছে। বেয়ারাদের জন্যে লম্বা বেঞ্চ —তাতেই হাত রেখে বসে পড়ল। শাড়ির আঁচল দিয়ে গলা মুছে মুখ তুলে বলল, 'কার বিয়ে—,' তারপর একটু হেসে বলল, 'কিছুই শুনতে পাইনি।' প্রমথর মুখে জ্বর হবে মনে হল। এরকম ভাবে দাঁড়িয়ে এসব কথা বলা যায় নাকি। তবু আবার বলল।

সুধা শুনে খানিকক্ষণ বসে থাকল। তারপর উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'সত্যি বলছ?'

'হ্যাঁ। এর মধ্যে মিথ্যে কিছু নেই। আসল কথা আমি কোনদিন বিয়ে করতে পারতাম না তোমাকে—'

এর মধ্যেও সুধার একবার মনে হল আজ যদি না আসতাম তাহলে হয়ত না জেনে থাকতে পারতাম। প্রমথ কি অদ্ভুত কথা বলত—'আমার এসব অভ্যেস।' বোধহয় প্রমথ বানিয়ে বলছে। তবু রাগে রাগে বলল, 'কতদূর পড়াশুনো করেছে?'

এতসব শুনে কেউ কি শেষে এমন একটা প্রশ্ন করতে পারে—

'স্কুল ফাইনাল পাশ।'

'দেখতে কেমন?' বলেও সুধার বিশ্বাস হল না। এসব কখনও ঘটতে পারে নাকি। ঘটলেও এসব জেনেই বা কি লাভ—একথা মনে হতে সুধা দমে গেল।

'যাও না বাড়িতে আছে। দেখে এস।' অফিসের লোকজন কেউ কেউ তাকাচ্ছে।

আর দাঁড়ান যায় না। প্রমথ বলল, 'দেখে এস—আমি চলি। হাতে কাজ আছে।'

সুধা প্রায় টেনে থামাল।

'শোন। ছোটমত মেয়ে বিয়ে করেছ—স্কুল ফাইনাল পাশ। এবারে নিজের ইচ্ছেমত মিথ্যে কথা বলতে পারবে! ধরতেও পারবে না—' একথাগুলো

বলেও সুখ হল না। কাঁচের দেওয়াল দিয়ে হঠাৎ অনেকখানি আলো এল। তবে মরা আলো। বাইরে আকাশে এতক্ষণ মেঘ ছিল। বোধহয় সরে যাচ্ছে। এখন এই সিঁড়ি ভেঙে নামতে ইচ্ছে করল না সুধার। একবারে নীচে পেঁছে যাওয়া যেত—একদম ট্রামের জানলার ধারের একটা সিটে, পাশে ময়দান—যেদিকে এখন রোদ নেই।

সুধা নেমে গেল। প্রমথ মিনিট দুই দাঁড়িয়ে থাকল। সুধাকে থামিয়ে দুটো নরম কথা বলা উচিত ছিল। কিন্তু তাতে হয়ত হিতে বিপরীত হত। আর বিশেষ করে এই অফিসের মধ্যে।

বিকেলের দিকে কাজ করতে করতে হঠাৎ মনে হল সুধা বাড়ি অব্দি যাবে না ত। কিন্তু খানিক পরে সব ভুলে গেল।

সন্ধ্যের সময় বাড়ি ঢুকে দেখল মা সামনের ঘরে বসে বই পড়ছে। একবার মুখ তুলে আবার বই পড়তে থাকল। অন্যদিন বীথি ঘরে থাকে। কাপড় ছেড়ে সব ঘর ঘুরে বারান্দায় এসে দেখল বীথি রাস্তার ট্রাম বাসের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

'দুবার যে ডাকলাম। শুনতে পাওনি?'

'পেয়েছি।'

এ কিরকম ভাবে কথা বলছে। প্রমথ বলল, 'শুনে চুপ করে ছিলে—'

বীথি কোন উত্তর না দিয়ে তোয়ালে সোপকেস দিয়ে গেল। এখন প্রমথর কথার উত্তর এড়ানোর জন্যে যে ঘরে কেউ না কেউ আছে সেই ঘরে গিয়ে বীথি দাঁড়িয়ে থাকবে। সেখানে প্রমথ কিছু বলতে পারবে না।

গরম শেষ হতে চলল অথচ মেঝে তেতে আছে। সারাদিন এদিকটায় বেশী রোদ আসে। প্রমথ সন্ধ্যে সন্ধ্যে খেয়ে শুয়ে পড়ল। বইর পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে ঘুমিয়েও পড়ল।

অনেক রাতে পাশ ফিরতে গিয়ে বীথির গায়ে হাত লাগল। বিড়ির দোকানের আলো নেভেনি। বীথি প্রমথর দিকে পেছন ফিরে শুয়ে। প্রমথ আস্তে হাত রাখল। বীথি সরে গেল।

জেগে আছে। ট্রামের কোন শব্দ নেই। বারোটা বেজে গেছে নিশ্চয়। আজ বীথির এরকম এড়িয়ে এড়িয়ে চলা প্রমথর কাছে ধাঁধার মত লাগছে।

একটু পরে বীথির গায়ে হাত রেখে খুব আস্তে বলল, 'সুধা বলে কেউ এসেছিল?' প্রমথ নিজের গলার স্বরই নিজে শুনতে পেল। পরিষ্কার ড্রেণে আধুলি পড়ে গেলে কোথায় আছে দেখা গেলেও তোলা যায় না—কেমন দুলতে দুলতে তলিয়ে যায়—প্রমথও তেমনি তার ঠাণ্ডা কথাগুলো আর ফেরৎ নিতে পারবে না।

বীথি কোন উত্তর দিল না। প্রমথ তাকে আস্তে নিজের দিকে ঘুরিয়ে নিল। অন্ধকারে মুখের ওপর হাত বোলাতে বোলাতে আঙুল চোখের নীচে গিয়ে পেঁছল। বীথি কাঁদছে।

প্রমথ বীথিকে ছেড়ে দিয়ে সরে গিয়ে শুয়ে থাকল। এমন চিৎ হয়ে মাঠে শুয়ে শুয়ে আকাশ দেখতে ভাল লাগতে পারে। কিন্তু মশারির ছাদ—তাও অন্ধকার!

'আমার সঙ্গে কলেজে থাকতেই আলাপ ছিল।'

বীথি একদম অন্যকথা বলল, 'চাকরী হলেই বিয়ে করবে—তাই না কি বলেছিলে—'

হ্যাঁ তা বলেছিলাম। এখন সত্যি কথা বললে কষ্ট পাবে বীথি। আর—আমি ত সুধা যাতে না ভেঙে যায় সেইজন্যে ওসব বলতাম. এখন খুলে বললেও বীথি কি বিশ্বাস করবে। তাছাড়া আমারও নিশ্চয় কোন নরম জায়গা ছিল। তখন সৎ হচ্ছিলাম।

মুখে বলল. 'কক্ষণো না।'

'তুমি নাকি পষ্টাপষ্টি সব বলতে চেয়েছিলে ওর বাবাকে—' বীথির কথাগুলো বনের মধ্যে ছেড়ে দেওয়া পরিষ্কার শব্দের মত প্রমথর ওপর দিয়ে চলে গেল। সুধাকে কিছুতেই খারাপ মনে করতে পারি না। সুধার কিছু ভাল হলে আমার ভাল লাগে। তাই এখন বীথির কাছে সুধার নামে বানিয়ে খারাপ কিছু বলতে পারল না।

প্রমথ হঠাৎ বলল 'অরবিন্দ চৌধুরী তোমাদের বাড়িতে আসত না—'

বীথি হেসে ফেলল। 'আসত বৈকি! কি হয়েছে তাতে?'

'গান শিখতে তার কাছে—কেয়া বলেছিল—'

কেয়া কি বলেছে বীথি জানে না। বীথি সাবধান হওয়ার চেষ্টা করল। 'ঠিক গান শিখতাম না—মা ওরা গান শুনতে চাইত তাই গাইত। আমি হারমোনিয়ম বাজাতে পারতাম না—তাই হারমোনিয়মে গান মিলিয়ে দিত।'

'রোজ আসত?'

'তা কেন! একদিন বৃষ্টির দিন আমাকে পেঁছে দিতে এসে আলাপ—' তারপর হঠাৎ বীথি বলে দিল. 'দুর্বলতা নিশ্চয় ছিল—কিন্তু বুঝতে দিত না।'

'কি রকম?'

বীথি একবার কি ভাবল। অনেকদিন আগে গান শেখাতে আসত। বিয়ের সময় বাবলুকে দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল—কিন্তু আসেনি অরবিন্দ।

'এই যেমন—হাতের ওপর হাত রাখতে চাইত—বুঝে আমি সরে যেতাম—'

প্রমথ যেন সব জানে এমনিভাবে বলল. 'চুমু খায়নি কোনদিন?'

'নাঃ!' এ কোন্ দিকে কথা যাচ্ছে—

'একদম না—'

বীথি মনে মনে পুরনো ঘটনার ওপর আঙুল বুলিয়ে নিল, 'চেষ্টা করত—তবে—'

'তবে কি?'

'হুঁ। গালে মুখ রাখবার চেষ্টা করেছে—'

প্রমথর শুনে একটুও খারাপ লাগল না। সুধা, অঞ্জু, ইন্দিরা, কনসিডারেট—আর সব এখন মনেও নেই। এদের সঙ্গে ত অনেক কিছু হত। ক্লান্তি, কিচ্ছু হয় না—এর মধ্যে একটা আধটা চুমু খেয়ে খানিকক্ষণ মনে হত—কিছু একটা করা গেল।

'ঠোঁটে?'

'না। আমাদের বাড়িতে আসত। হেরিকেন নেভানো থাকত। দাদাও রোজ সুস্থ থাকত না—' বীথি এই অব্দি এসে চেষ্টা করেও থামতে পারল না।

'আমাদের ভয় হত—যদি কিছু একটা হয়ে যায়।' বীথি গানের মত লম্বা করে কথাগুলো বলল। 'দাদাকে বলেছিল, আপনি এসব ছেড়ে দিন।'

প্রমথ চুপ করে গেল। অরবিন্দ চৌধুরীকে কোনদিন দেখেনি প্রমথ। সুধা আজ বীথিকে দেখেছে। সুধার জন্যে আমি ভাবি। ভাবি মানে—সুধার যেন ভাল হয় এইসব আমি আশা করি। অরবিন্দও হয়ত বীথির ভাল চাইত।

'তোমাকে হয়ত ভালবাসত!'

'হয়ত—' তারপর বীথি বলল, 'দাদা একদিন নেশার ঝোঁকে ডেকে নিয়ে বলেছিল—তুমি বিয়ে করতে পার।'

'তারপর।'

'আর আসেনি।'

প্রমথ চুপ করে গেল। সেদিন শঙ্করের সঙ্গে পথে বেরিয়ে সোলজারের মুখে গম্ভীর শিস্ বাঁশীর মত লাগছিল। এখন অন্ধকার কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে। অথচ তার ভেতরে কোন শিস্ নেই।

'তোমার কষ্ট হত।'

'হুঁ।' অন্ধকারেও বোঝা গেল বীথি মাথা নাড়ল। মনে মনে প্রমথ হিসেব করল। হ্যাঁ, সেই সময়েই প্রমথ প্রথম শিবপুরে যায়।

'কেমন দেখতে ছিল?'

'মোটামুটি। তবে স্বাস্থ্য ভাল।'

'লম্বা?'

'না।'

'আমার মত?'

বীথি হেসে ফেলল, 'তোমার চেয়ে বেটে।'

প্রমথ আস্তে জড়িয়ে ধরল। নাকে নাক লেগে যাচ্ছে। 'এখন অরবিন্দর জন্যে কষ্ট হয়?'

'তা কেন!' শেষে অনেকক্ষণ পরে বীথি বলল, 'এ ব্যাপারে মেয়েরা বড় স্বার্থপর। সব ভুলে যায় যে—'

তাই হবে বোধহয়। অনেকক্ষণ পরে বীথি বুকের মধ্যে কথা বলে উঠল। গলাটা এবারে অনেক হাল্কা। 'বলেছিল—প্রমথদা আমার সঙ্গে শেষ অব্দি এগোয়নি। ওটুকুতে আমি বাধা দিয়েছি—'

প্রমথ বুঝল, সুধার এ এক শেষ গর্ব। চালও হতে পারে। মানে তুমি একথা শুনে মনে মনে কাঁটা হয়ে থাক। যদি তাই হয়ে থাকে—যদি হয়ে থাকে—

একবার ভাবল বলে দেয়—হ্যাঁ, যতদূর এগোন যায় প্রমথ তার কিছু বাকি রাখেনি। পরমেশ ছিল না। বৌদি চা কিনতে গেল।—কিন্তু এসব প্রমথর গায়ে লাগেনি। একবার সত্যি হয়েছিল। এখন তা আর এমন কিছু ভারি না যা বীথিকে বলা যায়। প্রমথর কাছে সে সবের আর দামই নেই।

পরদিন ঘুম থেকে উঠতেই দেরী হয়ে গেল। মাথা ব্যথা। এ্যানাসিন খেয়ে শুয়ে থাকতে থাকতে কখন আবার ঘুমিয়ে পড়ল প্রমথ। বেশ বেলাতে বীথি চা হাতে ঘুম ভাঙালো। পল্টু বাবা অফিসে। বিজু কলেজে। রেবা বাচ্চাদের বাড়ি বেড়াতে গেছে। মা'র আবার গলস্টোনের ব্যথা বেড়েছে। সেও সকাল থেকে খাটে শুয়ে আছে।

চা খেয়ে চান করে ভাত খেয়ে দেখল বাইরে পাতলা রোদ। দুজনে ঘুরতে বেরোল। ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালে এখন কেউ নেই। সিমেণ্টের পুকুরে শ্যাওলার সবুজ ক্ষীর। বা পাশে রেসকোর্স রোদে পুড়ে যাচ্ছে। একটা ছায়াও নেই।

বেরিয়ে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হাত তুলে ট্যাক্সি থামাল। বীথি ভেতরে বসে কোথায় যাওয়া হবে বোঝার আগেই প্রমথ বলে দিল—'শিবপুর—জলের ট্যাঙ্ক।'

আজ দুজনেরই কেমন হাল্কা লাগছে। ট্যাক্সির জানলায় বসে বুকের ওপর পড়ে থাকা বীথির বেণী একটা সুন্দর জিনিস বলে মনে হবেই। অরবিন্দ

সুধা এসব এখন অস্পষ্ট। দূরে ফোর্ট উইলিয়ামের পাশে ঐ যে সাদা সাদা খুঁটি ওখানে কি আছে—তা কি আমি জানি। জানতেও চাই না।

সারাটা দিন শিবপুরে ভালই কাটল। কেয়া বিকেলে চপ আনালো রেস্টুরেণ্ট থেকে।

শনিবার অফিসে অবিনাশদার ঘরে কেউ ছিল না। চা বিস্কুট, শেষে ঘণ্টাখানেক বাদে পুডিংও খাওয়ালো অবিনাশদা। অনেক পরে বলল, 'সেই মেয়েটি বুঝি তোমাদের বাড়ি গিয়েছিল—' বেশ হাসতে হাসতেই বলে ফেলেছে অবিনাশদা।

কোন্ মেয়েটি। ও সুধা। খচ্ করে প্রমথর মধ্যে লেগে গেল। হাতে বাঁশের চোঁচ ফুটে গেলে যেমন লাগে—তেমনি। প্রমথ কিছু বুঝতে না পেরে বলল। 'হ্যাঁ।'

'স্বামীর বান্ধবী দেখলে মেয়েদের টান বাড়ে!' অবিনাশদা লাল পেন্সিলটা দিয়ে কাগজে দাগ দিচ্ছিল। প্রমথ কোন কথা বলল না। এমন সময় নীতিশ ঢুকল। উঠবার সময় প্রমথ নীতিশকে বলল, 'ফেরার পথে আমার ওখানে একবার যেও।'

নিজের চেয়ারে বসে প্রমথ গুম হয়ে থাকল। রায় দু'চারবার এ কথা সে কথা পেড়ে দেখল দত্ত আজ কথা বলবে না।

অবিনাশদা কি করে জানল প্রমথ তা বুঝতে পেরেছে। খুব সোজা। বৃহস্পতিবার শিবপুরে গিয়েছিল। কেয়াকে সুধার কথা বীথি নিশ্চয় বলেছে। আশ্চর্য কি করে বলে। একবার ভাবলও না প্রমথ তাতে কতখানি ছোট হয়ে যাবে। অথচ সেদিন রাতে কি ঘন হয়ে দুজনে সব ভুলে গেল। তখন রাত্তির কেমন গম্ভীর ছিল। কেয়াকে দেখতে নীতিশ গেছে। নীতিশকে কেয়া বলেছে। অদ্ভুত, কি করে বীথি বলতে পারল। আমি ত ভাবতেই পারি না

বিকেলের দিকে নীতিশ এল।

প্রমথ বলল, 'শিবপুরে গিয়েছিলে?'

'হুঁ। তুমিও ত গিয়েছিলে।'

'সেইজন্যেই ত বলছি।'

'মানে?'

'বাইরে চল।'

নীতিশ আর প্রমথ বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পাশের অফিস বাড়ির বাথরুমে একটা লোক দাঁড়িয়ে পেচ্ছাব করছে। তার বুক অব্দি দেখা যাচ্ছে।

'তোমার কোন কথা আমি জানলেও বাইরে বলি না—'

'কি বলবে তাই বল না।'

'তুমি সুধা নামের কোন মেয়ের কথা শিবপুরে শুনেছ?'

নীতিশ এক সেকেন্ড থামল। 'হ্যাঁ।'

'তার কথা অবিনাশদাকে বলেছ?'

এবারে নীতিশ অনেকক্ষণ চুপ করে থাকল। তারপর হাসতে হাসতেই বলল, 'হুঁ, বলেছি।—কিছু ভাবিনি—তোমার বৌ শিবপুরে বলেছে, তাই—'

'বীথি যাই বলুক—তোমার এমন কিছু বাইরে বলা ঠিক না—যাতে আমার বা তোমার নিজের নিজের ব্যাপার অফিসেও আলোচনা হয়।'

প্রমথর মুখ দেখল নীতিশ। সে এতটা ভাবেনি। আস্তে বলল, 'তা ত ঠিক।'

প্রমথ সিগারেট এগিয়ে দিয়ে বলল, 'দেশলাই দাও—না তাও নেই—!'

অনেক রাতে বিছানায় প্রমথ বীথিকে সব বলল। বলতে গিয়ে প্রমথ কেঁদে ফেলল। 'আমি ভালো লোক না ঠিকই। কিন্তু আমি যা সব ভাবি তা শেষ অব্দি সেরকম হয় না।'

বীথি বলল, 'মেজদিকে বলেছিলাম—নিজের দিদিকে বলব না?' তারপর প্রমথকে একদম চুপ দেখে—প্রমথর মুখের ওপর জলে হাত লাগতে বলল, 'আমি ত এতসব বুঝিনি—'

প্রমথ বোঝাতে গেল না। অল্প বয়েসে গল্পের মেয়েলোক আকাশ চিরে স্বর্গ দেখার মত সত্যি ছিল। পরে এখন থেকে অনেকদিন আগে বিবাহিত বন্ধুদের বৌ নিয়ে পথে বেড়াতে দেখলে মনে হত—কি বোকা! এই সময়টাও নষ্ট করছে কেন! এখন ঘরে বা নির্জনে কাছাকাছি বসে থাকলেই পারে। আমার বিয়েটা কেন যে এমন হঠাৎ হয়ে গেল। বীথি পেছন দিক দিয়ে জড়িয়ে ধরল প্রমথকে, 'এই শোন, এদিকে ফের—'

॥ ঊনত্রিশ ॥

বীথির দাঁতের ব্যথা বন্ধ হয়নি। বরং বেড়েছে। ডাক্তারখানায় গেল। ছেচল্লিশ টাকা মত খরচ হল অথচ কিছুই হল না। এই মেয়েটির সঙ্গে আমার আর যোগ কোথায়। গ্রাম সম্পর্কের পিসীমাকে যেমন ডাক্তারখানায় নিয়ে যায় লোকে তেমনি একটা কর্তব্য রাখার মত বীথিকে নিয়ে গেল প্রমথ। ডাক্তার আলাং তালাং বলে শুধু।

পরদিন ছুটি নিয়ে হাসপাতালে নিয়ে গেল বীথিকে। সেখানে ডাক্তার দেখেই বলল, 'এ ত ভুল হয়েছে। ব্যথার ওপর সিল করেছে—তাতে ব্যথা বাড়বেই। দুটো দাঁতই তুলতে হবে।'

প্রমথর সামনেই ইঞ্জেকশন দিল। উঁচু চেয়ারে বীথিকে একরকম জোর করে বসিয়ে দিতে প্রমথর বীথির জন্য কষ্ট হল। একা একটা ঘরে বীথি বসে। ছোটবেলায় বাবা মারা গেছে। শিবপুরের বাড়ি প্রমথর জানা। এখন তার ওপরেই বীথির সব কিছু। আর আমি এ'কদিন কেমন 'অন্য' লোকের মত বীথির সঙ্গে মিশেছি। না হয় বলেই ফেলেছে সুধার কথা। মেজদিকে কেয়াকে কিছু খারাপ ভেবে বলেনি।

প্রথম দাঁতটা টানতে উঠে এল। কিন্তু দ্বিতীয় দাঁতটা ওঠাবার সময় খানিকটা ভেঙে মাড়িতে থেকে গেল। বীথি বুঝি একবার চেঁচাবার চেষ্টা করল। নার্স একদলা গজ মুখে গুঁজে দিয়ে বের করে আনল। রক্তে ভিজে গেছে। তারপর খাট থেকে কিংবা জুতোর গোড়ালি থেকে পেরেক তোলার মত দাঁতের বাকিটা ডাক্তার ড্রিল করে তুলে ফেলল।

'এখন নিয়ে যাবেন না। খানিকটা বসুন।' বলে প্রেসক্রিপশন লিখে দিয়ে ডাক্তার বলল. 'ব্লিডিং হয়েছে—দুধ খাওয়াবেন। আর এই ষোলটা ইরগাপাইরিন ট্যাবলেট। আটদিন পরে ট্রাবেল দিলে জানাবেন। ঝাল বন্ধ।'

ট্যাক্সিতে বীথির মাথায় আস্তে হাত বুলিয়ে দিল প্রমথ। বীথি গালে হাত চেপে রাস্তার দিকে তাকিয়ে আছে। এদিক্‌কার পথের দোকান পাটের চেহারা এমন ন্যাড়া ন্যাড়া।

দিন দুই মাকে দু-চারবার দুধের কথা বলেছে প্রমথ। বীথির দুধ দরকার।

মা সেদিন পরিবেশন না করে জলচৌকিতে বসে বড়বৌদিকে বলছিল—কাকে কোন্ মাছটা দিতে হবে। পল্টুর জন্য কই। এইসব আর কি।

প্রমথ দুধ খেল না। মা বলল, 'বীথির জন্যে আছে।'

'বেশী করে দাও না ওকে।'

মা টং করে রেগে গেল। 'আমি যে এতদিন অসুখে পড়ে আছি—আমি কতটুকু দুধ খাই।'

প্রমথ বোঝাবে কি করে। বীথির দুল কেনার পর বড়দা বলেছিল, 'মা'র জন্যে আমরা কোন গয়না করতে পারিনি।' প্রমথ জানে মেজদা বড়দার পড়াশুনো পরীক্ষার ফি-র জন্যে মা'র সব গয়না বাঁধা দিতে হয়। শেষে একরকম ছাড়ানোই হয়নি। সুদ এত বেশী। প্রমথর ইচ্ছে আছে হাতে টাকা হলেই মা'র অপারেশন আর হাতে চুড়ির ব্যবস্থা করবে। ব্রোঞ্জের চুড়িতে হাত চুলকে চুলকে দুখানা হাতই নীল হয়ে গেছে।

কোন কথা না বলে প্রমথ উঠে গেল। অফিসে না গিয়ে ম্যাগাজিনের পাতা ওল্টাচ্ছিল! মা একা একাই ঘরে শুয়ে শুয়ে কি বলছিল। প্রমথর কানে গেল। অসহ্য। রাত্তিরে মশারিতে আলো জেবলে মশা মারতে হয়। সামনের ড্রেণগুলোয় দারুণ মশা হয়েছে। গরম। নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। দাঁত তোলার পর বীথির মাথা ধরা সারলেও অন্য উপসর্গ দেখা দিয়েছে। পেটের বাঁ দিক কামড়ায়, দুদিন শোবার পর প্রমথকে উঠে গিয়ে ডাব নিয়ে আসতে হয়েছে। বৌ-র দিকে প্রমথর টানের কথাই মা বলছিল।

প্রমথ থাকতে না পেরে উঠে গিয়ে বলল, 'তোমার জন্যেই মেজদা মেজবৌদি চলে গেল।'

মা যেন এ কথাটাই শুনতে চাইছিল। উঠে বসল। 'তোর ত কত প্রেম দেখলাম। এই ত সেদিন সুধা এসে কত কথা বলে গেল। আমি শেষে মাঠে নিয়ে গিয়ে কান্না থামাই—'

প্রমথ বলল 'থামবে।' আমি আগে কি করেছি তা টেনে আন কেন? কেন টেনে আন এসব। আমাকে নতুন করে সব সুরু করতে দাও। বীথি কেমন কাঠের লম্বা পিলসুজ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁতের ফাঁকে এখনও একটু একটু রক্ত পড়ে। ব্রাসে দাঁত মাজা বারণ।

মা আরও কি বলছিল। প্রমথ উঠে গিয়ে দেওয়ালে টানানো মা'র বাবা মা'র ছবি পেড়ে আছড়ে ভেঙে ফেলল। সরু তামার তারের মত আস্ত রাগ প্রমথর কান দিয়ে মাথায় ঢুকে গেল। 'আমি আর এখানে থাকব না।'

মা ভাঙা ফটো দুখানা হাতে নিয়ে নিঃশব্দে কাঁদতে আরম্ভ করে দিয়েছে।

মেজদার সঙ্গে ঝগড়া হলেই মা এমন করত। তখন মেজদার ওপরেই রাগ হত। এখন পল্টু বাসায় থাকলে প্রমথর ওপরেই হয়ত রাগ করত।

বেরিয়ে গিয়ে বেহালায় অচিন্ত্যদের পাড়ায় একটা ঘর ঠিক করে এল প্রমথ। দশ টাকা এ্যাডভান্সও দিয়ে এল। ফিরে দেখে পল্টু গম্ভীর হয়ে শুয়ে প্রমথর ফেলে যাওয়া ম্যাগাজিনটা দেখছে।

কারও সঙ্গে কথা না বলে বীথিকে রেডি হওয়ার জন্যে এক তাড়া দিল। জিনিসপত্র বেঁধে নিল। ড্রয়ার ভর্তি কাগজপত্র, লেখা, ময়লা জামা কাপড় ট্রাঙ্কে ঠেসে ভরে দিল প্রমথ। নতুন ঘরে গিয়ে ফিরে সাজাতে হবে। সবকিছু গোছানো ছিল এখানে। এই এক পরিশ্রম। নীচে ট্যাক্সি দাঁড়ান ছিল। বীথিকে একটা বস্তার মত টেনে নিয়ে গিয়ে ট্যাক্সিতে বসাল। যাওয়ার সময় পল্টুকে বলল, 'যাচ্ছি রে!' পল্টু নিশ্চয় বাড়ি এসে সব শুনেছে। বাবা অফিস থেকে এসে সব শুনবে। বড়বৌদিও বাড়ি নেই।

পল্টু বলল, 'যাও।'

বাড়িওয়ালার দরোয়ান মত এক পরিবার থাকে টিনের ঘরে। শহরতলীর বাড়ি। বাগান আছে। প্রমথদের ঘর দরোয়ান আর তার বৌ-ই সাজিয়ে দিল। বাসনপত্তরও এগিয়ে দিল। চুলো ধরিয়ে দিয়ে গেল। প্রমথ কাছের বাজার থেকে ন' আনায় পাঁচটা রোগা রোগা কই মাছ নিয়ে এল। বীথি নড়ে চড়ে ভাত মাছের ঝোল নামিয়ে দিল। ফাঁকা ঘরে পিঁড়ি পেতে ভাতও দিল। লেবু এগিয়ে দিল খাওয়ার সময়। প্রমথ দুটো একটা হাল্কা কথা বলল। শেষে বলল, 'ব্রাকেটও আছে দেখছি। ফাইন। পেছনে একটা কাগজ লাগিয়ে দিও।'

পাড়ায় রেডিওতে আধুনিক গান হচ্ছে। দূরে বড় রাস্তায় বাস যাওয়া আসার শব্দ।

প্রমথ দরজা জানলা বন্ধ করে দিয়ে শুয়ে পড়ল। যা মশা। বীথি একটু পরে শুতে এসে আস্তে প্রমথর মাথায় হাত দিল। 'বাড়ির জন্যে খারাপ লাগছে না ত!'

এ একটা কথা হল। প্রমথ চুপ করে থেকে বীথিকে একটু পরে টেনে নিল।

'আলোটা নেভাই।'

'না থাক্‌। গরমে এত জামা কাপড় ভাল লাগে না।' বলে নিজের গায়েরটা মেঝেতে ফেলে দিয়ে বীথিরটা টানতেই বীথি সরে গেল। প্রমথর কিছু ভাল লাগছে না। এমন বন্ধ ঘরে মানুষ মানুষ খুন করে। বাইরে দরোয়ানদের বোধহয় এখনো খাওয়া হয়নি। বাবা এতক্ষণে বাড়ি এসেছে নিশ্চয়।

প্রমথর কথাই থাকল শেষ অব্দি। সব জামা কাপড় মেঝেতে। ছোটবেলায় পুকুরে ডুব সাঁতার দেওয়ার সময় একরকম পোকা দেখত। জলের মধ্যে একটা আরেকটার সঙ্গে খেলছে। সাঁ সাঁ করে একলাফে দূরে চলে যাচ্ছে। জলটা যেন ওপরে বাইরের বাতাস। অথচ প্রমথর তখন জলের নীচে নিঃশ্বাস আটকে যেত। পোকাগুলোর গায়ে কিছু নেই।

যদি কোথাও কিছু না মেটার থাকে সেখানে পালঙ্কের জোড় আলগা হয়ে যায়। গল্প উপন্যাসে এই নিয়ে জটপাকানো কত কাহিনী থাকে। বাইরের বাগানে বোধহয় কামিনী ফুলের ঝাড় আছে। কি তীব্র গন্ধ। অথচ ভাল ভাল মন্ত্র পড়ে আমরা একত্র হই। বাড়িওয়ালার খাটটায় মচ্ মচ্ শব্দ হচ্ছে। বাজে কাঠের তৈরী। তৃপ্তি, সুখ—এসব বোধহয় শরীরের মাংসের সরু সরু ডগায় ক্ষিধে মেটার এক একটা ঘটনার ওপর নির্ভর করে। প্রমথ থেমে পড়ল। খাট থেকে নামবার সময় বীথি চাদরটা টেনে নিল। প্রমথ আলো নিভিয়ে বারান্দায় এসে সিগারেট ধরাল। আমি কি আগে থেমে গেলাম।

রেডিওর সেই গলাটা আবার একটা আধুনিক গান ধরেছে। কটা বাজল।

একটু পরে বীথিও এসে দাঁড়াল। আশে পাশের বারান্দায় আলো জ্বলছে। এখনও বাড়িতে খাওয়া দাওয়া হয়নি। বিজু আজকাল দেরীতে ফেরে।

বিছানায় শুয়ে প্রমথ বলল, 'বাবাকে বলে আসা হয়নি—'

বীথি চুপ করে থাকল। খানিক পরে বলল, 'কাল অফিসের পর দেখা করে এস।'

প্রমথ বলল, 'একটা আলনা কিনতে হবে।'

'না। আগে একটা চৌকি কেন। এটাতে আমি শুতে পারব না।'

প্রমথ অন্য কথা ভাবছিল। হুট্ করে বলে দিল, 'একবার বলে আসা উচিত ছিল বাবাকে—'

বীথি বলল, 'মন কেমন করছে?' বাইরে উঠোনে বীথিদের রান্না করা কড়াইটা পড়ে আছে। দরোয়ানের বৌকে মাজতে বারণ করেছে প্রমথ। বীথিই কাল সকালে মেজে দেবে।

জলের ট্যাঙ্কটার নীচে বিকেলবেলা দরোয়ানের উল্টোনো ছাতিটা হাওয়ায় লাট খাচ্ছিল। এমন অদ্ভুত দেখাচ্ছিল জায়গাটা।

এখানে পল্টু নেই। আমার ভাল লাগে না।

'বীথি চল। বাড়ি গিয়ে মা ওদের ভাল করে বলে আসি।'

বীথি কোণে গোঁজ হয়ে পড়ে থাকল খানিকক্ষণ। 'আমি যেতে পারব না।'

প্রমথ অবাক হল। আসবার সময় বীথিকে টেনে এনেছিল—বস্তার মত। এখন বীথি উঠতে চাইছে না।

শুয়েই পড়েছিল। একটু পরে প্রমথ নিজে উঠে বের করা জিনিসপত্র আবার বাক্সে ভরে ফেলল। বীথি খাটের ওপর বসে সব দেখতে থাকল। প্রমথ বীথিকে বলল, 'রেডি হও। এখানে আমার ভাল লাগছে না।'

'লোক হাসালে শুধু শুধু!' কারও হাসি যে এত কটু হতে পারে প্রমথ তা জানত না। গম্ভীর হয়ে বলল, 'ঘর ছেড়ে যেও না। এখুনি ট্যাক্সি নিয়ে আসছি।'

খাওয়া দাওয়া সবার হয়নি। বাড়ি ঢুকতেই মা কেঁদে ফেলল। প্রমথ মুখে এত কষ্ট করে হাসি ফুটিয়ে তুলল। মা'র এই কান্না শুনে মনে হবে—বুকের মধ্যে সরু একটা পথ আছে—সেখান দিয়ে শুধু কান্না বেরোয়—বেরোবার সময় দুপাশে মাংসের দেওয়ালে এদিক ওদিক ধাক্কা খায়।

বড়বৌদি ভাত বেড়ে দিচ্ছিল বাবাকে—ভেতরের ঘরে। রান্নাঘরে যাওয়ার পথে বড়বৌদি বলল, 'পানুর কাণ্ড! মাঝখান থেকে বীথি একটুও বিশ্রাম পেল না সারাদিন।'

প্রমথ বলল, 'বৌদি. বাবা জানে?'

'তাড়াতাড়ি গুছিয়ে নে—নইলে ধরে ফেলবেন!'

॥ ত্রিশ ॥

মাঝখান থেকে প্রায় টাকা কুড়ি গচ্চা গেল। দশ টাকা এ্যাডভান্স—ট্যাক্সি ভাড়া আট টাকা বারো আনা মত—আর এক সন্ধ্যের পাঁচটা রোগা কই মাছ।

পরমেশ দেবুদার দোকানে কম আসে। একদিন পথে বলছিল, 'আর পড়ব না।' যেন, আর জলে নামব না। আর আগুনে হাত দেব না। ওদিকে বৌদিরও থিয়েটার চলছে।

অফিস-বাড়ি, অফিস-বাড়ি,--ক্লান্ত হয়ে গেছে প্রমথ। অফিসে সেই চেনা মুখগুলো—বাড়িতেও সেই একই রুটিন। শীত বলে বাড়িটা এখন আরামের। কিন্তু মাস কয় পরে শীত ফুরিয়ে এলে চারদিক আবার রী রী করে জ্বলবে। গরম, প্রমথর মাথার রাগ—সব, সব ক্লান্তিকর।

শনিবার দশটা নাগাদ বীথিকে নিয়ে কাকদ্বীপ চলল প্রমথ। বাস শেষ হতে ব্রীজ। ব্রীজ পার হয়ে মাটির রাস্তায় বড়দার সঙ্গে দেখা। বলল, 'নামখানা যাচ্ছি। সন্ধ্যের আগে ফিরে আসব।' বৌদি ছিল। ডিম সেদ্ধ ভাত হল। খাঁটি ঘি।

খাওয়া দাওয়ার পর বৌদি দরজা ভেজিয়ে দিয়ে গেল। 'তোরা শো—আমি মুর্গিকে ভাত দিয়ে আসি।'

একটানা বাস জার্নিতে প্রমথর পাছা ব্যথা হয়ে গেছে। বাড়ি অব্দি ধান-ক্ষেত চলে এসেছে। এখন অবিশ্যি ধান নেই—শুধু গোড়া পড়ে আছে। কাছেই ইরিগেশনের খাল—সেটা নিশ্চয় নদীতে গেছে (দূরে গাছের পেছনে ধোঁয়া ধোঁয়া আকাশ—অতএব আড়ালে নদী আছে)—পাড়ে নৌকো উল্টোনো।

বীথিও বসে বসে দেখছিল।

সাঁ সাঁ সাঁই সাঁই শব্দ করে হাওয়া যাচ্ছে। ভাল চোখ থাকলে হয়ত হাওয়াও দেখা যেত। কলকাতার এত কাছে এমন জায়গা আছে। এইসব জঙ্গল পার হয়ে তবে কলকাতা। সেখানে জানাশুনো লোকেরা সব থাকে।

বীথির সঙ্গে বড়দার বিছানায় প্রমথও শুয়ে পড়ল। বীথির কাঁধে হাত দিতে প্রমথ অনেকদিন যা বলতে পারেনি তাই বলে দিল। 'তোমার কাঁধের এখানে হাত এত সরু—'

'খারাপ লাগছে?'

তা লাগছে। কিন্তু বলতে পারল না। প্রমথ ব্যায়াম করত আগে। পনের পাউণ্ডের ডাম্বেল ভাজলে হাতের এ জায়গা পুরন্ত হয়ে যায়। কিন্তু বীথিকে তা বলে কি করে। বীথির পক্ষে তা সম্ভবও না। প্রমথ দেখল সে অন্যমনস্ক হয়ে বীথির সরু হাতে এতক্ষণ হাত বোলাচ্ছিল। অথচ কনুইর পরেই কিন্তু বেশ মোটা হয়ে গেছে। দুখানা হাতই। অঞ্জুর এ জায়গাটা বেশ মোচার মত ফুলন্ত লাগত।

বীথি বলল, 'ছোটবেলায় পালাজ্বরে এত ভুগেছি—,' প্রমথ বীথির কথা শুনতে শুনতে জানলা দিয়ে বাইরের ঝোপে তাকিয়ে ছিল। বীথির কথাগুলো জঙ্গলে চলে গেল। জঙ্গল না, বনই বলা যায়। চীনে কালির সরু পরিষ্কার রেখার মত লতাগুলো বেঁকে বেঁকে সুপুরি, বন কাঁকড়ের গাছে জড়িয়ে উপরের দিকে চলে গেছে। আর হাওয়া—কি শব্দ—ভাল চোখ থাকলে হয়ত দেখাও যেত।

'—পালাজ্বরে ভুগলেই হাত সরু হয়ে যায়।' বলে প্রমথর গায়ে হাত রাখল বীথি। 'জান, অসুখ এত বিচ্ছিরী।' প্রমথ কিছু যেন শুনতে পায়নি। মনে হল হু হু করে উঠে আসা একটা জলো কিছু বীথিকে এখুনি ঢেকে ফেলবে। ঘিরে ফেলবে। এখানে চারদিকে এত জল!

প্রায় লাফিয়ে বীথিকে দুহাতে ঢেকে ফেলল প্রমথ। বীথির গলায় জঙ্গলের শব্দ। না বনের। এখানে যেন বীথি অনেক আগে ছিল। পায়ে নুপুর থাকলে সুবিধে হত—বোঝা যেত, আসছে না যাচ্ছে।

সন্ধ্যেবেলা বড়দা এল। নীলকান্ত একটা বড় মুর্গী কাটল। এমন সুন্দর কাটে। মাংসটা গামলায়। নানা রঙের পালক সুদ্ধ ছালটা রান্নাঘরের বাইরের খুঁটিতে ঝুলছে। এইটের মধ্যে খানিকক্ষণ আগেও মুর্গীটা ছিল।

খাওয়ার সময় বীথি কিন্তু এত সুন্দর মাংস বিশেষ খেল না। বড়দা গোড়ায় অনেকবার খেতে বলল। কিন্তু শেষে আর বলল না।

রাতে বৃষ্টি এল। বড়দা বড়বৌদি গল্প করে শুতে গেল। শীতকালের বৃষ্টিকে প্রমথর দারুণ ভয়। বাইরে ধানের গোড়াগুলো এখন ভিজছে। মুর্গীরা সিঁড়ির গোড়ায় কোঁক কোঁক করে ডাকল। দোতলা অব্দি শেয়ালদের উঠে আসার সাহস নেই।

বীথি কাঁথা প্রমথ দুই-ই টেনে নিল। বাইরে খালের পাশে উল্টোনো নৌকোর পিঠের ওপর এখন বৃষ্টি পড়ে পড়ে ফেটে যাবেই। আমি বা বীথি কোথাও যদি নিজেদের কাছে দম ফুরিয়ে থেমে পড়ি—তাহলে আমাদের ভেতরের জ্বলন্ত আনন্দ সপ্ সপ্ করে চারদিক চেটে বেড়াবে—যেখানে মেটার মত

কিছু পাবে সেখানে মিটে গেলে স্থির তক্ষকের মত অনেকক্ষণ ধরে ঝিমোবে। মানে আর কি—আমি বা বীথি কারও কাছে কেউ বোধহয় তখন হেরে যাব! তখন ধুতি পাঞ্জাবীর মধ্যে উলঙ্গ আমি গলা অব্দি ঠাসা একটা লিক্‌লিকে প্রবৃত্তি হয়ে দুলতে থাকব। তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। কথাগুলো কি সত্যি—কি দয়ামায়া শূন্য!

বীথি বলল, 'ছাড়। জানলাটা বন্ধ করে দিই।'

উঠে বন্ধ করে দিয়ে এসে একগ্লাস জল দিল। মশারি উঁচু করে এমন নরম গলায় জল লাগবে কিনা জানতে চায় রাত্তিরে! গলার স্বরে শব্দগুলো তখন একটা থেকে অন্যটা অনেক আলাদা—দূরে দূরে।

পরদিন খুব ভোরে বড়দা নৌকো করে বেড়াতে নিয়ে গেল। বৌদি মাদুর খাবার দুই-ই নিয়েছে। খানিক যেতে একটা বড় দ্বীপ। গোল হয়ে চরটা ঘুরে গেছে। বড়দা বলল ওখানে বাস চলে। তাহলে নৌকোয় করে বাস নিয়ে যেতে হয়েছে।

পাশেই আর একটা উঠতি চর। বড়দা বলল, 'মাত্র শ'খানেক বছর বয়েস। সাপ-খোপে ভর্তি।' গাছও অনেক রকম। নদীতে পাড় চেটে নিচ্ছিল। সকালে রোদ ওঠেনি ভাল করে। আমরা এখানে অনেকদিন থাকব। বীথি একটা কথাও বলল না। পাশে সিগারেট হাতে ভাসুর। না হলে বীথির গলায় জঙ্গল উঠে আসত। জঙ্গল না বন। ঠিক উঠে আসত।

বাড়ি ফেরার পথে প্রমথ বলল, 'অরবিন্দ রেলে চাকরী করে—তাই না!'

বীথি হঠাৎ প্রমথর দিকে ঘুরে তাকাল। বড়দা বড়বৌদি পেছনে। চোখ কি বিশাল। 'কেন?' একেবারে জঙ্গলের শব্দ।

প্রমথ হেসে বলল, 'রাগ কর কেন! এমনি বললাম।'

বীথি মাথা নামাল।

কাকদ্বীপ থেকে ফিরেই বীথি জ্বরে পড়ল।

মা বলল, 'এই শীতে নৌকোয় বেড়ান সহ্য হবে কেন।' বৌ নিয়ে ডাক্তারখানায় যাওয়া একেবারে পিওর এ্যান্ড সিম্পল্‌ স্বামী স্বামী ভাব। ডাক্তার চোখের নীচেটা দেখল। শেষে বলল, 'একটু শুয়ে পড়ুন।' বীথির পেট টিপে টিপে দেখল।

তারপর প্রমথকে বলল, 'একবার রক্তটা পরীক্ষা করান। ইউরিণও দেখতে হবে। খুব সকালেরটা একটা শিশি ভরে নিয়ে আসবেন।'

দুজনে ডাক্তারখানা থেকে বেরিয়ে পার্কে গিয়ে বসল। সকালে শীতকালে পার্ক ছবির মত। এবারে কাগজে বসন্ত কলেরার খবর খুব বেশী। পার্কের গায়ে কর্পোরেশনের সাইনবোর্ড। 'খুব কলেরা হচ্ছে—এখুনি টিকা নিন।'

বীথির খাওয়া দাওয়া রোগীর পথ্যে এসে দাঁড়িয়েছে। এমন শান্ত স্থির —প্রমথ কবিতা করে ভাবলে বলতে পারত, অসুখটা যেন স্থায়ী হয়। তা নাহলে বীথিকে কি এমন করে পাওয়া যায়।

ব্লাড ইউরিণ দুটো রিপোর্টেই এ্যানিমিয়া পাওয়া গেল। সঙ্গে লিভারও কিছু ফুলেছে। মেইন ট্রাব্‌ল্‌ হজম নিয়ে। সিজনের ফল খাওয়ানো দরকার। দিন দুই অফিসের পর আপেল নিয়ে গেল প্রমথ। লুকিয়ে ড্রয়ারে রেখে দিল।

দিন কয়েক পরে খুলে দেখে ড্রয়ারে গরমে দুটো আপেল পচে পড়ে আছে। মশা বসেছিল। ড্রয়ার খুলতেই উড়ে গেছে।

বীথি মশারি কাচতে দিয়ে এঘরে আসছিল। বলল, 'কি হচ্ছে?'

প্রমথ বলল, 'কিচ্ছু না।' বলে দুটো আপেলই ছুঁড়ে দিল বাইরে। একটা চলন্ত ট্রামের ছাদে পড়ে গড়িয়ে গেল। অন্যটা লরির নীচে। চোদ্দ আনার ফলটা থেঁতলে গেল।

হঠাৎ শনিবার বীথির গা বেশ হাল্কা লাগতে লাগল। বিকেলে বলল, 'আমার ওপর রাগ করে থেকো না। আমাকে আজ বেড়াতে নিয়ে যাবে?'

প্রমথ কোন কথার উত্তর দিল না। বিকেলে রুদ্দুর এদিকে পড়ে। রাস-বাড়ির শ্যাওলাধরা চুড়ো, নিমগাছ—রেলের ব্রিজ, সেই পুরনো সব কিছু। এর মধ্যে বীথি শুধু নতুন।

পরমেশদের ওখানে কাল গিয়েছিল প্রমথ। পরমেশ ছিল না। বৌদি ছিল। শুয়ে শুয়ে পার্ট মুখস্থ করছিল। প্রমথর সঙ্গে একথা সেকথার পর বৌদি বলল, 'তুমি ত অনেকদিন আস না—'

প্রমথ চুপ করে ছিল। চা দেওয়ার পর বৌদি বলল, 'জানলে—সুধা এসেছিল একদিন—'

'তারপর—'

'বলে গেল, তুমি নাকি কোনদিন সুখী হবে না।' বলে বৌদি হাসল, 'কি বোকা!' অনেকক্ষণ পরে বলল, 'আমার কিন্তু দুঃখ হয় মেয়েটার জন্যে—'

কথা শেষ হতেই শেয়ালদায় একটা ইঞ্জিন বাঁশী দিল। একটা জিনিস প্রমথ লক্ষ্য করেছে—বৌদির কথার মধ্যে কিংবা শেষে শেয়ালদার ইঞ্জিনগুলোর কোনটা না কোনটা বাঁশী দেবেই দেবে।

মা সামনের ঘরে বসে সেলাই করছিল। বিজুর পাঞ্জাবীর পকেট ছিঁড়ে যাবেই। সাতদিনে নতুন স্যাণ্ডেল ছিঁড়ে আনে। বারান্দায় টবে মাধবী লতা ছাদের দড়ি বেয়ে উঠেছে। ডালডার টিনে মাঠের মাটিতে মা'র রোগা তুলসী গাছ। বাবা হাত উপরে তুলে দিয়ে ইজিচেয়ারে শোয়া। বাইরের অন্ধকার এখন ঘরে ঢুকবে।

বীথি বলল, 'চল-অ।'

এর মধ্যে বীথি কিছু সেজেছে। আজ জ্বরও হয়নি। প্রমথর কেমন অদ্ভুত লাগল বীথিকে। এতদিন সুধার কাছে কোথায় একটা ছোট কাঁটা হয়ে ছিল প্রমথ। কাল সুধার কথা শুনে এসেছে বৌদির কাছে। আমি কোনদিন সুখী হব না। আশ্চর্য, আজ এতদিন পরে সুধার জন্যে কোন কষ্ট হচ্ছে না প্রমথর। ট্রামের জানলায় বসে থাকা যে কোন মেয়ের মত সুধা। এক—ব্যথা পেলে কিংবা পুরনো আলাপে কোথাও দেখা হলে প্রমথ নিশ্চয় থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'কেমন আছ?' তার চেয়ে বেশী কিছু না।

নিশ্চয় থেমে পড়ে জিজ্ঞাসা করবে, 'কেমন আছ?' তার চেয়ে বেশী কিছু না।

প্রমথ তাড়াতাড়ি রেডি হয়ে নিল। আয়নায় দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে গিয়ে বীথিকে বলল, 'একটু সর ত।' বীথি না সরে সিঁথিতে খুব সাবধানে চিরুণী দিয়ে সিঁদুর লাগাল।

মা বলছে, 'যাও না—মনুর ওখান থেকে ঘুরে এস। বাচ্চা দুটোর কোন খবর নেওয়া হয় না কতদিন—'

প্রমথ বীথির মাথায় সিল্কের মত চুলে গন্ধ নিচ্ছিল।

বাবা বলল, 'ধুতিই নেই।'

মা বলল, 'পানুর একখানা পরে যাও! পানু—'

প্রমথ বলল, 'দিচ্ছে—'

প্রমথর পায়ে পাম্পসু। পাম্পসু উথলে পায়ের মাংস ফুলে উঠেছে। বোধহয় পা ফোলে প্রমথর। অন্ধকারে ঘরে গিয়ে বসল। এপাশে বাবা বসে ইজিচেয়ারে। হাত দুখানা মাথার পেছনে। মার হাত সেলাই কলে। প্রমথকে বলল, 'আলোটা জ্বেলে দে।'

আলোতে বাবার চিবুক আমের বাঁকানো লেজের মত লাগল। পল্টু কি অদ্ভুত বলে, 'এবার সব ছাড় ত—', মা চলে গেলে থাকব কি করে। আর বাবা মা এতদিন ধরে সংসার সাজিয়ে হঠাৎ চিরকালের মত চলে যাবে। ইচ্ছে করলেও আর আসতে পারবে না। শঙ্কর কেমন বলত, 'আমাদের এই সাজানো

সব কিছু ভেঙে যাবে। আমরা চলে যাব।' আজ আকাশে বোধহয় শঙ্করের মনের মত তারা উঠেছে।

বীথি প্রমথর একটা কাচানো ধুতি দিল। বাবা হাতে নিয়ে বলল, 'আমি ত জরির পাড় পরি না।'

তা ত ঠিক। প্রমথর যে সবই জরি পাড়ের ধুতি। বিয়েতে পাওয়া। মা চুপ করে থাকল।

একটু পরে বাবা বলল, 'যা। তোরা ঘুরে আয়। ঠাণ্ডায় ঠাণ্ডায় রাত করিস না।'

বাইরে কোথায় যাবে। সেই পার্ক। পার্কের গায়ে কলেরার সাইনবোর্ড। তবু বিকেলে গাছে, দোকানের আলোয় জায়গাটা বিয়ে বাড়ির মত। দুজনে কোণের দিকে বসল। প্রমথ একথা সেকথা বলে দেখল বীথির কিছুতেই মন নেই। অথচ আজ জ্বর নেই বলে বেরোবার সময়ও কিরকম উড়ে উড়ে হাঁটছিল বীথি।

প্রমথ এর ওষুধ জানে। শুধু একবার বাড়ির কথা ধরিয়ে দেওয়া। প্রমথ বলল, 'তোমার বড়মাসীমার মেয়ে চোরখুদির কথা বললে না ত।'

খচ্ করে বীথি ফিরে তাকাল। চোখ দুটো মার্বেলের মত টলটল করে কোণে সরে গিয়ে প্রমথকে দেখল ভাল করে। প্রমথ বুদ্ধদেবের মত মুখ করে আগ্রহ ফুটিয়ে তাকাল। বীথি আমার—একেবারে আমার।

'চোরখুদির বাচ্চা হতে গিয়ে হার্টফেল হল। গ্রামের বাড়ি ত। তারপর প্রথমবার—'

'ডাক্তার?'

'বর ডাক্তার ডাকতে গিয়েছিল। কিন্তু আসবার আগেই সব শেষ!'

প্রমথ চোরখুদির গল্প অনেকবার শুনেছে। বীথি এই গল্পটা বলতে ভালবাসে বলে প্রমথ প্রায়ই ফিরিয়ে ফিরিয়ে গল্পটা শোনে।

অনেক পরে বলল, 'পোড়াবার আগে পেট চিরে বাচ্চা বের করে নিতে হয়—', আপন মনেই বলল, 'এই এতখানি বড় ছেলে হয়েছিল—'

'সেই জামাইবাবু?'

'কবে বিয়ে করেছে আবার। সমস্তিপুরে—' তারপর বলল, 'চল-অ, শীত করে না আমার?' এমন ছোটর মত কথা কোনদিন বীথি বলে না। প্রমথর ভাবতে ইচ্ছে হল—বীথির এই গলা তার ভাল লাগছে। অথচ কাকদ্বীপে—সেই জঙ্গলের, না বনের শব্দ মাখানো স্বর, কী ভয় করে প্রমথর।

বিছানায় শুয়ে বীথি অনেক রাত্তিরে বলল, 'কাছে আস না। শীত করে না বুঝি!' একটু আগে বীথিকে ডাব খাওয়াতে হয়েছে। গায়ে বোধহয় জ্বর

আসবে মনে হচ্ছে। প্রমথ জড়িয়ে শুয়ে থাকল। আজ সন্ধ্যেবেলায় ঠাণ্ডায় বসা ঠিক হয়নি।

'না আজ না।'

বীথি তবু বলল, 'কাছে এস।' অন্ধকারে কারও মুখ দেখা যায় না এই এক সুবিধা। আমরা বিনা চেষ্টাতেই মৃত্যুর আগে আস্তে আস্তে সৎ হতে থাকব। শেষে যেদিন মরব সেদিন পুরোপুরি সৎ। তনুদার গায়ের পাঁচড়া-গুলো কেমন শুকিয়ে গিয়েছিল। মশার কামড়ের মত দেখাচ্ছিল। সেই সময় সব সেরে যায়।

বীথি একদম টেনে নিল। বাইরে কারখানার ঘণ্টা পড়ল। দুটো বাজে। বীথির নিঃশ্বাস গরম। প্রমথ চুমু খেল। ঠোঁটও গরম। কেমন ভয় হল প্রমথর।

'আবার পেস্ট দিয়ে মুখ ধুয়েছ?'

প্রমথ চুপ করে থাকল।

'আমার বমি আসে না?' প্রায় কান্নার মত লাগল। বীথি জ্বরের মধ্যে পেস্টের গন্ধ একদম সহ্য করতে পারে না।

এই দু হাতের মধ্যে বীথি—জোরে কাছে আনলে হয়ত ব্যথা পাবে। কী নরম। আমি কতদিন পরে একটু স্বাধীনভাবে জীবন করছি। আমার খুঁটিটাই এখনও পলকা। অথচ এর ওপরেই বীথি নির্ভর করে।

প্রমথর নাকে বীথির নাক লেগে গেল। বেণীটা টেনে বালিশের ওপর সরিয়ে দিল।

একটু পরে বীথি হাঁপাতে লাগল। অথচ প্রমথর গলায় হাত। আমরা স্বামী স্ত্রী। অদ্ভুত! কিছুদিন আগেও আমি আওয়াজ দিতাম। বীথির কেউ দরকার। সময় হওয়ার আগেই শেষ হইনি ত। তাহলে? মা বাবার এসব সম্পর্ক পুরনো হতে হতে এখন তারা অন্য আবহাওয়ার জন্যে তৈরী হয়ে গেছে। অচিন্ত্যর বাবা অমূল্যবাবু নেই। তৃপ্তি, সুখ এইসব বোধহয় শরীরের মাংসের সরু সরু ডগায় ক্ষিধে মেটার এক একটা ঘটনার ওপর নির্ভর করে ধক্ ধক্ করে জ্বলতে থাকে। আসলে আমি বা বীথি কোথাও যদি নিজেদের কাছে দম ফুরিয়ে থেমে পড়ি—তাহলে আমাদের ভেতরের জ্বলন্ত আনন্দ সপ্ সপ্ করে চারদিক চেটে বেড়াবে—যেখানে মেটার মত কিছু পাবে সেখানে মিটে গেলে স্থির তক্ষকের মত অনেকক্ষণ ধরে ঝিমোবে। মানে আর কি—আমি বা বীথি কারও কাছে কেউ বোধহয় তখন হেরে যাব। তখন ধুতি পাঞ্জাবীর ভেতরে উলঙ্গ আমি গলা অব্দি ঠাসা একটা লিক্‌লিকে প্রবৃত্তি হয়ে

দুলতে থাকব। তখন এসব পাতানো সম্পর্কের মধ্যে হিসেব না মিটলে কেউ কারও না। কী সত্যি—কী দয়ামায়া শূন্য! বীথি কি ভরে ওঠেনি? আমি বীথিকে হারাতে পারব না।

'এই—ঘুমোলে?'

বীথি তখনও হাঁপাচ্ছে। প্রমথ ছাড়ল না। 'এই—খারাপ লাগল?'

বীথি 'আঁ আঁ' করে কি বলল। মনে হল মাঠে ডেকে ডেকে বাছুর ফিরিয়ে আনছে। অন্ধকার হয়ে যাবে একটু পরে। জ্বরে ভুল বকছে না ত?

'এই-ই—তুমি সুখী, আমাকে ভাল লাগে?' ইচ্ছে হলেও একেবারে হ্যাংলার মত এসব বলতে পারল না প্রমথ। বীথি তখনও বুকের মধ্যে হাঁপাচ্ছে। দুই বুকের মধ্যের জায়গায় আরও একটু মাংস হলে ভাল হত। বয়েস হলে হয়ে যাবে।

'খারাপ লাগল—তাই না—' প্রমথ আর বলবে না। এই শেষবার।

এমন সময় একটা 'হরিবোল' শব্দ বহুদূর থেকে বাড়ির সামনে এসে বেড়ে গেল। নিশ্চয় তারকদের দল। শীত কাটাবার জন্যে ভীষণ জোরে চেঁচাচ্ছে। একেবারে কাছে এসে পড়েছে। তারপর সারাবাড়ির মধ্যে চীৎকারটা ফেটে পড়ল। তারকের গলাই সবচেয়ে উঁচুতে। শেষে আস্তে আস্তে দলটা কিছু পরে অন্ধকারে শব্দ নিয়ে একটু একটু করে একেবারে চলেও গেল।

প্রমথ ফিরে জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছিল। 'ভাল লাগল?'

বীথি খুব আস্তে বলল, 'তোমরা বাড়িটা ভেতরের দিকে নাও না কেন? বড় রাস্তা থেকে দূরে—'

এত স্পষ্ট এত সোজা। নিঃশ্বাস খুব গরম হয়ে গেছে।প্রমথ চুপ করে থেকেও অনেকক্ষণ ধরে কাঁপতে থাকল। হরিবোলের দল এতক্ষণে ব্রিজ পার হয়ে গেছে। কারখানা এলাকা। কোথায় কোথায় কলেরা হচ্ছে। আবার কোথায় হয়ত মরবে কিংবা মরেছে। তারকরা ফিরে এল বলে। আর একবার হরিধ্বনি এসে পেঁছবার আগেই প্রমথ দুহাতে বীথিকে জাপটে ধরে শুয়ে থাকল। বীথির গলায় জঙ্গলের স্বর। না বনের। প্রমথ বুক দিয়ে বীথিকে ঢেকে ফেলল। আজ বীথি সন্ধ্যে থেকেই খুশীতে আছে।

'আঃ ছাড়, নিঃশ্বাস আটকে যাচ্ছে।' বেশ ভাল রকম জ্বর এসেছে বীথির। প্রমথর হাত যেন পুড়ে গেল। এই রাত্তিরে ত আর বাড়ি পাল্টানো যাবে না। একটু ভেতরের দিকে এই হরিবোল, ট্রাম বাস—কোন শব্দ হয়ত যায় না। সেখানে বিকেলে ছোট মাঠে বাচ্চাদের শব্দ শুধু।

প্রমথ বলল, 'জল খাবে?'

'দাও। পুরো গ্লাস দিও না কিন্তু। অন্ধকারে বিছানায় পড়ে যায়—'

প্রমথ দেখল বেশ জ্বরেও বীথির সবকিছু ঠিক আছে।